হযরত ইমাম গায্যালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

প্রথম খণ্ড ঃ দর্শন ও ইবাদত

আবদুল খালেক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

দর্শন

ইবাদত

হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

এই বিশ্ববরেণ্য মহামনীষীর নাম আবূ হামিদ মুহম্মদ। তাঁহার পিতার ও পিতামহ উভয়ের নামই মুহাম্মদ। তাঁহার মর্যাদাসূচক পদবী হুজ্জাতুল ইসলাম। খোরাসানের অন্তর্গত তুস জেলার তাহেরান নগরে গাযালা নামক স্থানে হিজরী ৪৫০ সনে, মুতাবিক ১০৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইমাম সাহেব (র)-এর যুগে পারস্যের সম্রাট ছিলেন সলজূক বংশীয় সুলতান রুক্‌নুদ্দীন তোগরল বেগ। সলজূক বংশীয় সুলতানগণের রাজত্বকাল মুসলমানগণের চরম উন্নতির যুগ ছিল। তাঁহাদের পূর্বে ইরান শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বুইয়া বংশীয়রাজাদের শাসনাধীন ছিল। এই সময়ে মুসলিম শক্তিসমূহ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ,আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সলজূক বংশীয় তুর্কিগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রাক-ইসলামিক স্বভাব-চরিত্র ও মূল্যবোধে আমূল বিবর্তন সাধিত হয় এবং তাঁহাদের মাধ্যমে এক অনুপম সভ্যতা গড়িয়া ওঠে। ফলে তাঁহারা মুসলিম-বিশ্বের লুপ্তপ্রায় শক্তি ও প্রতিভাকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হন। এই শক্তির অভ্যুদয়ের কারণে খ্রিস্টান-শক্তির অগ্রগতি রহিত হয় এবং সমগ্র এশিয়ার এক বিরাট অংশ এই সুলতানগণের অধীনে আসিয়া পড়ে।

এই যুগে মুসলমানদের বিদ্যার্জন-স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তৎকালে প্রচলিত ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও পারসিকদের জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করিয়া প্রাচীন গ্রীক, মিসরীয় ও ভারতীয় জ্ঞানাহরণে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন; এই জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র, জড়বাদ, নাস্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মতবাদের সংমিশ্রণে মুসলমান সমাজে বহু মতানৈক্যের সূত্রপাত হয় এবং ইসলামী আকাইদ ও জ্ঞানের সহিত নানাবিধ মারাত্মক অনৈসলামী ধর্ম-বিশ্বাস ও জ্ঞান এমনভাবে মিশিয়া পড়ে যে, খাঁটি ইসলামী আকাইদ ও অনৈসলামী আকাইদে পার্থক্য করাই দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব জড়জ্ঞানের প্রভাবে ধর্ম জ্ঞানের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মুসলমান সমাজে আকাইদ ও ধর্ম-কার্যের ক্ষেত্রে এক চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে সমাজকে রক্ষার দায়িত্বই হযরত ইমাম গাযালী (র)-র উপর অর্পিত হয়। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের অতুলনীয় প্রতিভা যে নিপুণতার সহিত এই দায়িত্ব সমাপন করিয়াছে, সমগ্র বিশ্ব তজ্জন্য বিস্ময় ও ভক্তিআপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করিবে।

তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা

তৎকালে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছাত্রগণের খাওয়া পরার খরচসহ মাদ্‌রাসার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করিতেন। তদুপরি সকল মসজিদ ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের গৃহেও বহু বেসরকারি মাদ্‌রাসার ব্যবস্থা ছিল। দূরদেশীয় ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় ব্যয়ভার আমীর উমরাহ্‌গণ বহন করিতেন। সুতরাং সেইকালে শিক্ষার পথ ধনী-নির্ধন সকলের জন্যই অত্যন্ত সুগম ছিল। প্রবীণ ও উচ্চশিক্ষিত সুধীজন যে সকল স্থানে শিক্ষাদান করিতেন, সে সব স্থানই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হইত। এমতাবস্থায় অতিসহজে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিত।

শৈশবকাল ও ছাত্রজীবন

ইমাম সাহেব (র)-এর পিতা ছিলেন দরিদ্র; তথাপি তিনি পুত্রের শিক্ষার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। ইমাম সাহেব (র) অতি শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। অন্তিমকালে তাঁহার পিতা তাঁহার জনৈক বন্ধুর উপর দুইপুত্র আহ্‌মদ ও মুহম্মদের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং তজ্জন্য সামান্য অর্থ প্রদান করেন। শিশুদ্বয় অসাধারণ মেধা-শক্তির অধিকারী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই পবিত্র কুরআন হিফ্‌য সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা শহরের এক মাদ্‌রাসায় ভর্তি হইয়া অধ্যয়ন শুরু করেন। আল্লামা আবূ হামিদ আসকারায়েনী, আল্লামা আবূ মুহম্মদ যোবায়নী প্রমুখ মহাজ্ঞানী উস্তাদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। খ্যাতনামা ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আল্লামা আহ্‌মদ বিন মুহম্মদ রাযকানীর নিকট তিনি ফিকাহ্‌শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য জুরজানে গমন

তাহেরানে শিক্ষা সমাপ্তির পর ইমাম সাহেব (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য জুরজান শহরে গমন করেন। এখানে তিনি হযরত ইমাম আবূ নসর ইসমাঈল (র)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পুত্রবৎ স্নেহে সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি তাঁহাকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ে যে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন শিক্ষার্থীগণকে উহা হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে বাধ্য করিতেন। এই লিখিত নোটগুলিকে তা'লীকাত বলা হইত। এইরূপে হযরত ইমাম গাযালী (র) তা'লীকাতের এক বিরাট দপ্তর সঞ্চয় করিলেন।

তাহেরানা অভিমুখে যাত্রার পথে সর্বস্ব লুণ্ঠন

জুরজানের অধ্যয়ন সমাপনান্তে ইমাম সাহেব জন্মভূমি তাহেরান অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে দস্যুদল তা'লীকাতসহ তাঁহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। টাকা-পয়সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অপহৃত হওয়াতে তিনি কোন পরোয়া করিলেন না। কিন্তু তা'লীকার অপহরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এইগুলি ফেরৎ দেয়ার জন্য দস্যু সরদারের নিকট তিনি এই বলিয়া অনুরোধ জানাইলেন যে, উহাতে তাঁহার সমস্ত অর্জিত বিদ্যা সঞ্চিত রহিয়াছে। দস্যু-সরদার উপহাসের স্বরে বলিল ঃ তুমি তো বেশ বিদ্যা অর্জন করিয়াছ! সবই কাগজে রহিয়াছে, মনে কিছুই নাই। এই কথা বলিয়া সে তা'লীকাত ফিরাইয়া দিল। সরদারে ব্যাঙ্গোক্তি ইমাম সাহেবের মনে দাগ কাটিল। অনন্তর অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত তা'লীকাত তিনি মুখস্ত করিয়া লইলেন।

নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন

খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে অবস্থিত নিযামিয়া মাদ্‌রাসা তৎকালে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। জুরজানের অধ্যয়ন সমাপ্তির পরও ইমাম সাহেবের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। তাই তিনি নিযামিয়া মাদ্‌রাসায় গমন করিলেন। সেকালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমরূপে স্বীকৃত ইমামুল হারামাইন (র) ছিলেন এই মাদ্‌রাসার প্রধান অধ্যক্ষ। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে বহু লোক উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। তিনি এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, গোটা দুনিয়ার সুলতানগণও জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। ইমাম সাহেব (র) উপযুক্ত উস্তাদ পাইয়া তাহার তীব্র জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। ইমামুল হারামাইনও ইমাম সাহেবকে দর্শন ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে খুব আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৪৭৮ হিজরীতে ইমামুল হারমাইন (র) ইন্তিকাল করেন। তিনি ছাত্রগণের নিকট এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার ইন্তিকালে উন্মাদ প্রায় হইয়া পড়েন। কেউ বা বহুদিন যাবৎ শিশুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহার চারিশত ছাত্রের সকলেই নিজ নিজ দোয়াত-কলম ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং জামে-মসজিদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেন। কারণ, ইহাদের সহিত তাহাদের প্রিয় উস্তাদের স্মৃতি বিজড়িত ছিল এবং এইগুলি তাহাদের হৃদয়ের শোকাগ্নিকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিয়া তুলিত। ছাত্রগণ প্রায় একবৎসর কাল উস্তাদের শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকেন। ইমাম গাযালী (র)-র নিকটও উস্তাদের তিরোধান-যাতনা অসহনীয় হইয়া উঠিল এবং নিশাপুর তাঁহার নিকট অন্ধকার পুরির ন্যায় মনে হইতে লাগিল। তাই তিনি নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া বাগদাদে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে হযরত গাযালী (র)-র বয়স ছিল মাত্র ২৮ বছর। তিনি জানিতেন যে, কেবল কিতাব পাঠ আল্লাহ্‌র জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট নহে ; ইহার জন্য দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন জীবন্ত উস্তাদের নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত পীরে কামেল হযরত শায়খ আবূ আলী ফারমেদী (র)-র হস্তে বাইয়াতপূর্বক তাঁহার মুরীদ হন।

মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদে ইমাম সাহেব (র)

বাগদাদে তখন তুর্কীরাজ মালেক শাহের আধিপত্য ছিল। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন আলী নিযামুল মুল্‌ক একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'মাদ্‌রাসায়ে নিযামিয়া' এবং উহার পাঠ্যতালিকা 'দরসে নিযামী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত হযরত ইমাম সাহেবকে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর, এত অল্প বয়সেও তিনি অধ্যাপনা ও পরিচালনা কার্যে নিতান্ত দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় প্রদান করেন। স্বয়ং বাদশাহ্ ও রাজপুরুষগণও রাজকার্যের জটিল সমস্যাসমূহে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এ সময় তাঁহার নাম দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন দেশ হইতে শত শত ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ছুটিয়া আসেন। মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার খ্যাতিও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি নানা জটিল বিষয়ে গবেষণাও করিতে থাকেন। এরূপে তিনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী হন।

মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ

প্রভূত যশ ও যোগ্যতার সহিত ইমাম গাযালী (র) চারি বৎসরকাল মাদ্‌রাসা নিযামিয়াতে কাজ করেন। নানা জটিল বিষয়াদির চমৎকার ব্যাখ্যা শ্রবণ ও তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ছাত্রগণ একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িত। এখানে অবস্থানকালে তিনি দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তথাপি তাঁহার মন পরিতৃপ্ত হইল না। কিসের অভাবে যেন তাঁহার মন আনচান করিতে লাগিল। অজানাকে জানিবার এবং অদেখাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাবতীয় কর্মের প্রতি তাঁহার মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল বুঝিলেন যে, কেবল পুঁথিগত জ্ঞান দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র সাধনা ও কঠোর রিয়াযতের আবশ্যক। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ "মানুষের সদ্‌গুণরাজির বিকাশের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও একনিষ্ঠ সংযমের একান্ত আবশ্যক।" এই উপলব্ধির পর স্বীয় স্বভাব ও কর্মের প্রতি মনোনিবেশপূর্বক দেখিলাম, আমার কোন কাজই এই নীতির অনুরূপ নহে, যাহার দ্বারা আমার স্বভাব, আত্মা ও মানবতার উন্নতি সাধন হইতে পারে। আমি আরও বুঝিতে পারিলাম যে, আমি প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য করিতেছি এবং একমাত্র

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমার কোন কাজ হইতেছে না। তবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ-লাভের নিমিত্ত লোকালয়ে অবস্থান করিয়াই দুনিয়ার সকল মোহ্ বর্জন করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যাবতীয় কর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যভাব জন্মিতে লাগিল। মাদ্‌রাসার অধ্যাপনা এবং পরিচালনার কার্যেও শৈথিল্য দেখা দিল, মৌনাবলম্বনের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইল; হযম শক্তি কমিতে লাগিল এবং ঔষধেও অশ্রদ্ধা জন্মিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "এমতাবস্থায় কোন ঔষধই ফলপ্রদ হইবে না।" অনন্তর দেশ ভ্রমণে বাহির হওয়ার মনস্থ করিলাম। দেশের আমীর-উমরাহ্, আলিম-উলামা, সুধীমণ্ডলী এবং রাজপুরুষগণ এই সংকল্প পরিত্যাগের জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি মনকে বশে আনিতে পারিলাম না। পরিশেষে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া হিজরী ৪৮৮ সনের যিলকাদাহ্ মাসে আমি গোপনে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

হযরত ইমাম গাযালী (র) এক অসাধারণ অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জাগতিক জ্ঞান তাঁহার মনের তীব্র পিপাসা নির্বাপিত করিতে পারে নাই। তাই তিনি এবার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও জ্ঞান পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সকল দার্শনিকের মতবাদও গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিনি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার মনের জিজ্ঞাসার কোন সঠিক জবাব তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। তাই এক অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে সংসারবিরাগী সুফী-দরবেশের বেশে জীবনের দীর্ঘ দশটি বৎসর নানা দেশ পর্যটনে তিনি অতিবাহিত করেন। এই পথেই তিনি তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত রহস্যের সন্ধান খুঁজিয়া পান। তাঁহার মন চিররহস্যময় আল্লাহ্‌র স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয় এবং তাঁহার অন্তরের পিপাসা নিবারিত হয়।

কথিত আছে, মাদ্‌রাসা নিযামিয়াতে অবস্থানকালে হযরত ইমাম সাহেব (র) মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। কিন্তু দেশ পর্যটনের সময় তিনি নিতান্ত সাধারণ পরিচ্ছদে একটি মোটা কম্বল সম্বল করিয়া বাহির হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাকে খুব প্রফুল্ল দেখাইত। সিরিয়ার পথে তিনি কিছুকাল দামেশক নগরিস্থিত উমায়্যা জামে মসজিদে অবস্থান করেন। তৎকালে এই মসজিদের পার্শ্বে একটি বিরাট মাদ্‌রাসা ছিল। হযরত ইমাম সাহেব (র) এই মসজিদের পশ্চিম প্রান্তস্থিত মিনারার এক প্রকোষ্ঠে স্বীয় বাসস্থান নির্ধারণ করেন এবং অধিকাংশ সময়ই ইহাতে মুরাকাবা-মুশাহাদায় নিমগ্ন থাকেন।

অবসর সময়ে তিনি কিছুসংখ্যক অতি আগ্রহী শিক্ষার্থীকে শিক্ষদান করিতেন এবং সময় সময় আলিমগণের সহিত জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করিতেন।

বায়তুল মাক্‌দাস গমন ও নির্জনবাস অবলম্বন

দুই বৎসর দামেশ্‌ক নগরে অবস্থানের পর তিনি বায়তুল মাক্‌দাসে গমন করেন। ইহার কারণস্বরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া মসজিদ সংলগ্ন মাদ্‌রাসায় গমন করেন এবং ইহার প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আলোচনাকালে শিক্ষক সাহেব বলেন ঃ ইমাম গাযালী সাহেব এ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন। এই প্রশংসা তাঁহার মনে অহংকারের সৃষ্টি করিতে পারে ভাবিয়া হযরত ইমাম সাহেব (র) তথা হইতে সংগোপনে বায়তুল মাক্‌দাসে চলিয়া যান। তথায় তিনি 'সাখরাতুস্‌সাম্মা' নামক বিখ্যাত প্রস্তরের নিকটবর্তী এক নির্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি ইহাতে সর্বদা যিকর-ফিকরে মশগুল থাকিতেন এবং সময় সময় নিকটবর্তী পবিত্র মাযারসমূহ যিয়ারতে বাহির হইতেন।

মকামে খলীলে তিনটি প্রতিজ্ঞা

বায়তুল মাক্‌দাসের যিয়ারত শেষ করিয়া তিনি 'মকামে খলীল' নামক স্থানে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের মাযার শরীফ যিয়ারতে গমন করেন। সেখানে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন ঃ (১) কখনও কোন রাজদরবারে যাইব না, (২) কোন বাদশাহের বৃত্তি বা দান গ্রহণ করিব না এবং (৩) কাহারও সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না।

বায়তুল মাকদাসে অবস্থানকালে ইমাম সাহেব (র) অনেক সময় মসজিদে আকসায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

বায়তুল মাক্‌দাস হইতে হযরত ইমাম সাহেব (র) মদীনা শরীফে গমন করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারত করেন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন।

হজ্জ সমাপন ও দেশ পর্যটন

মদীনা শরীফ হইতে তিনি মক্কা শরীফে গমন করেন এবং পবিত্র হজ্জ উদ্‌যাপন করেন। এখানেও তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বহু বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন।

তৎপর সেখান হইতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া পরিদর্শনে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার পথে তিনি আবার পবিত্র মক্কা-মদীনা যিয়ারত করেন।

বাগদাদ হইতে বাহির হইয়া সুদীর্ঘ দশ-এগার বৎসরকাল তিনি বহু বন-জঙ্গল, জনপদ ও মরুপ্রান্তর পরিভ্রমণ করেন। বলাই বাহুল্য যে, তৎকালে যাতায়াতের জন্য বাহন পশু ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এত কষ্টকর ভ্রমণেও তাঁহার ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত -মুজাহাদায় কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই। ফলে তাঁহার অন্তর-আত্মা সম্পূর্ণরূপে নির্মল ও পরিষ্কার হইয়া পড়ে এবং দিব্যজ্ঞানের পথে সমস্ত পর্দা একেবারে অপসারিত হইয়া যায়।

পুনরায় মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ

হযরত ইমাম গাযালী (র) উপলব্ধি করিলেন যে, সমগ্র দুনিয়া ধর্মের দিক হইতে মোড় ঘুরাইয়া লইতেছে এবং মুসলমানগণ ধর্ম-কর্মে দিনদিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। জড়বাদী দর্শন-বিজ্ঞানের ঝড়-ঝঞ্ঝার সংঘাতে ধর্মের সূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য নির্জনবাস পরিত্যাগপূর্বক তিনি ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগের মনস্থ করিলেন। বাগদাদ অধিপতি সুলতান মালেক শাহের পুত্র সুলতান সানজার সালজুকীর প্রধানমন্ত্রী ফখরুল মুলক (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র) এই সময় আবার মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য হযরত ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করেন। নির্জনবাস পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-শিক্ষা প্রসারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণও তাঁহাকে পরামর্শ দিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত স্বপ্নযোগেও বহু পবিত্রাত্মা তাঁহাকে এই পরামর্শই প্রদান করেন। সুতরাং দেশে প্রত্যাবর্তন করত হিজরী ৪৯৯ সালের যিলকাদাহ্ মাসে পুনরায় তিনি মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়া যথারীতি ধর্মশিক্ষা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতিশয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত এই কার্যনির্বাহ করিতে থাকেন।

ইমাম সাহেবের মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ

হিজরী ৫০০ সালের মহররম মাসে প্রধানমন্ত্রী ফখরুল মুল্‌ক এক দুরাচার গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার অনতিকাল পরই হযরত ইমাম সাহেব (র) মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় বাসভবনের অনতিদূরে একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে ইল্‌মে দীন শিক্ষার্থী ও আল্লাহ্‌র পথের পথিকদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন। বাকি জীবন তিনি এই স্থানে এবং এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

হিংসার কোপে ইমাম সাহেব (র)

মাদ্‌রাসা নিযামিয়ার অধ্যক্ষপদ পুনঃগ্রহণের জন্য বাগদাদাধিপতি সুলতান সানজার সুলজুকী ইমাম সাহেব (র)-কে বারবার অনুরোধ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তিনি রাযী হন নাই। এই সুযোগে হিংসাপরায়ণ কতিপয় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে

সুলতানকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পায়। সুলতান হানাফী মাযহাবালম্বী ছিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল যে, 'মন্‌খুল' কিতাবে ইমাম গাযালী সাহেব হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহাতে ইমাম গাযালী (র)-র প্রতি সুলতানের অসন্তোষের উদ্রেক হয়। রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য হযরত ইমাম সাহেবের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে সুলতান দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে বসান। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "ইহা সত্য নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আমার সেই বিশ্বাসই বলবৎ আছে, যাহা আমি 'ইয়াহইয়াউল উলূম' কিতাবে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহাকে আমি ফিকাহশাস্ত্র যুগস্রষ্টা ইমাম বলিয়া স্বীকার করি।" ইহাতে সুলতানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল।

নিযামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ পুনঃগ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

হযরত ইমাম গাযালী (র) মাদ্‌রাসা নিযামিয়া পরিত্যাগ করার পর ইহার যশঃগৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহা পুনরুদ্ধারের জন্য আমীর-উমরাহ্ ও রাজপুরুষগণ নানা উপায়ে তাঁহাকে উহার অধ্যক্ষ পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতে থাকেন। সালজুকী সুলতান এবং খলীফার দরবার হইতেও তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ অনুরোধপত্র আসিতে থাকে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে তিনি উহা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন ঃ

১. তুসনগরে বর্তমানে আমার নিকট দেড়শত ছাত্র অধ্যয়নরত রহিয়াছে। আমি বাগদাদে চলিয়া গেলে তাহাদের পক্ষে সেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে।

২. পূর্বে আমার কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি সন্তান দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে ছাড়িয়া বাগদাদে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

৩. মাকামে খলিলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু বাগদাদে ইহা হইতে অব্যাহতির উপায় নাই।

৪. খলিফার সম্মানার্থে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। আমার ইহা বরদাশত হইবে না।

৫. রাজদরবার হইতে কোন বেতন বা বৃত্তি গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বাগদাদে আমার কোন সম্পত্তি নাই। সুতরাং কিরূপে আমি বাগদাদে অবস্থান করিব?

মোটকথা সর্বপ্রকার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি উক্ত অধ্যক্ষ পদ গ্রহণে আর সম্মত হন নাই। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি তুস নগরেই অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থ রচনায় ইমাম গাযালী (র)

জ্ঞানের আলো বিতরণের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর এ মরজগতে আবির্ভাব। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে অবদান তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। এই মহামনীষী মাত্র ৫৫ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। শৈশব ও পাঠ্য-জীবন বাদ দিলে মাত্র ৩৪/৩৫ বৎসর কর্মজীবনে তিনি প্রায় চারিশত অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'ইয়াকুতুততাবলীগ' নামক তফসীর পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত এবং 'ইয়াহইয়াউল উলুম' বিরাট চারি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেকটি খণ্ডও আবার দশটি পৃথক অংশে বিভক্ত। দশ-এগার বৎসর আবার তিনি দেশ পর্যটন ও নির্জনবাসে অতিবাহিত করেন। তদুপরি অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে প্রত্যহ কিছু সময় ব্যয় হইত। তাঁহার দরবারে শিক্ষার্থী ও দীক্ষা প্রার্থীদের সংখ্যা কোনদিনই দেড়শতের কম হইত না। এতদ্ব্যতীত বহু দূরদূরান্ত হইতে নানা জটিল বিষয়ে ফত্ওয়ার জন্য অনেক লোক তাঁহার দরবারে আগমন করিত এবং ওয়াজ-নসীহত ও বিতর্ক-সভাও তাঁহাকে করিতে হইত। উহাতেও কম সময় ব্যয় হইত না। এতসব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছেন।

আল্লামা নববী বলেন ঃ ইমাম গাযালী (র)-এর সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল (জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত) ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর হিসাবান্তে আমি গড় করিয়া দেখিয়াছি, তিনি গড়ে প্রত্যহ ১৬ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন।

দর্শন, তর্ক, ইলমে কালাম, ধর্মতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব স্বভাব-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ঃ

ফিকাহ

ওয়াসীত, বাসীত, ওয়াজীয, বয়ানুল কাওলায়নিলিশ শাফীঈ তা'লীকাতুন ফী-ফুরুইল মযহাব, খোলাসাতুর রাসাইল, ইখতিসারুল, মুখতাসার, গায়াতুল গাওর, মজমুআতুল ফতাওয়া।

ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি

তাহ্সীনুল মাখায, শিফাউল আলীল, মুনতাখাল ফী ইলমিল জিদ্ল, মনখুল, মুসতাসফা, মাখায় ফিল খিলাফিয়াত, মুফাসসালুল খিলফি ফী উসূলিল কিয়াস।

মানতিক ঃ মি'য়ারুল ইলম, মীযানুল, আ'মল (ইউরোপে প্রাপ্তব্য)

দর্শন ঃ মাকাসিদুল ফালাসিফাহ (ইউরোপে সংরক্ষিত)।

ইলমি কালাম ঃ আহাতাফুল ফালাসিফাহ্‌, মুনকিয, ইলজামুল আওয়াম ইকতিসাদ্‌,মসতাযহারী ফাযাইহুল ইবাহিয়্যাহ্‌ হাকীকাতুররুহ, কিসতাসুল মুস্তাকীম, কাওলুল জমীল ফী রাদ্দিন আলা মান গায়্যারাল ইঞ্জীল, মাওয়াহিবুল বাতিনিয়্যাহ, তাফাররাকাতুম বায়নাল ইসলামি ওয়াল যিন্দিকাহ্‌, আর রিসালাতুল কুদসিয়্যাহ্‌।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয় ঃ ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুম, কিমিয়ায়ে সাআদাত, আল-মাকসুদুল আকসা, আখলাকুল আবরার, জওয়াহিরুল কুরআন, জওয়াহিরুল কুদসি ফী হাকীকাতিন্নাফ্‌স্‌ মিশকাতুল আনওয়ার, মিনহাজুল আবেদীন, মি'রাজুস সালিকীন, নাসীহাতুল মূলক, আয়্যুহাল ওলাদ, হিদায়াতুল হিদায়াহ্‌, মিশকাতুল আনওয়ার ফী লাতাইফিল আখ্‌য়ার।

নিশাপুর অবস্থানকালে ইমাম গাযালী (র) গ্রন্থাদি রচনা শুরু করেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের যে জড়বাদ বিশেষত গ্রীক দার্শনিকদের ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদ মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এই কালেই তিনি অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ বিচারে এই সব দোষ-ত্রুটি চালিয়া বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া মনখুল (ইহার অর্থ চালনি দ্বারা চালা) গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম জীবনের লেখা হইলেও ইহা সুধীজনের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। এমনকি, তাঁহার উস্তাদ স্বয়ং হযরত ইমামুল হারামাইন (র) পর্যন্ত এই গ্রন্থ পাঠে মন্তব্য করেন ঃ 'জীবতাবস্থায়ই তুমি আমাকে সমাধিস্থ করিলে।' অর্থাৎ ছাত্রের খ্যাতি উস্তাদের জীবদ্দশায়ই তাহার খ্যাতিকে অতিক্রম করিয়া গেল।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুম' ইসলাম জগতে বিশেষ সমাদৃত। সুধীজন ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় মনীষীর উক্তি এই ঃ 'জগতের সমস্ত জ্ঞান প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিলে কেবল ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুম দ্বারাই উহা পুনঃরুদ্ধার করা যাইবে। ইয়াহ্‌ইয়ার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ জগতে আর লিখিত হয় নাই। ইয়াহ্‌ইয়া কুরআন শরীফের নিকটবর্তী গ্রন্থ।' জগদ্বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হযরত গাযালী (র) একদা এক বিরাট জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ আমার হাতে কোন্‌ গ্রন্থ তোমরা জান কি? ইহা ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুম। গ্রন্থখানিকে অবজ্ঞা করার কারণে আমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে অভিযোগ করা হয়। স্বপ্নযোগে দেখিলাম, বিচারে আমার পৃষ্ঠে চাবুক মারা হইয়াছে। এই দেখ, আমার পৃষ্ঠে চাবুকের চিহ্ন বিদ্যমান।

তাঁহার রচিত 'মাকাসিদুল-ফালাসিফা', 'তাহাফুতুল ফালাসিফা' প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের কিতাব সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত হইয়াছে এবং ইংরেজি, ফরাসী, ল্যাটিন, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায় এইগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ইউরোপীয় বহু

বক্রপন্থী পণ্ডিতের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছে। জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন ঃ ইমাম গাযালী ও ইবনে রুশদের জন্য না হইলে মুসলমানগণ নিউটন ও এরিস্টটলের জাতি হইয়াই থাকিত। বস্তুত পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদের মুকাবিলায় খাঁটি দর্শনকে বলিষ্ঠ যুক্তিতে প্রকাশ করিয়া হযরত ইমাম গাযালী (র) বিশ্বামনবের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পবির্তন আনয়ন করেন। বিশেষত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়া তিনি মানবেতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

মুসলিম-বিশ্ব অপেক্ষা খ্রিষ্টান ইউরোপেই ইমাম গাযালী (র)-এর গ্রন্থাবলীর সমাদৃত বেশি। প্রখ্যাত কবি দাঁন্তে, মনীষী রেমণ্ড মার্টিন, মনীষী সেন্ট টমাস একুইনাস, প্রখ্যাত ফরাসী মিষ্টিক ব্লেইসি প্যাসকেল হযরত ইমাম গাযালী (র)-র গ্রন্থরাজি হইতেই তাঁহাদের যুক্তি ও উদাহরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মতামতকেই প্রমাণ্য বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার চল্লিশটি গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।

‘কিমিয়ায়ে সা'আদাত’ হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর অপর একখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। দুনিয়ার প্রায় সকল ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ন-শহরে ল্যাটিন ভাষায় ইহা সর্বপ্রথম অনূদিত হয় এবং অধ্যাপক হিথজীন ইহার কঠিন শব্দসমূহের ভাষ্য রচনা করেন।

শোকের ছায়া

সোমবার, মাহে জামাদাল উখরা, হিজরী ৫০৫ সাল মুতাবিক ১৯ শে ডিসেম্বর, ১১১১ খ্রিস্টাব্দ। ফজরের নামায সমাপনান্তে সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়কর প্রতিভা; যুক্তি ও যুক্তিবাদী অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক, বিশ্বমানবতার দিশারী, সূফীকুল শিরোভূষণ ; হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবূ হামিদ মুহম্মদ গাযালী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি ৫৫ বছর বয়সে দুনিয়াবাসীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া রফীকে আ'লার সান্নিধ্যে উপনীত হন। সম্পূর্ণ সুস্থ দেহেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে তদীয় ভ্রাতা হযরত ইমাম আহ্‌মদ গাযালী (র) বলেন ঃ সোমবার দিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস অনুসারে ওযূ করিয়া ফজরের নামায সমাধা করেন। তৎপর পূর্বে প্রস্তুত করা তাঁহার কাফনটি চাহিয়া লইলেন এবং ইহা চোখে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য। কথাটি মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বীয় পদদ্বয় প্রসারিত করিলেন এবং সেই মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিলেন।

মানবতার শেষ গতি

হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর ন্যায় ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করার জন্য রহস্যের প্রতি এমন উন্মাদনা জগতে অতি অল্প ব্যক্তির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। জীবনের সুখ-দুঃখ এবং জাগতিক সব প্রলোভনের মায়া কাটাইয়া তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে বিমগ্ন থাকিতেন। আত্মা ও সৃষ্টিকর্তার গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার সাধনার অন্ত ছিল না। তাই এ সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা যেমনি পূর্ণাঙ্গ ও গভীর, তেমনি অভিনব। এ জ্ঞানের আলোক জগতের পথভ্রষ্ট মুসলমান আবার তাহাদের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। তাঁহার বলিষ্ঠ যুক্তি ও অভ্রান্ত মতবাদের নিকট পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের সকল চিন্তাধারা ম্লান হইয়া পড়ে। বিগত আট শতাব্দী যাবৎ তাঁহার দর্শনই সারা জাহানের মুসলমানের দিগদর্শন যন্ত্ররূপে তাহাদের মানসিক জগতকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে।

তাঁহার প্রতিভা ও দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বাস্তব জীবনে তাঁহার মত ও পথ অবলম্বন করিলেই বিশ্বমানবতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে, সমগ্র বিশ্বে এক ও অভিন্ন, সুন্দর ও সুষম মানব সমাজ গড়িয়া উঠিবে। মনে হয় সেই দিন খুব দূরে নহে।

২৩শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী,
৬ই শ্রাবণ, ১৩৮৩ বাংলা।

আবদুল খালেক বি. এ. (অনার্স)
গ্রাম ও পোঃ পীরপুর
জিলা–ঢাকা।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা

হামদ ঃ আকাশের তারকারাজি, মেঘের বিন্দু, বৃক্ষের পাতা, মরুভূমি, বালুকাকণা এবং আসমান-যমীনের পরমাণু–এই সমস্তের সমষ্টি যেমন অসীম, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাও তদ্রূপ অনন্ত অসীম। উপমাহীন একত্ব তাঁহার গুণ এবং প্রতাপ, শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব এবং প্রাধান্য তাঁহার বৈশিষ্ট্য তাঁহার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পূর্ণতার জ্ঞান সৃষ্টজগতে কাহারও নাই। তিনি ব্যতীত তাঁহার মারিফাতের হাকীকত কেহই জানে না। বরং এই হাকীকত নির্ণয় করিতে না পরিয়া অসামর্থ্য মানিয়া লওয়াই সিদ্দীকগণের মরতবার শেষ সীমা এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারার অক্ষমতা স্বীকার করাই ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণের পক্ষে তাঁহার স্তুতিগানের শেষ সীমা। তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রথম বিদ্যুৎ-ছটা দেখিয়া হয়রান হইয়া পড়াই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির শেষ সীমা। তাঁহার অপার মহিমার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় হতভম্ব হইয়া থাকাই মুরীদ ও ধর্ম পথ-যাত্রীদের শেষ কাজ। তথাপি তাঁহার মারিফাত লাভের আশা ত্যাগ করা উচিত নহে। সে আশা ত্যাগ করার অর্থই হইল কর্ম হইতে বিরত থাকা এবং তাঁহার পূর্ণ মারিফাত লাভের দাবি করা কল্পনায় তাঁহার সাদৃশ্য নির্ধারণ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনের চেষ্টা করিলে চক্ষে ধাঁধা লাগিবে, ইহা ছাড়া চক্ষের আর কিছুই লাভ হইবে না। তাঁহার বিচিত্র বিচিত্র কারিগরি লইয়া চিন্তা করিলে অবশ্যই মারিফাত হাসিল হয় এবং ইহাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধিলব্ধ ফল।

তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিতে যাইয়া কাহারও এইরূপ চিন্তা করা উচিত নহে যে, তিনি কেমন করিয়া হইলেন এবং তিনি কি। অপরপক্ষে এ বিশ্বজগতের আশ্চর্য আশ্চর্য বস্তুসমূহের অস্তিত্ব কিসে হইল এবং কে করিল– এই প্রকার চিন্তা হইতে কাহারও মন যেন এক মুহূর্তও গাফিল না থাকে। তাহা হইলেও বুঝা যাইবে যে, এই সমস্তই তাঁহার অসীম কুদরতের নিদর্শন– সমস্তই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের জ্যোতি ঃ সমস্ত বিচিত্র বিচিত্র বস্তু তাঁহারই হিকমতে উৎপন্ন এবং তাঁহারই সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব–যাহা কিছু আছে তিনিই তৎসমস্তের কারণ এবং তাঁহা হইতেই সমুদয় বর্তমান আছে– আর তাঁহার অস্তিত্বের জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র।

না'ত ঃ সকল পয়গম্বরের নেতা সমস্ত বিশ্ববাসীর পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক, বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব-রহস্যের মর্মজ্ঞ এবং তাঁহার প্রিয়তম ব্যক্তি হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ। আর তাঁহার সকল সন্তান-সন্ততি ও আসহাবের উপর দরূদ। তাঁহারা সকলেই উম্মতের নেতা এবং ধর্মপথের পথপ্রদর্শক।

মানুষের মরতবা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে খেলাধুলা ও নিরর্থক কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বরং তাহার উপর অতি শ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে এবং তাহার জীবনে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। কেননা, মানুষ অনাদি না হইলেও অনন্তকাল পর্যন্ত অবশ্যই থাকিবে। তাহার মৃত্তিকা নির্মিত এবং তুচ্ছ হইলেও, উর্ধ্বজগৎ ও মহান আল্লাহ্‌র সহিত তাহার আত্মার সম্পর্ক রহিয়াছে। জীবনের প্রারম্ভে যদিও সে পশুপক্ষী ও শয়তানের ভাবসমূহে জড়িত থাকে তথাপি মুজাহাদার হাপরে তাহাকে নিক্ষেপ করিলে সকল প্রকার ভেজাল ও ময়লা হইতে পাক-পবিত্র হইয়া সে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপযোগী হইয়া উঠে। মানুষ নীচতলার গভীরতম কূপে (আস্‌ফালুস সাফেলীনে) নিমগ্ন হইতে পারে আবার সে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখর, সর্বোচ্চ ইল্লীন পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে। পশুপক্ষী ও শয়তানের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া কাম ও ক্রোধের বশীভূত হওয়াকেই আসফালুস সাফেলীনে নিমগ্ন হওয়া বলে। অপরপক্ষে মানুষ যখন সদগুণরাজিতে বিভূষিত হইয়া ফেরেশতার সমকক্ষ হইয়া উঠে এবং কাম ও ক্রোধ হইতে অব্যাহতি লাভ করে, বরং এই রিপুদ্বয় তাহার গোলাম আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে তখনই সে সর্বোচ্চ ইল্লীনে উপনীত হয়। এই মরতবায় উন্নীত হইলেই মানুষ আল্লাহর বন্দেগীর উপযুক্ত হয়। আর ইহাই ফেরেশতাগণের সৎস্বভাব ও মানুষের মরতবার শেষ সীমা। মানুষ আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হইলে সে এক মুহূর্তও তাঁহার দীদার ব্যতীত থাকিতে পারে না ; আর আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য দর্শনই তাহার জন্য বেহেশ্‌ত পরিণত হয়। চক্ষু, উদর ও কাম প্রবৃত্তি তৃপ্তির জন্য যে বেহেশত, তাহা তখন তাহার নিকট নিতান্ত হেয় হইয়া পড়ে।

গ্রন্থ রচনার কারণ ঃ মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং হেয় পদার্থে তাহার জন্ম। তাই এই পূর্ণতা হইতে তাহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়া কঠোর সাধনা ও আন্তরিক পীড়াসমূহের যথোপযুক্ত চিকিৎসা ব্যতিত কিছুতেই সম্ভব নহে। যে কীমিয়া (রাসায়নিক প্রক্রিয়া) দ্বারা পিতল ও তামার সংশোধন করত বহুমূল্য স্বর্ণে পরিণত করা যায় তাহা যেমন দুঃসাধ্য এবং সকলে ইহা জ্ঞাত নহে– তেমনই এই কীমিয়া (পরশমণি) যাহা মানুষের হৃদয় হইতে পশুপক্ষীর স্বভাব দূর করত ফেরেশতাগণের মর্যাদার উন্নীত করে এবং যদ্দদ্বারা মানুষ চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হয় তাহাও নিতান্ত কঠিন ও সকলেই জানে না। ইহা মানুষকে শিখাইবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে ইহাই চিরস্থায়ী কীমিয়ায়ে

সাআদাত অর্থাৎ সৌভাগ্যের পরশমণি। এই জন্যেই এই গ্রন্থের নাম 'কীমিয়ায়ে সাআদাত' অর্থাৎ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' রাখা হইল এবং ইহার জন্য এই নামই অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। তামা ও স্বর্ণের মধ্যে বর্ণ ও মূল্য ব্যতীত আর কোন প্রভেদ নাই। সাধারণ পরশমণি দ্বারা দুনিয়াতে ধনবান হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না এবং দুনিয়া নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এমতাবস্থায় দুনিয়ার ধনদৌলতের মূল্যই বা কতটুকু? পশু ও ফেরেশতার স্বভাবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই পরশমণি পশুকে ফেরেশতা বানাইতে পারে। সুতরাং ইহার ফল চিরস্থায়ী সৌভাগ্য এবং ইহার পুরস্কার অপরিসীম; আর কোন প্রকার মলিনতাই উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অতএব ইহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই 'সৌভাগ্যের পরশমণি' বলা যাইতে পারে না।

সৌভাগ্যের পরশমণি কোথায় যাওয়া যায় ঃ পরশমণি যেমন কোন বৃদ্ধার পর্ণকুটীরে পাওয়া যায় না, কেবল বাদশাহের ধনভাণ্ডারে পাওয়া যাইতে পারে, তদ্রূপ চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পরশমণি সকল স্থান পাওয়া যায় না, একমাত্র আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারেই পাওয়া যায়। আকাশে ফেরেশতাগণের আত্মা এবং জগতে পয়গম্বরগণের হৃদয় আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার। সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরের দরবার ব্যতীত অন্যত্র সৌভাগ্যের পরশমণির অনুসন্ধান করিবে সে পথভ্রান্ত ও প্রতারিত হইবে এবং তাহার সকল চেষ্টা বিফলে যাইবে। কিয়ামত দিবসে তাহার নিঃস্বতা ও অসারতা প্রকাশ পাইবে এবং দুনিয়াতে যে সে ভালকে মন্দ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল তজ্জন্য অপমানিত হইবে সে তখন আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা শুনিতে ইহবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

অর্থাৎ "তখন আমা হইতে তোমার চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিলাম ; অদ্য তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইল।" –(সূরা কাফ, রুকু ২, পারা ২৬)

পয়গম্বরগণ মানজাতির পথপ্রদর্শক ঃ আল্লাহ্‌র বড় বড় নিয়ামতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এই যে, উল্লেখিত পরশমণি মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন। কি প্রণালীতে মানবাত্মাকে মুজাহাদার হাপরে ফেরিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হয়, যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির কুস্বভাব ও আত্মাকে কলুষিত করিয়া ফেলে উহা কি প্রকারে বিদূরিত করিতে হয় এবং কি করিয়া সৎপ্রবৃত্তি ও সৎ-স্বভাবে দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করা যায়, এই সকল উপায় তাঁহারা মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন। আল্লাহ্ যেমন স্বীয় পবিত্রতা ও বাদশাহীর প্রশংসা করিয়াছেন তদ্রূপ পয়গম্বরগণের প্রেরণ সম্পর্কেও তিনি নিজের গুণকীর্তন করিয়াছেন এবং এইরূপে মানব জাতির অসাধারণ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ (الى قوله) لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থাৎ, "আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যিনি বাদশাহ, অতি পাক-প্রবল (ও) হিকমতওয়ালা ; তিনিই যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন (সেই পয়গম্বর) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট পাঠ করেন এবং তাহাদিগকে পাক করেন এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেন। অবশ্যই তাহারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।" (সূরা জুম'আ, রুকূ ১ ঃ ২ পারা ২৮)

এই আয়াতে 'তাহাদিগকে পাক করেন' বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষকে পাশবপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব হইতে পাক করেন এবং 'তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন' বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষ কি প্রকারে ফেরেশতাগণের গুণরাজিতে বিভূষিত হইতে পারে, তাহার উপায় শিক্ষা দেন।

সৌভাগ্যের পরশমণির সূচীপত্র ঃ মানবাত্মা হইতে অনিষ্টকর দোষ ও মন্দ স্বভাব দূর করত ইহাকে উত্তম গুণরাজিতে সুসজ্জিত করাই এই পরশমণির উদ্দেশ্য। দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হওয়াই ইহার প্রধান কার্য, যেমন রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ প্রথম শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً ـ

অর্থাৎ, "আপনি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন এবং সব হইতে একেবারে মুখ ফিরাইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে পৃথক হইয়া আসুন।"

(সূরা মুয্‌যাম্মিল, রুকূ ১, পারা ২৯)

এই আয়াতের ভাবার্থ এই, দুনিয়ার সকল পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যথাসর্বস্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এ গ্রন্থে এই বিদ্যার অতি সংক্ষিপ্ত প্রণালী বর্ণিত হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ বহু বিস্তৃত। গ্রন্থের ভূমিকায় চারটি বিষয়ের সম্যক পরিচয় দেওয়া হইবে এবং মূল গ্রন্থের চারিটি অংশে চারিটি বিষয় বর্ণিত হইবে ও প্রতিটি অংশ দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইবে। ভূমিকার চারটি বিষয় চারি অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। প্রথম ঃ আপনার পরিচয় বা আত্মদর্শন; দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ্‌র পরিচয় বা তত্ত্বদর্শন ; তৃতীয় ঃ দুনিয়ার পরিচয় বা দুনিয়া দর্শন ও চতুর্থ ঃ পরকালের পরিচয় বা পরলোক দর্শন (এই চারিটি বিষয় দর্শন পুস্তকে বর্ণিত হইবে)। এই চারিটি জ্ঞান বাস্তবপক্ষে মুসলমানী জ্ঞানের সূচনা। মুসলমানী কার্যকলাপ চারিটি প্রধান অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে দুইটি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অপর দুইটি হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে। বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দুইটি এই ঃ (১) আল্লাহ্‌র আদেশ

পালন। ইহাকে ইবাদত বলে। (২) গতি, স্থিতি ও জীবিকা অর্জন প্রভৃতি যথানিয়মে নির্বাহ করা। ইহাকে মুআমালা বা সামাজিক ব্যবহার বলে। হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয়দ্বয় এই ঃ (১) মন্দ স্বভাব হইতে হৃদয়কে পাক করা ; যেমন ক্রোধ, কৃপণতা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মভিমান ইত্যাদি মানব চরিত্র ধ্বংস করে এবং মানুষকে ধর্মপথ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (২) আত্মসংশোধন করত সৎস্বভাব অর্জন; যেমন ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্‌র মহব্বত, আশা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি মানবের পরিত্রাণকারী গুণ।

মূল গ্রন্থের চারি খণ্ডের বিষয়সূচী এই

প্রথম খণ্ড ঃ ইবাদত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইবাদত–খণ্ডে দশ অধ্যায়ে লিখিত হইবে। প্রথম ঃ সুন্নত জামাতভুক্ত মুসলমানগণের ধর্মবিশ্বাস। দ্বিতীয় ঃ বিদ্যাশিক্ষা। তৃতীয় ঃ শারীরিক পবিত্রতা। চতুর্থ ঃ নামায। পঞ্চম ঃ যাকাত। ষষ্ঠ ঃ রোযা। সপ্তম ঃ কুরআন শরীফ পাঠ। নবমঃ যিকির ও দু'আ। দশম ঃ অযীফার নিয়ম।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ব্যবহার। ইহারও দশটি অধ্যায় হইবে। প্রথম ঃ পানাহার। দ্বিতীয়ঃ বিবাহ। তৃতীয় ঃ জীবিকা অর্জন ও ব্যবসায়। চতুর্থ ঃ হালাল বিষয় নির্বাচন। পঞ্চম ঃ সংসর্গের নিয়ম। ষষ্ঠ ঃ নির্জন বাসের নিয়ম। সপ্তম ঃ বিদেশ ভ্রমণ। অষ্টম ঃ সংগীত। নবম ঃ সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ। দশম ঃ রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ বিনাশন। ইহাও দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ঃ চরিত্র সংশোধনের সাধনা ও কুস্বভাবে দূর করিবার উপায়। দ্বিতীয় ঃ ভোজন-লিপ্সা ও কামরিপু। তৃতীয়ঃ বাহুল্য কথন-লালসা বর্জনের উপায় ও রসনার আপদ। চতুর্থ ঃ ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়। পঞ্চম ঃ সাংসারাসক্তি ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়। ষষ্ঠ ঃ ধনাসক্তি, কৃপণতা এবং দানশীলতা। সপ্তম ঃ সম্মান-লালসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার প্রতিকার এবং এতদুভয়ের বিপদসমূহ। অষ্টম ঃ রিয়া ও ইহা হইতে অব্যাহতির উপায়। নবম ঃ অহংকার ও আত্মগর্ব। দশম ঃ উদাসীনতা, অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতিকার।

চতুর্থ খণ্ড ঃ পরিত্রাণ। ইহারও দশটি অধ্যায়। প্রথম ঃ তওবা। দ্বিতীয় ঃ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। তৃতীয় ঃ ভয় ও আশা। চতুর্থ ঃ অভাবগ্রস্থতা ও সংসারবিরাগ। পঞ্চম ঃ নিয়ত, সিদ্‌ক ও ইখলাস। ষষ্ঠ ঃ মুরাকাবা ও মুহাসাবা। সপ্তম ঃ তাফাক্কুর। অষ্টম ঃ তাওহীদ। নবম ঃ আল্লাহ্‌র মহব্বত। দশম ঃ মৃত্যুর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা।

উল্লেখিত বিষয়গুলি 'সৌভাগ্যের পরশমণি'র সূচীপত্র। আমরা এই মূল গ্রন্থের ভূমিকায় (অর্থাৎ দর্শন পুস্তকে) চতুর্বিধ দর্শন এবং পরবর্তী চারি খণ্ডে চল্লিশ অধ্যায়ে চতুর্বিদ অনুষ্ঠানের বর্ণনা করিব। সাধারণ লোকের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে লেখনীকে সূক্ষ্মভাবে ও কঠিন ভাষা হইতে বিরত রাখিব। কাহারও এ বিষয়ে

বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমিদ্দীন' 'জাওয়াহেরুল কুরআন' বা এ বিষয়ে লিখিত অপর বড় বড় কিতাবাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞানের কথা বুঝাইবার উদ্দেশ্য তাহাদের প্রার্থনা অনুযায়ী তাহাদের সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় ইহা লিখিত হইল।

প্রার্থনা ঃ তাহাদের সেই নিয়ত ও গ্রন্থ প্রণয়নে আমার সংকল্প যেন আল্লাহ্ পাক-সাফ রাখেন। আমাদের উদ্দেশ্য তিনি রিয়া ও মলিনতা হইতে নির্মল রাখুন এবং আমাদেগকে তাঁহার অনুগ্রহের প্রত্যাশী করিয়া লউন। পুণ্যের পথ আমাদের জন্য তিনি খুলিয়া দিন এবং যাহা বলিব তদনুযায়ী যেন আমল করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করুন। কারণ, যাহা করা হইবে না তাহা বলা বৃথা এবং উপদেশ দিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলে পরকালে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। তদ্রূপ কার্য হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

দর্শন

প্রথম অধ্যায়

আপনার পরিচয় বা আত্মদর্শন

আত্মদর্শনের উদ্দেশ্য ঃ আত্মজ্ঞানই আল্লাহ্-জ্ঞানের কুঞ্জী এই জন্যই বুযুর্গগণ বলেন ঃ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ -

অর্থাৎ "যিনি নিজকে চিনিয়াছেন তিনি আল্লাহ্কে চিনিয়াছেন।"

আল্লাহ্ও এই কারণেই বলেন ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ -

অর্থাৎ, "শীঘ্র আমি তাহাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ পৃথিবীতে ও তাহাদের নিজের মধ্যে দেখাইয়া দিব যতক্ষণ না তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য।" – সূরা হামীম আস-সাজদা, রুকূ ৬, পারা ২৪

আত্মদর্শনের স্বরূপ ঃ জগতে তোমার নিজ দেহ যেমন তোমার নিকটবর্তী অন্য কোন বস্তু তোমার তত নিকটবর্তী নহে। ইহাতেও যদি তুমি নিজেকে চিনিতে না পার তবে অন্যান্য বস্তু কিরূপে চিনিতে পারিবে? তুমি যদি বল, "আমি আমাকে বেশ চিনি", তবে ইহা ভুল। কারণ, এরূপ আত্মজ্ঞান আল্লাহ্র মারিফাতের কুঞ্জী হইতে পারে না। এরূপ জ্ঞান পশুদেরও আছে। তুমি যেমন তোমার বাহ্য হস্ত, পদ, মুখ, মস্তক ও মাংসপেশীর অধিক আর কিছুই চিন না এবং তোমার আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে শুধু এতটুকু বুঝিতে পার যে, ক্ষুধা পাইলে আহার কর, কামভাব প্রবল হইলে স্ত্রী সহবাস কর, পশুগণও ঠিক তদ্রূপই করিয়া থাকে। তোমার হাকীকত জানা তোমার উচিত। তুমি কি? কোথা হইতে আসিলে? কোথায় যাইবে? দুনিয়াতে কেন আসিলে? তোমাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে? তোমার সৌভাগ্য কি এবং কিসে ইহা নিহিত রহিয়াছে? তোমার দুর্ভাগ্য কি এবং কিসে ইহা লুক্কায়িত আছে? তোমার মধ্যে যে সমস্ত গুণ আছে তন্মধ্যে কতকগুলি গুণ চতুষ্পদ জন্তুর, কতকগুলি হিংস্র প্রাণীর, কতকগুলি শয়তানের, আর কতকগুলি ফেরেশতার। এই সকল গুণের মধ্যে কোন্গুলি

এবং কি কি তোমার আসল ও স্বাভাবিক অবস্থায় অনুরূপ? আর কোন্ কোন্‌গুলি অন্য কারণে উৎপন্ন এবং এইগুলি কোন্ ধরনের? যতদিন তুমি এই সকল বিষয় না জানিবে ততদিন তুমি স্বীয় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে না।

পাশব ও ফেরেশতা প্রকৃতি ঃ ঐ সকলের প্রত্যেকেরই জীবিকা ও উন্নতি পৃথক পৃথক। পানাহার, নিদ্রা ও সহবাস দ্বারা ইতর প্রাণীর শরীর পোষণ হয়। শরীর মোটাতাজা ও বলবান হইলেই ইহাদের উন্নতি হইল এবং ইহা তাহাদের সৌভাগ্য। তুমি ইতর প্রাণী হইয়া থাকিলে দিবারাত্র উদর পূরণ ও কাম-রিপুর তোষণে রত থাক। মারামারি করা, হত্যা করা ও বিবাদ-বিসম্বাদ করা হিংস্র জন্তুর স্বভাব। অনিষ্টকারিতা, প্রতারণা ও বাহানা শয়তানের প্রকৃতি। তুমি হিংস্র জন্তু বা শয়তান হইয়া থাকিলে ঐ সকল নিকৃষ্ট কার্যে লিপ্ত হও। তাহা হইলে তুমি স্বীয় পাশব প্রবৃত্তি ও শয়তানী স্বভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়া আরাম পাইবে এবং পশু ও শয়তান যাহাকে সৌভাগ্য মনে করে তদ্রূপ সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইবে। আল্লাহ্‌র অপার সৌন্দর্য দর্শনই ফেরেশতাগণের উপজীবিকা ও এই সৌন্দর্য দর্শন করিয়াই তাঁহারা সৌভাগ্যবান। পাশব প্রবৃত্তি ও শয়তানী স্বভাবের কিছুই তাহাদের মধ্যে নেই। যদি তুমি ফেরেশতাদের প্রকৃতি পাইয়া থাক তবে তদ্রূপ কার্যে রত থাক। তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌কে চিনিতে পারিবে, তাহার সৌন্দর্য দেখিবার পথ পাইবে এবং নিজকে কাম ও ক্রোধের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

মানুষের পশুর প্রকৃতি দিবার উদ্দেশ্য ঃ তোমাকে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাব কেন দেওয়া হইয়াছে, এ কথা ভালরূপে বুঝিয়া না উঠা পর্যন্ত তুমি চিন্তা করিতে থাক। এইজন্য কি দেওয়া হইয়াছে যে, সেই সকল প্রবৃত্তি তোমাকে অধীন করিয়া দিবারাত্র বিনা মজুরীতে দাসত্বে নিযুক্ত রাখিবে? বরং এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাদিগকে তুমি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া রাখিবে এবং পরকালের যে সফরে তুমি প্রবৃত্ত রহিয়াছ ইহার সহায়করূপে তোমার তাবেদার গোলাম বানাইয়া লইবে–একটিকে বাহন ও অপরটিকে হাতিয়ার বানাইবে এবং যতদিন তুমি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততদিন ঐ সকল প্রবৃত্তিকে নিজ কর্মে নিযুক্ত রাখিয়া উহাদের সাহায্যে সৌভাগ্যের বীজ সংগ্রহ করিয়া লইবে। তুমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহকে চড়িবার ঘোড়া বানাইয়া জানুদ্বয়ের মধ্যে দাবাইয়া রাখিয়া সৌভাগ্যের উন্নত স্থান লক্ষ্য করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে। বুযুর্গগণ এই উন্নত স্থানকে 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য' বলিয়া থাকেন এবং সাধারণ লোকে ইহাকে বেহেশত বলে। উপরে যাহা বলা হইল তাহা বুঝিতে পারিলে তুমি নিজের হাকীকত জানিতে পারিবে। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয় বুঝিতে না পারে, ধর্ম-কর্ম তাহার নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। ধর্মের মূলতত্ত্ব হইতে সে বহুদূরে পর্দার অন্তরালে পড়িয়া থাকে।

মানব সৃজনের দ্বিবিধ উপকরণ ঃ তুমি নিজকে জানিতে চাহিলে অবগত হও যে, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিবিধ পদার্থে সৃজন করিয়াছেন। প্রথম–এই বাহ্য দেহ যাহা চর্মচক্ষে দেখা যায় ; দ্বিতীয়–রূহ্ বা আত্মা যাহাকে একমাত্র বাতেনী চক্ষু দেখিতে পারে, উহা চর্মচক্ষের অগোচর।

আত্মা ঃ মানুষের এই আভ্যন্তরিক বস্তুই 'তুমি'। ইহা ব্যতীত আর যতকিছু তোমার সহিত আছে তৎসমুদয়ই উহার অধীন– খালেদ ও লস্কর। আমরা এই আভ্যন্তরীণ মূল বস্তুকে 'দিল' বলিব। যখন এই গ্রন্থে 'দিল' শব্দের প্রয়োগ হইবে তখন মানবের সেই মূল বস্তু আত্মাকেই বুঝাইবে। উহাকে কখন 'রূহ্' আবার কখন 'নফস'ও বলা হইবে। মানুষের বক্ষস্থলের ভিতরে বাম পার্শ্বে যে এক টুকরা গোশ্ত আছে, এ গ্রন্থে 'দিল' শব্দে তাহাকে লক্ষ্য করা হইবে না। এই গোশ্তখণ্ডের মূল্যই বা কি? ইহা তো পশুদেরও আছে এবং মৃতদেহেও থাকে। মানুষের মূল বস্তু দিল বা আত্মা এই চর্মচক্ষে দেখা যায় না। যাহা চর্মচক্ষে দেখা যায় তাহা জড়জগতের অন্তর্গত। আত্মা জড়জগতের পদার্থ নহে; তবে এ জগতে মুসাফিরের ন্যায় আসিয়াছে। ঐ গোশ্তখণ্ড অর্থাৎ হৃদপিণ্ড ইহার বাহন ও হাতিয়ার এবং শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যক্ষ ইহার লস্কার এবং ইহা সমস্ত শরীরের অপ্রতিহত বাদশাহ। আল্লাহ্র মারিফাত লাভ ও তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্যদর্শনই এই আত্মার স্বভাব। ইহার উপরই ইবাদতের দায়িত্বভার রহিয়াছে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হইয়াছে। পাপ-পুণ্যের ফল ইহাকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহার অদৃষ্টেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত আছে। এ সকল বিষয়ে শরীর আত্মার অধীন। আত্মার স্বভাব ও হাকীকত জানাই আল্লাহ্র মারিফাতের কুঞ্জী। আত্মাকে চিনিতে চেষ্টা কর। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রত্ন এবং এই রত্ন ফেরেশতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র দরবার ইহার উৎপত্তি স্থান। ইহা আল্লাহ্র দরবারেই ফিরিয়া যাইবে। আত্মা এ জগতে মুসাফিরের ন্যায় বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের জন্য আগমন করিয়াছে। এই বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের অর্থ ইনশাআল্লাহ্ পরে বর্ণিত হইবে।

আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে না পারা পর্যন্ত তুমি ইহার হাকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) জানিতে পারিবে না। প্রথমে ইহার অস্তিত্ব বুঝিয়া লও, তৎপর ইহার হাকীকত অবগত হইও যে ইহা কি জিনিস। অবশেষে আত্মার সহিত ইহার লস্করের কি সম্বন্ধ রহিয়াছে বুঝিয়া লও। পরিশেষে আত্মার কোন্ কোন্ গুণের প্রভাবে আল্লাহ্র মারিফাত এবং ইহা হইতে কিরূপে সৌভাগ্য লাভ করা যায় জানিয়া লও। এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরে দেওয়া হইবে।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ঃ আত্মার অস্তিত্ব তো সুস্পষ্ট। কারণ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহ্য শরীরের অস্তিত্ব দ্বারা মানবের অস্তিত্বের

প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, মৃত ব্যক্তিরও শরীর থাকে, কেবল প্রাণ থাকে না। আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে শরীর শবে পরিণত হয়। কেহ যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কল্পনাবলে নিজ দেহ, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সব ভুলিয়া যায় তবে নিজ অস্তিত্ব সে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে। সে ব্যক্তি স্বকীয় দেহ, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সব ভুলিয়া গেলেও নিজে যে বর্তমান আছে তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই প্রকারে গভীরভাবে মনোনিবেকশ করিলে পরকাল সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান লাভ হইতে পারে। স্বীয় দেহ ও বহির্জগত ভুলিয়া গেলেও যখন আমাদের অস্তিত্ব থাকে তখন মৃত্যু ঘটনায় আমাদের শরীর কাড়িয়া লইলেও আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, অর্থাৎ আমাদের আত্মা স্থায়ী থাকিবে, কখনও ধ্বংস হইবে না।

আত্মার পরিচয় ঃ আত্মা কি জিনিস এবং উহার স্বাভাবিক গুণ কি, বর্ণনা করিবার অনুমতি শরীয়তে নাই। এই জন্যই রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মার ব্যাখ্যা করেন নাই। আত্মা সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

অর্থাৎ. 'আর লোকে আপনাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলুন– আত্মা আমার প্রভুর হুকুম।"

আত্মা আল্লাহ্র সৃষ্ট এবং আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত। ইহার অধিক বলার অনুমতি নাই। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ -

অর্থাৎ "অবগত হও, সৃষ্টি ও হুকুম করার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে।"

আলমে খাল্ক ও আলমে আম্র দুইটি স্বতন্ত্র জগত। যে সলক বস্তুর দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা এবং সংখ্যা আছে উহাকে আলমে খাল্ক (জড়জগত) বলে। এই জন্য আরবী অভিধানে খাল্ক শব্দের অর্থ আন্দাজ বা পরিমাপ করা লিখিত আছে। আত্মার আকার বা পরিমাপ নাই এবং এইজন্যই ইহাকে ভাগ করা যায় না। আত্মা যদি ভাগ করার উপযুক্ত হইত তবে ইহার এক অংশে কোন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিত এবং অপর অংশ এই সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত। তাহা হইলে আত্মা একই সময়ে একই বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞ উভয়ই হইত। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব। আত্মা বিভাজ্য নহে এবং ইহা পরিমাপেরও যোগ্য নহে ; অথচ আত্মা সৃষ্ট পদার্থ–আল্লাহ ইহাকে সৃজন করিয়াছেন। 'খাল্ক' শব্দের অর্থ যেমন সৃজন করা তদ্রূপ ইহার অপর অর্থ আন্দাজ বা পরিমাপ করা। প্রথম অর্থে আত্মা আলমে খাল্কের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় অর্থে ইহা আলমে খালকের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং আলমে আম্রের অন্তর্গত। যে সকল বস্তুর

আকার নাই, পরিমাণ নাই এবং বিভক্ত হইতে পারে না, তৎসমুদয় আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত।

আত্মা অনাদি নহে। যাঁহারা ইহাকে অনাদি বলিয়া মনে করেন তাহারা ভুল করিয়াছেন। আবার যাঁহারা আত্মাকে 'আরয' বা গুণপদার্থ বলেন তাঁহারাও ভ্রমে পড়িয়াছেন। কারণ, গুণ পদার্থ স্বয়ং বিদ্যমান থাকিতে পারে না–গুণাধার পদার্থের আশ্রয়ে অবস্থান করে। আত্মা যখন মানুষের আসল জিনিস এবং সমস্ত দেহ ইহার অধীন তখন আত্মা কিরূপে গুণপদার্থ হইতে পারে? আবার যাঁহারা আত্মাকে সাকার বা শরীরী বস্তু বলেন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কেননা, শরীরের অংশ হইতে পারে ; কিন্তু আত্মা বিভক্ত হইতে পারে না।

জীবাত্মা বা পরমাত্মা ঃ উপরে যে রূহ বা আত্মার পরিচয় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন মানুষের মধ্যে অপর একটি রূহ আছে। ইহাকে জীবন বলে। ইহা বিভক্ত হইতে পারে এবং ইহা পশুপক্ষীরও থাকে। কিন্তু আমরা যাহাকে রূহ বা আত্মা বলিলাম তাহাই আল্লাহ্‌র মারিফাতের স্থান। পশুপক্ষীর দেহে ইহা বিদ্যমান নাই। ইহা দেহবিশিষ্ট নহে, গুণ পদার্থও নহে; বরং ইহা ফেরেশতাগণের সমজাতীয় এক মৌলিক পদার্থ। ইহার হাকীকত অবগত বড় কঠিন।

আত্মার হাকীকত জানিবার প্রারম্ভের কর্তব্য ঃ আত্মার ব্যাখ্যা করা এবং যাহারা সবেমাত্র ধর্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আত্মার হাকীকত জানিবার তাহাদিগের কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ, ধর্ম-পথ যাত্রীর প্রথম কর্তব্য হইল রিয়াযত মুজাহাদা (কঠোর সাধনা) এবং যে ব্যক্তি যথারীতি রিয়াযত মুজাহাদা করিবে তাহার নিকট আপনা-আপনি আত্মার স্বরূপ খুলিয়া যাইবে। আত্মার পরিচয় লাভের পথ আল্লাহ্‌ই তাহার সম্মুখে খুলিয়া দিয়া থাকেন, যেমন তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

অর্থাৎ "আর যাহারা আমার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে আমার রাস্তা দেখাইব।" –সূরা আনকাবূত, রুকু ৭

যে ব্যক্তি রিয়াযত-মুজাহাদার সকল সোপান অতিক্রম করে নাই তাহার নিকট আত্মার হাকীকত বর্ণনা করিবার অনুমতি নাই। কিন্তু রিয়াযতের পূর্বে আত্মার সৈন্যগুলি চিনিয়া লওয়া উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি আপন সৈন্যের খবর রাখে না সে আবার যুদ্ধ করিবে কিরূপে?

মানবদেহ আত্মার রাজ্য ঃ মানবদেহ আত্মার রাজ্য এবং এই রাজ্যে আত্মার বিভিন্ন প্রকারের সৈন্য আছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ -

অর্থাৎ ঃ 'আর তিনি ব্যতীত প্রভুর সৈন্য সম্বন্ধে কেহই জানে না।'

–সূরা মুদ্‌দাসসির, রুকু ১

এই আয়াতে দেহ রাজ্যের সৈন্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আত্মা পরকালের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্বীয় সৌভাগ্য অনুসন্ধান করা ইহার কার্য। আল্লাহ্ মারিফাত লাভই আত্মার সৌভাগ্য। আবার স্বাভাবিক গুণ দ্বারাই আল্লাহ্‌র মারিফাত লাভ হয় এবং এই সমস্ত কেবল অনুভব করা চলে (জড়জগতের বস্তুর ন্যায় স্পর্শ করা যায় না)। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করা যায়। শরীরে এই সকল ইন্দ্রিয় অবস্থান করে। আত্মা যেন শিকারী, মারিফাত তাহার শিকার এবং ইন্দ্রিয় তাহার ফাঁদ। দেহ আত্মার বাহন এবং ইহার ফাঁদ ও হাতিয়ারসমূহ বহন করিয়া চলে। এই কারণেই আত্মার জন্য দেহের আবশ্যক হইয়াছে।

দেহরক্ষী সৈন্য ঃ উষ্ণতা, পানি, বাতাস এবং মাটি মিলিত হইয়া মানব দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্যই শরীর দুর্বল। অভ্যন্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং বাহিরে পানি, আগুন, হিংস্র জন্তু ও শত্রুর অত্যাচারে মানবদেহ ধ্বংস হইতে পারে। সুতরাং ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাহার পানাহারের প্রয়োজন হইয়াছে এবং তজ্জন্য আত্মার দুই প্রকার সৈন্যেরও আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম-প্রকাশ্য সৈন্য, যেমন–হস্ত, পদ, দন্ত, মুখ, পাকস্থলী ইত্যাদি। দ্বিতীয়– আভ্যন্তরিক সৈন্য, যেমন–পানাহার ইচ্ছা। আবার বাহিরের শত্রু দমনের জন্য দুই প্রকার সৈন্যের আবশ্যক। প্রথম, বাহিরের সৈন্য, যেমন–হস্ত, পদ ও অস্ত্রশস্ত্র। দ্বিতীয়, ভিতরের সৈন্য। যেমন– কামনা, ক্রোধ ইত্যাদি। যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তাহা আত্মারই প্রকার ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। তন্মধ্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় বাহিরের, যথা–দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভিতরের, যথা– খেয়াল, চিন্তা, স্মরণ, কল্পনা, অনুধ্যান– এই পাঁচ শক্তি মস্তিষ্কের পাঁচ ইন্দ্রিয়। এই শক্তিসমূহের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক কার্য নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে একটি দুর্বল বা ধ্বংস হইলে মানুষের সাংসারিক কার্য ও ধর্ম কর্মে ব্যাঘাত ঘটে।

দেহরক্ষী সৈন্য আত্মার অধীন ঃ উপরে যে সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৈন্যের উল্লেখ হইল তৎসমুদয়ই আবার আজ্ঞাধীন। আত্মা সেই সকলের বাদশাহ। আত্মার আদেশক্রমেই জিহ্বার আদেশক্রমেই জিহ্বা কথা বলে, হস্ত ধারণ করে, পথ চলে, চক্ষু দর্শন করে এবং চিন্তাশক্তি চিন্তা করে। উহাদের সম্মতি ও ইচ্ছা অনুসারেই আল্লাহ্ উহাদিগকে আবার আজ্ঞাধীন করিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, উহারা শরীরের

হেফাজত করিবে যাহাতে আত্মা ঐ শক্তির সাহায্যে স্বীয় পাথেয় সংগ্রহ করিতে ও শিকার ধরিয়া লইতে পারে এবং পরকালের বাণিজ্য পূর্ণ করিয়া লইতে ও সৌভাগ্যের বীজ বপন করিতে পারে। ফেরেশতাগণ যেমন, আনন্দের সহিত আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে এবং কখনই আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে না, ঐ সকল সৈন্যও তদ্রূপ আত্মার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

শরীর, আত্মা ও তাহার সৈন্যদের তুলনামূলক পরিচয় ঃ আত্মার সমস্ত সৈন্যের পরিচয় বহু বিস্তৃত। তথাপি মোটামুটি বুঝাইবার জন্য একটি উপমা দেওয়া যাইতেছে। শরীর যেন একটি শহর; হস্ত-পদ ইত্যাদি প্রত্যেকে এক একটি ব্যবসায়ী। লোভ এই শহরের খাজনা আদায়কারী তহশীলদার; ক্রোধ কোতওয়াল; আত্মা বাদশাহ এবং বুদ্ধি উযীর। আপন রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে বাদশাহের ঐসকল কর্মচারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তহ্‌শীলদার লোভ, বড় মিথ্যাবাদী এবং স্বীয় অধিকারের অতিরিক্ত কর্ম করিয়া বসেও বুদ্ধিরূপ উযীরের আদেশ অমান্য করে। সে রাজস্বের বাহানায় রাজ্যের সকল ধন সর্বদা আত্মসাৎ করিয়া লইতে চায়। কোতওয়াল ক্রোধ বড় দুষ্ট, বদমেজাজ ও তেজীয়ান। খুন-জখম করিতে সে বড় ভালবাসে। অপরাপর বাদশাহ যেমন সব কার্যে স্বীয় মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করেন, মিথ্যাবাদী ও লোভী তহশীলদারগণকে কানমলা দিয়া সোজা করিয়া রাখেন, মন্ত্রীর পরামর্শের বিপরীত তাহাদের কোন কথাই শ্রবণ করেন না, দুষ্ট সীমা অতিক্রমকারীদিগকে দমন রাখবার জন্য কোতওয়াল নিযুক্ত করেন, আবার কোতওয়ালকেও দমন রাখেন, আইনের বাহিরে একপদও যাইতে দেন না এবং সর্বপ্রকার রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন, তদ্রূপ আত্মারূপ বাদশাহ্‌র স্বীয় দেহ রাজ্যের শাসনকার্যে বুদ্ধিরূপ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিলে এবং লোভ ও ক্রোধকে দমন করত উহাদিগকে বুদ্ধির অধীন করিয়া রাখিলে এইরূপ শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ হইলে আত্মা সৌভাগ্যের পথে চলিয়া নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। অপর পক্ষে ক্রোধ ও লোভ যদি বুদ্ধিকে বন্দী করিয়া গোলাম বানাইয়া রাখে তবে দেহ-রাজ্য ও হতভাগ্য বাদশাহ উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল যে, দেহরক্ষার জন্য আল্লাহ্ ক্রোধ ও লোভ সৃষ্টি করিয়াছেন। পানাহার গ্রহণ করিয়া দেহরক্ষার জন্য লোভের সৃষ্টি এবং শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রোধের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রোধ ও লোভ দুইটিই শরীরের খেদমতগার। পানাহার শরীরের খোরাক। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বহন করিবার জন্য শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং শরীর এই সকল ইন্দ্রিয়ের খাদেম। আবার আত্মার পক্ষে প্রদীপের কার্য করিবে বলিয়া বুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে যেন এই প্রদীপের আলোকে আত্মা আল্লাহ্‌র মহান দরবার দর্শন করিতে পারে। ইহাই আত্মার জন্য

বেহেশত। এই হিসাবে বুদ্ধি আবার আত্মার খাদেম। আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য দর্শনের জন্যই আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে। আত্মা যখন আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য দর্শনে একেবারে বিভোর হইয়া পড়ে তখন সে তাঁহার উপযুক্ত বান্দা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ "আর একমাত্র আমার ইবাদত করিবার জন্যই জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া এই রাজ্য, সৈন্য ও দেহরূপ বাহন এইজন্য প্রদান করা হইয়াছে যে, ইহা জড়জগত হইতে সর্বোচ্চ ইল্লীন পর্যন্ত আরোহণ করিবে। কেহ যদি এই মহাদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বন্দেগীর কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে বাদশাহের ন্যায় স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক একমাত্র আল্লাহ্‌কে তাহার লক্ষ্যস্থল ও কিবলা করিয়া লইতে হইবে এবং পরকালকে আপন স্থায়ী বাসস্থান ও দুনিয়াকে পান্থশালা বিবেচনা করিতে হইবে। তৎপর শরীরকে বাহন, হস্ত পদকে খেদমতগার, বুদ্ধিকে উযীর, লোভকে ধন-রক্ষক, ক্রোধকে কোতওয়াল এবং ইন্দ্রিয়গণকে গুপ্তচর বানাইয়া প্রত্যেককে পরজগতের সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত রাখা কর্তব্য। মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে যে চিন্তাশক্তি আছে ইহা সংবাদ সংগ্রহকারী চরগণের অধিনায়ক এবং চরগণ প্রত্যেকটি সংবাদ এই অধিনায়কের নিকট উপস্থিত করে তাহার পর মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে যে স্মরণশক্তি আছে তাহা ঐ সংগৃহীত সংবাদসমূহের রক্ষক এবং সে উহা অধিনায়ক চিন্তাশক্তির নিকট হইতে লইয়া হিফাজতে রাখে ও উপযুক্ত সময়ে বুদ্ধি রূপে উযীরের নিকট পেশ করে। এইরূপ সংগৃহীত সংবাদ অনুসারে উযীর দেহ- রাজ্যের কার্য পরিচালনা করে এবং বাদশাহের পরকাল-সফরের উপায় অবলম্বনে তৎপর থাকে। উযীর যদি দেখিতে পায় যে, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পরিচালকদের মধ্যে কেহ বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়াছে, অধীনতা বর্জন করিয়াছে ও ডাকাতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তবে বুদ্ধিরূপ উযীর তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাদিগকে অধীন করিয়া লইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করে না। কারণ, উহাদের অভাবে দেহ-রাজ্যের কার্য কখনও সুচারুরূপে চলে না। এইজন্য নানা উপায়ে উহাদিগকে এমনভাবে বশীভূত করে উহারা যেন আত্মার গন্তব্যপথে রক্ষ ও সাহায্যকারী হয়। শত্রু না হয়ে বরং মিত্রের ন্যায় সঙ্গী থাকে, চুরি ডাকাতি না করে। এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আত্মা সৌভাগ্যবান হয়, আল্লাহ্ প্রদত্ত অসীম অনুগ্রহের হক আদায় করিবার উপযোগী হইয়া উঠে এবং তাহার বন্দেগী করিয়া তৎপরিবর্তে উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ্‌র নিকট মহা পুরস্কার পাইয়া থাকে। অপরপক্ষে উক্তরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া

উহার বিপরীত কাজ করিতে আত্মা বিদ্রোহী, ডাকাত ও শত্রুদলের সহিত মিলিত হইয়া নিমকহারাম ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে তাহাকে এই গর্হিত কার্যের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

মানব প্রকৃতিতে চতুর্বিধ স্বভাব

মানবের আভ্যন্তরিক প্রত্যেক লস্করের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে এবং এইজন্যই মানবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও পৃথক পৃথক স্বভাব উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি মন্দ-ইহারা মানবকে ধ্বংস করে; আর কতকগুলি ভাল-এইগুলি মানুষকে সৌভাগ্যের উন্নত সোপানে লইয়া গিয়া মহা সম্মান প্রদান করে। এই সমস্ত স্বভাব যদিও বহুবিধ তথাপি উহাদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ (১) চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব, (২) হিংস্র জন্তুর স্বভাব, (৩) শয়তানের স্বভাব ও (৪) ফেরেশতার স্বভাব।

মানুষের মধ্যে লোভ ও কামপ্রবৃত্তি আছে বলিয়া তাহার আহার গ্রহণ ও স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি নিকৃষ্ট জন্তুর কাজে প্রবৃও হয়, ক্রোধ আছে বলিয়া তাহার কুকুর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, গালিগালাজ করিয়া থাকে। ছলনা-প্রতারণা ও অপরের সঙ্গে বিবাদ- বিসম্বাদের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে বলিয়াই তাহারা শয়তানের কাজ করে। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আছে বলিয়া তাহারা ফেরেশতার কাজও করিয়া থাকে, যেমন-জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ,মন্দ কার্যে বিরাগ, অপরের মঙ্গল কামনা, জঘন্য কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নিজ সম্মান রক্ষা করা, আল্লাহর মারিফাত লাভ করত সন্তুষ্ট হওয়া এবং অজ্ঞানতা ও মুর্খতাকে লজ্জাকর বিবেচনা করা।

বাস্তব পক্ষে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে কুকুর স্বভাব, শূকর স্বভাব, শয়তান-স্বভাব ও ফেরেশতা স্বভাব-এই চারিপ্রকার স্বভাব বিদ্যমান আছে। কুকুর স্বীয় আকৃতি, হস্ত, পদ ও চর্মের জন্য সে মন্দ-কুকুর মানুষ দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া আক্রমণ করিতে যায়। শূকরও আপন গঠনের দোষে ঘৃণিত। কুকুর ও শূকরের আত্মা যে নীচ ইহাই তাহার মূল কথা। মানুষের মধ্যেও ঐ দুই প্রকার প্রবৃত্তি বর্তমান আছে। এইরূপে মানুষের মধ্যে শয়তান স্বভাব এবং ফেরেশতা স্বভাবের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বুদ্ধির আলোকে ফেরেশতাদের জ্যোতি ঃ ইহার সাহায্যে শয়তানের ছল-চাতুরি ধরিয়া ফেলিবার জন্য মানুষকে আদেশ করা হইয়াছে। তাহা করিলেই মানুষ অপদস্থ হইবে না এবং শয়তানও তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না এই মর্মেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক মানুষের জন্য এক একটি শয়তান আছে। কিন্তু আল্লাহ তাহার উপর আমাকে জয়ী করিয়াছেন এবং সে আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আর সে আমাকে মন্দ কার্যের নির্দেশ দিতে পারে না।"

খাহেশরূপ শূকর ও ক্রোধরূপ কুকুরকে দমন করিয়া এইরূপ বুদ্ধির অধীনে স্থাপন করিবার জন্য মানুষ আদিষ্ট হইয়াছে যেন উহারা বুদ্ধির আদেশ ব্যতীত চলিতে ফিরিতে না পারে। যে ব্যক্তি খায়েশ ও ক্রোধকে বুদ্ধির অধীন করিবে সে সৌভাগ্যের বীজস্বরূপ সৎস্বভাব লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার বিপরীত করিয়া নিজেই খাহেশ ও ক্রোধের দাস হইয়া পড়িলে তাহার মধ্যে কতগুলি জঘন্য স্বভাব বিকাশ পাইবে। উহাই তাহার দুর্ভাগ্যের বীজস্বরূপ হইয়া থাকিবে। তাহার প্রকৃত অবস্থা স্বপ্নে বা জাগরণে যদি তাহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হয় তবে সে দেখিতে পাইবে যে, একটি শূকর, কুকুর বা শয়তানের সম্মুখে সে ব্যক্তি করজোড় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন মুসলমানকে কাফিরের অত্যাচারে নিঃসহায় পরিত্যাগ করিলে কাফির যেমন মুসলমানের দূর্দশার একশেষ করিয়া থাকে। লোকে যদি বিচার ও চিন্তা করিয়া দেখে তবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা দিবারাত্র নফসানী খাহেশের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। প্রকাশ্য আকৃতিতে তাহাদের মানুষরূপে দেখা গেলেও কিয়ামতের দিন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের মানুষরূপে দেখা গেলেও কিয়ামতের দিন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বাহির হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের আকৃতিও তখন তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী হইবে। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত সে তখন ব্যাঘ্র বা কুকুরের আকার ধারণ করিবে। এই জন্য কথিত আছে, "যে ব্যক্তি স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখিতে পায়, তাহার অর্থ জালিম লোক; কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শূকর দেখিলে ইহার অর্থ অপবিত্র নোংরা লোক।" নিদ্রা মৃত্যুর নমুনাস্বরূপ। নিদ্রার প্রভাবে মানুষ এই জগত হইতে যত দূরবর্তী হইতে থাকে ততই তাহার আকৃতি ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি বাহ্য আকৃতি তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। এ-সকল গভীর রহস্যের কথা। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই পুস্তকে সমাবেশ হইবে না।

প্রবৃত্তি বিশেষের অনুসরণে ভাব বিশেষের উৎপত্তি

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, মানুষের প্রতি আদেশ জারি করিবার ও তাহাকে চালাইবার জন্য চারি প্রকার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন্‌টির অধীনতায় তোমার গতিবিধি ও কাজকর্ম চলিতেছে, তাহা তোমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। আর ইহাও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লও যে, তুমি যে কার্যই কর না কেন, তাহার ফলস্বরূপ তোমার আত্মায় এক প্রকার গুণ বা ভাব উৎপন্ন হইবে এবং এই সকল গুণ বা ভাব পরকালেও তোমার সঙ্গে থাকিবে। এই গুণকেই স্বভাব বলে। মানব স্বভাব উল্লিখিত চারি প্রকার হুকুমদাতা প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। তুমি খাহেশরূপ শূকরের অধীন হইয়া চলিলে তোমার স্বভাবে অপবিত্রতা, নির্লজ্জতা, লোভ-চাটুকারিতা, হিংসা ইত্যাদি কুস্বভাবের উৎপন্ন হইবে। অপরপক্ষে এই শূকরকে

দাবাইয়া রাখিলে তোমার মধ্যে অল্পে তুষ্টি, লজ্জাশীলতা, বিচক্ষণতা, পবিত্রতা, নির্লোভতা, বিনয় ইত্যাদি সদগুণ প্রকাশিত হইবে। আবার ক্রোধরূপ কুকুরের বশীভূত হইলে দুঃসাহস, অপবিত্রতা, দাম্ভিকতা, গর্ব, অহংকার, প্রভু-প্রিয়তা, ভর্ৎসনা, অত্যাচার, অপরের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি স্বভাব তোমাতে প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সেই কুকুরকে শাসনে রাখিতে তোমার মধ্যে ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ক্ষমতা, স্থিরতা, বীরত্ব, নীরবতা, সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি সদগুণ প্রকাশিত হইবে। যে শয়তানী প্রবৃত্তি পূর্বোক্ত শূকর-প্রকৃতিতে প্রলুব্ধ করিয়া দুঃসাহসিক করিয়া তোলে ও প্রতারণা শিক্ষা দেয় তাহার বশবর্তী হইয়া চলিলে তোমাকে প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, হিংসা-বিদ্বেষ, ছলনা প্রভৃতি কুস্বভাব প্রকাশিত হইবে। পরন্তু তুমি যদি সেই শয়তানী প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া রাখ ও তাহার ধোঁকায় না পড় এবং বুদ্ধির লস্করকে বলবান করিয়া তোল তবে তোমাতে বিজ্ঞতা, জ্ঞান, কৌশল, নিপুণতা, সৎস্বভাব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব প্রভৃতি সদগুণ প্রকাশিত হইবে। এই সকল সদগুণ চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকিবে এবং তোমার মৃত্যুর পর উহা স্থায়ী সৎকার্যের প্রস্রবণ ও তোমার সৌভাগ্যের বীজ হইবে।

পাপ-পুণ্য ঃ যে সকল কর্মে মন্দ গুণ ও মন্দ স্বভাব জন্মে উহাদিগকে পাপকর্ম বলে। অপরপক্ষে যে সকল কার্যে সদ্‌গুণ ও উত্তম স্বভাবের উৎপন্ন হয় উহাদিগকে পুণ্যকর্ম বলে। মানুষের সকল গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ পাপ-পুণ্য এই দুই অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না।

আত্মা দর্পণ সদৃশ ঃ মানবাত্মা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মন্দ স্বভাবে ধোঁয়া ও অন্ধকারসদৃশ। ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিয়া ফেলে। ইহা কিয়ামত দিবসে মানবকে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে বঞ্চিত রাখিবে। পরন্তু সৎস্বভাব উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ। ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আত্মার মলিনতা ও পাপ দূর করিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا -

অর্থাৎ "প্রত্যেক মন্দ কার্যের পর সৎকার্য কর। কারণ সৎকার্য অসৎ কার্য মিটাইয়া দেয়।"

কিয়ামত দিবসে মানবাত্মা উজ্জ্বল সৌন্দর্যবিশিষ্ট বা অন্ধকারাবৃত মলিন হইয়া বিচারক্ষেত্রে উত্থিত হইবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট নিষ্কলঙ্ক আত্মা লইয়া আসিবে সে ব্যতীত অপর কেহই নাজাত পাইবে না।"

সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মা এমন লৌহের ন্যায় থাকে যদ্দ্বারা স্বচ্ছ দর্পণ নির্মিত হয়। লৌহ-দর্পণে যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে, আত্মার মধ্যেও তদ্রূপ বিশ্বের সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। কিন্তু লৌহ-দর্পণকে অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে না পারিলে উহা মরিচার ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা তখন প্রতিবিম্ব ধারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে। আত্মার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এই সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তাহা নহে, বরং নিজ কর্মের দোষে তাহাদের আত্মার উপর মরিচা পড়িয়াছে।"

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঃ এখানে প্রশ্ন হইতে পরে–মানুষের মধ্যে যখন ইতর প্রাণীর স্বভাব, শয়তানের স্বভাব ও ফেরেশতার স্বভাব বিদ্যমান আছে তখন কিরূপে জানিব যে, ফেরেশতার স্বভাবই মানুষের আসল গুণ–উহা ব্যতীত আর সকল গুণ ও স্বভাবই নৈমিত্তিক? আবার কেমন করিয়াই বা বুঝিব যে, মানুষ কেবল ফেরেশতা স্বভাব অর্জনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে– অন্য গুণের জন্য নহে? তবে শোন ; তাহা হইলেই বুঝিবে, ইতর প্রাণী ও হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পূর্ণতার একটি শেষ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এবং কেহই এই সীমা অতিক্রম করিয়া অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আর যাহার উন্নতি যে সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সীমা পর্যন্ত উন্নতি করিবার জন্যই তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। একটি উপমা দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ঘোড়া গাধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, গাধা শুধু ভারবহনের জন্যেই সৃষ্ট, কিন্তু ঘোড়া গাধার ন্যায় ভারও বহন করিতে পারে, আবার যুদ্ধের সময় যোদ্ধাকে পৃষ্ঠে লইয়া তাহার ইঙ্গিত অনুসারে চলাফেরা করিবার ক্ষমতাও রাখে। এই জন্যই গাধা অপেক্ষা ঘোড়ার শ্রেষ্ঠত্ব অধিক। ঘোড়া যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে না পারে তবে গর্দভত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন গর্দভের ন্যায় ভারবহন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। ইহা ঘোড়ার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতি ও অধোগতি। তদ্রূপ কোন কোন লোক পানাহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভোগের জন্যই মানব সৃষ্টি হইয়াছে মনে করিয়া কেবল এই সকল কার্যেই স্বীয় পরমায়ু ধ্বংস করে। আবার কোন কোন সম্প্রদায় আরবী ও তুর্কীদের ন্যায় মনে করে যে, অপরকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই দুইটি মতই ভ্রমাত্মক। কেননা, পানাহার, স্ত্রীসম্ভোগ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সম্পন্ন হয়। এই প্রবৃত্তি ইতর জন্তুরও আছে। বরং উটের পানাহার শক্তি ও বাবুই পক্ষীর কাম-শক্তি মানুষের অপেক্ষা অনেক অধিক।

এমতাবস্থায় পানাহার, মৈথুন কার্যে উন্নতি লাভই যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে কিরূপে মানুষকে উট ও বাবুই পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে? অপর পক্ষে অন্যকে পরাজিত করা ক্রোধের কার্য। হিংস্র জন্তুরও ক্রোধ আছে। অতএব নিকৃষ্ট প্রাণী ও হিংস্র জন্তুর প্রকৃতিতে যে ভাব আছে তাহা মানুষের মধ্যেও আছে। তবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? কেবল বুদ্ধির জন্যই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনিতে পারে এবং তাঁহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য ও বিস্ময়কর কারিগরি জানিতে পারে। বুদ্ধিবলেই মানুষ নিজকে কাম, ক্রোধ ও লোভের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। ইহাই ফেরেশতার স্বভাব। ইহার প্রভাবেই মানুষ পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। বরং জগতে যাহা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য নিয়মাধীন করা হইয়াছে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

অর্থাৎ "আর যাহা কিছু আকাশে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তৎসমুদয় তিনি তোমাদের জন্য নিয়মাধীন করিয়া দিয়াছেন।"

মানুষের নিত্য ও অনিত্য গুণ ঃ যে গুণ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার মূল কারণ, উহাই তাহার আসল ও নিত্য গুণ। এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত গুণই নৈমিত্তিক অর্থাৎ অন্য কারণে আগত ও অনিত্য। এই অনিত্য গুণগুলি মানুষকে কেবল পূর্ণতা লাভে সাহায্য করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই মানুষ যখন মরে তখন কাম, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু আর তাহার সহিত থাকে না। কিন্তু তখনও দুইটি বস্তুর কোন একটি অবিচ্ছেদ্যরূপে তাহার সহিত থাকে। তন্মধ্যে (১) একটি মানুষের আসল মূল বস্তু ; ইহা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ্র মারিফাতে সুশোভিত। ইহা মৃত্যুর পরেও আপনা-আপনিই নেককার লোকের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় থাকিয়া যায়। ইহাই ফেরেশতাগণেরও চিরসাথী এবং তাঁহার এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা আল্লাহর সন্নিধানে উপস্থিত থাকেন। নেক্কার লোকদের আত্মাও তদ্রূপ সুশোভিত হইয়া আল্লাহ্র সান্নিধানে বিরাজ করিবে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ -

অর্থাৎ "সত্য আসনে ক্ষমতাশীল বাদশাহের নিকট (উপবিষ্ট) থাকিবে।" অপর (২) বস্তুটি মৃত্যুর পর বদকার লোকের সঙ্গে থাকে। ইহা কলঙ্ক-কালিমাপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাপের প্রভাবে মানবাত্মার মরিচা ধরে বলিয়া ইহা কলঙ্ক-কালিমাপূর্ণ এবং জীবিতাবস্থায় সে অন্যের প্রতি ক্রোধ ও অবিচার করিয়া আরাম পাইতে বসিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুকালে এই সকল কুপ্রবৃত্তি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ; কিন্তু

তাহার আত্মার মুখ ইহাদের দিকেই থাকে। কারণ, তাহার সকল লোভনীয় দ্রব্য জীবনের লক্ষ্যবস্তু এই জগতেই থাকিয়া যায়। আর এই জগৎ পর জগতের নিম্নে বলিয়া বদ্‌কারগণ পরকালে ঊর্ধ্ব-পদ অধো মস্তক অবস্থায় থাকে। এই অর্থেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

(অর্থাৎ "আক্ষেপ, যদি তুমি দেখ যখন পাপীগণ আপন পালনকারীর নিকট নিজেদের মাথা নীচু করিয়া থাকিবে।" (সূরা সিজদা, রুকূ ২, পারা ২১)

এই প্রকার বদকার লোক শয়তানের সহিত সিজ্জীনে নিপতিত হইবে। সিজ্জীনের অর্থ সকলে জানে না। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ -

অর্থাৎ "আর সিজ্জীন কি তোমাকে কিসে জানাইবে?"

আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ আত্মা জগতের আশ্চর্যসমূহের শেষ নাই। সৃষ্টজগতে আত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এইজন্যই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু বহু লোকে ইহা জানে না। আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের দুইটি কারণ আছে, যথা-(১) জ্ঞান ও (২) শক্তি। আত্মার জ্ঞানজনিত শ্রেষ্ঠত্ব আবার দুই প্রকার। ইহার একটি সকলেই বুঝিতে পারে এবং অপরটি নিতান্ত গুপ্ত এবং অতি উত্তম। শেষোক্তটি অতি দুর্লভ। আত্মার জ্ঞানজনিত প্রকাশ্য শ্রেষ্ঠত্ব হইল সকল বিদ্যা ও যাবতীয় শিল্পকৌশল জানিবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে আত্মা সকল শিল্পকৌশল শিক্ষা করিতে পারে এবং ইহার বলেই মানুষ লিখিত বিষয় পাঠ করিতে পারে ও শিখিতে পারে। অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ ও ধর্মনীতি এই ক্ষমতাবলেই আয়ত্ত হয়। এই ক্ষমতার প্রভাবেই আত্মা এমন পদার্থ যে, ইহা বিভক্ত হইতে পারে না, অথচ ইহাতে সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সমাবেশ হইতে পারে। এমনকি, মরুভূমির মধ্যে সামান্য বালুকণা যেমন লুকাইয়া যায় তদ্রূপ সমস্ত জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানও আত্মার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। চিন্তাবলে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী হইতে আকাশে এবং বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিচরণ করিতে পারে। ভূতলে থাকিলেও ইহা আকাশমণ্ডল জরিপ করিতে পারে, এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারে ; সাগরতল হইতে মৎস্যকে কৌশলে উত্তোলন করিতে পারে ; আকাশ বিহারী পক্ষীকে কৌশলে ভূতলে নামাইতে পারে এবং উট, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি অতি শক্তিশালী প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে। বিশ্বের আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞান ইহার ব্যবসায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা এই জ্ঞান আহরণ করে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আত্মার দিকে সকল ইন্দ্রিয়ের এক একটি পথ খোলা রহিয়াছে। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে,

জড়-জগতের দিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন হৃদয়ের পাঁচটি দ্বার, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের দিকেও হৃদয়ের একটি প্রশস্ত দ্বার খোলা আছে। অধিকাংশ লোকেই কেবল জড়জগতকেই অনুভূতির বিষয় এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকেই জ্ঞানের দ্বার বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই ধারণা সঙ্কীর্ণতা প্রসূত ও অমূলক।

জ্ঞানের দিকে হৃদয়ের যে বহু দ্বার খোলা রহিয়াছে ইহার দুইটি প্রমাণ আছে। প্রথম, স্বপ্ন। নিদ্রিত অবস্থায় প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের আভ্যন্তরিক জ্ঞানদ্বার খুলিয়া পড়ে। তখন আলমে আরওয়াহ্ ও লওহে মাহ্ফূজের অজ্ঞাত বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা কখনও পরিষ্কারভাবে স্পষ্টত দেখা যায়, আবার কখনো সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সাদৃশ্যে দেখা যায় তখন স্বপ্নের অর্থ করিয়া বুঝিতে হয়। লোকে মনে করে জাগরিত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে জ্ঞান লাভে সমর্থ অথচ জাগ্রত অবস্থায় গায়েবের কোন বিষয়ই নয়নগোচর হয় না। স্বপ্নতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে সমাবেশ হইবে না। তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

স্বপ্ন তত্ত্ব ঃ আত্মা দর্পণতুল্য এবং লওহে মাহ্ফূজও একখানা দর্পণস্বরূপ ; ইহাতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার ছবি অঙ্কিত আছে। একটি স্বচ্ছ আয়নাকে চিত্রিত আয়নার সম্মুখে ধরিলে স্বচ্ছ আয়নাতে যেমন চিত্রিত আয়নার ছবি প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ নির্মল আত্মা লওহে মাহ্ফূজের সম্মুখীন হইলে ইহাকে অঙ্কিত সমস্ত বস্তু ও ঘটনার ছবি নির্মল আত্মার মধ্যে পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। তবে লওহে মাহ্ফূজের ছবি আত্মায় প্রতিফলিত হওয়ার উপযোগী করিতে হইলে ইহাকে পাপের মলিনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মল রাখিতে হয় এবং জড়জগতের সহিত ইহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করত ইহাকে লওহে মাহ্ফূজের সম্মুখীন করিতে হয়। আত্মা যতক্ষণ আত্মা ও লওহে মাহ্ফূজের মধ্যে এক আবরণ বিদ্যামান থাকে। নিদ্রার সময়ে আত্মার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া আপনা আপনিই আধ্যাত্মিক জগত নয়নগোচর হয়। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য স্থগিত থাকিলেও খেয়াল বাকি থাকে। এই জন্যই আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়সমূহ পরিষ্কাররূপে দেখা না গিয়া সাদৃশ্যে উপমাস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মানুষ মরিয়া গেলে খেয়াল বা ইন্দ্রিয় কোনটাই থাকে না; তখন সকল আবরণ বিদূরিত হয় এবং বিশ্বজগতের সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে আত্মার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেই সময় আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় ঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

অর্থাৎ "অনন্তর তোমা হইতে তোমার পর্দা তুলিয়া লইয়াছি, অতঃপর তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইল।" উত্তরে আত্মা বলিবে ঃ

رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ "হে আমাদের রব, আমরা দেখিলাম ও শুনিলাম ; আমাদিগকে পুনরায় পাঠাও ; আমরা সৎকাজ করিব। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী আছি।"

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার জ্ঞানদ্বার যে খোলা আছে তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই দুনিয়াতে এমন কোন লোক নাই যাহার হৃদয়ে ইলহামের মধ্যস্থতায় অন্তর্দৃষ্টি ও শুভ প্রেরণা জাগরিত না হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়পথে আসে না, বরং হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। উহা কোথা হইতে আসে লোকে জানে না। ইহাতে বুঝা গেল যে, সকল জ্ঞান শুধু বাহ্যজগত হইতে হয় না এবং আত্মা এই জড়জগতের নহে, বরং আধ্যাত্মিক জগত দর্শনে উহারা স্বভাবতই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব, মানুষ যতদিন জড়জগতের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন না করিবে ততদিন আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পথ পাইবে না।

জাগ্রতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের উপায় ঃ প্রিয় পাঠক, মনে করিও না যে, স্বপ্ন ও মৃত্যু ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতের দিকে আত্মার দ্বার খোলে না। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনা করে ক্রোধ-লোভাদি রিপুসমূহ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখে, মন্দ স্বভাব হইতে আপনাকে পবিত্র রাখে, নির্জনে চক্ষু বন্ধ করত উপবেশনপূর্বক জড়জগত হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে এবং অপর দিকে আধ্যাত্মিক জগতের সহিত আত্মার সংযোগ স্থাপন করত রসনা দ্বারা নহে বরং হৃদয় হইতে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' 'যিকির করিতে থাকে, এমনকি নিজকে ও সমস্ত বিশ্বজগত ভুলিয়া যায়–এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই তাহার খবর থাকে না, তবে জাগ্রত অবস্থায়ও তাহার অন্তর্দ্বার খোলা থাকিবে। লোকে স্বপ্নে যাহা দেখিতে পায় এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেই তাহা দেখিতে পাইবে, ফেরেশ্তাগণ মনোহর মূর্তিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে আর সে ব্যক্তি পয়গম্বরগণকে দেখিতে পাইবে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবে, আস্মান-যমীনের সমস্ত রাজ্য তাহার নয়নগোচর হইবে। যাহার প্রতি এই পথ খোলা হইয়াছে, তিনি বিশ্বজগতের আশ্চর্য আশ্চর্য তামাশা দেখিতে পান এবং এমন এমন ব্যাপার তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় যাহা বর্ণনাতীত। এই অবস্থা সম্বন্ধেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমাকে সমস্ত জগত দেখানো হইয়াছে। অনন্তর আমি বিশ্বের পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেখিয়াছি।" আল্লাহ্ও এই অবস্তা সম্বন্ধেই বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ 'আর তদ্রূপ আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কে আসমান ও যমীনের সমস্ত রাজ্য দেখাইয়াছি।'

সমস্ত পয়গম্বরের জ্ঞান এইরূপেই হাসিল হইয়াছিল ; ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা শিক্ষার পথে অর্জিত হয় নাই। তাঁহাদের রিয়াযত মুজাহাদাই এই জ্ঞানের মূল উৎস ঃ যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً -

অর্থাৎ "সব সম্বন্ধ ছিন্ন করত কেবল তাঁহার (আল্লাহ্‌র) দিকে আস, সব ছাড়িয়া তাঁহাকেই স্মরণ কর। নিজকে আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে ছাড়িয়া দাও। দুনিয়া অর্জনে লিপ্ত হইও না, তিনি সকল কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন।" তিনি আরও বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً -

অর্থাৎ "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই। অনন্তর তাঁহাকেই কার্যনির্বাহ ধর।" তুমি যখন আল্লাহ্‌কে কার্যনির্বাহক ধরিলে তখন বেপরোয়া থাক এবং দুনিয়ার সহিত আর মিলিত হইও না। আল্লাহ্ তৎপর বলে ঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً -

অর্থাৎ "আর তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহাতে তুমি সবর কর এবং তাহাদিগকে সদ্‌ভাবে ছাড়িয়া দাও।"

জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ হইতে কিরূপ সাধনা ও পরিশ্রম করিতে হয় তাহা শিক্ষা পাওয়া যায়। তদনুযায়ী আমল করিতে লোকের সহিত শত্রুতা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থে লিপ্ততা প্রভৃতি দোষ হইতে হৃদয় নির্মল হইয়া উঠে। ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করত এরূপ জ্ঞান লাভ করা আলিমগণের তরীকা। ইহা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু নবীগণের তরীকার তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ। আম্বিয়া আওলিয়াগণ বিনা উস্তাদে আল্লাহ্‌র দরবার হইতে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা মানবের নিকট হইতে অর্জিত জ্ঞান হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। বিনা উস্তাদে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা বহু অভিজ্ঞতা যুক্তি প্রমাণে সাব্যস্ত হইয়াছে। তুমি যদি স্বীয় স্বাভাবিক অনুরাগ প্রভাবে তদ্রূপ অবস্থা লাভ করিতে না পার, উস্তাদের উপদেশও লাভ করিতে অক্ষম হও এবং যুক্তি-প্রমাণেও বুঝিতে না পার তথাপি অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, সেইরূপ অবস্থায় উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা মানুষের আছে ঃ তাহা হইলেও তুমি অবিশ্বাসী হইয়া এই তিন শ্রেণী হইতে বহির্গত হইবে না। এই সকল অন্তরজগতের বিস্ময়কর ব্যাপার এবং উহা হইতেই আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আত্মার আদিম অবস্থা ঃ উক্ত প্রকার জ্ঞান শুধু পয়গম্বরগণের একচেটিয়া, তাঁহার ব্যতীত আর কেহই উহা লাভ করিতে পারে না, এরূপ মনে করিও না। বরং সকল মানবাত্মাই আদিম অবস্থায় তদ্রূপ উপযুক্ত থাকে। সৃষ্টিগতভাবে এমন কোন লোকই নাই যাহা স্বচ্ছ আয়না তৈরির উপযোগী নহে, যাহাতে বিশ্বজগতের সকল পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু লৌহে মরিচা ধরিয়া ইহাকে আসলেই নষ্ট করিয়া দিলে ইহার প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা আর থাকে না। আত্মার অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সংসারের লোভ, কুপ্রবৃত্তি ও পাপ দ্বারা আত্মা আচ্ছাদিত ও কলুষিত হইলে উহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এই সম্বন্ধেই হাদীসে উক্ত আছে ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَ يُنَصِّرَانِهٖ وَيُمَجِّسَانِهٖ -

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মানব সন্তানই মুসলমানরূপে জন্মগ্রহণ করে। তৎপর তাহাদের মাতাপিতা যে যেইরূপ তাহাদিগকে ইয়াহুদী খ্রিস্টান বা অগ্নি উপাসকরূপে পরিণত করে। সকল মানবই জ্ঞান লাভে উপযুক্ত। তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى -

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তাহারা বলিল– হ্যাঁ।"

কোন ব্যক্তি যদি অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে–দুই কি এক অপেক্ষা অধিক নহে? উত্তরে সকলেই বলিবে–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অধিক। যদিও ইহার যথার্থ সকলে শুনে নাই, মুখেও বলে তথাপি সকলের হৃদয়েই ইহার সত্যতা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তদ্রূপ আল্লাহ্র সম্বন্ধে জ্ঞানও সৃষ্টিগতভাবে সকলের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ -

অর্থাৎ, "আর যদি আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন–কে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে– আল্লাহ্।"

তিনি আরও বলেন ঃ

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا -

অর্থাৎ "যে প্রকৃতির উপর মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রকৃতি।"

যুক্তি-প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, বিনা উস্তাদে জ্ঞান লাভ ও অদৃশ্য বস্তু দর্শন কেবল পয়গম্বরদের একচেটিয়া নহে। কারণ পয়গম্বরগণও মানুষ। আল্লাহ্ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -

অর্থাৎ, "বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহি।"

নবী ও ওলী ঃ যে ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ জ্ঞানের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে যদি আল্লাহ্ জগতের মঙ্গল কিসে হয় তাহা শিক্ষা দেন এবং তিনিও বিশ্ববাসীকে আহ্বান করত তদনুযায়ী হিদায়েত করেন তবে তিনি আল্লাহ্র নিকট হইতে যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন তাকে শরীয়ত বলে ও তাঁহাকে নবী বলা হয়। নবীর অলৌকিক কার্যকলাপকে মু'জিযা বলে। আর তদ্রূপ ব্যক্তি যদি সমস্ত বিশ্ববাসীকে আহ্বানপূর্বক হিদায়েত করিবার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত না হন তবে তাঁহাকে ওলী বলে এবং তাহার অলৌকিক কার্যকলাপকে কারামত বলে। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে বিভূষিত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আপনা-আপনিই বিশ্বমানবের হিদায়েত কার্যে লিপ্ত হওয়া জরুরী নহে। বরং আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতায় এক এক ব্যক্তিকে যোগ্যতানুসারে এক এক কার্যে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। কোন ওলীকে বিশ্বের হিদায়েতের ভার অর্পণ না করার বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। হয়ত তখন শরীয়ত জীবিত আছে এবং তজ্জন্য বিশ্ববাসীকে নূতনভাবে আর শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই অথবা জগতের শিক্ষাগুরু হওয়ার জন্য নবীগণের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক উহা তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে নাই।

ওলীর উন্নত অবস্থা সাধনাসাপেক্ষ ঃ ওলীগণের আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তি ও কারামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আর জানিয়া রাখ যে, ওলীগণের এই উন্নত অবস্থা প্রথমত কঠোর সাধনার উপর নির্ভর করে– বিনা সাধনায় ওলী হওয়া যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষিকার্য করে সে শস্যও পাইবে, যে ব্যক্তি পথ চলে সে গন্তব্যস্থানেও পৌঁছিবে এবং যে অনুসন্ধান করে সে বাঞ্ছিত বস্তুও লাভ করিবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। যে কার্য যত গৌরবের ইহার শর্তাবলীও তত অধিক এবং ইহা অর্জন করাও ততই দুষ্কর। জ্ঞানলাভের কার্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ কার্য, তন্মধ্যে আল্লাহ্র পরিচয়–জ্ঞান সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। বিনা সাধনা ও মুর্শিদে-কামিল ব্যতীত এই পথে চলা যায় না। আবার উপযুক্ত সাধনা ও মুর্শিদে কামিল থাকিলেও আল্লাহ্র সাহায্য না হইলে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে সেইরূপ সৌভাগ্য অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ না থাকিলে গৌরবের সেই উন্নত সীমায় উপনীত হওয়া যায় না। জাহেরী ইল্মে নেতৃত্ব লাভ ও যাবতীয় কার্যের বেলায়ই এ কথা খাটে।

আত্মার ক্ষমতাজনিত শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মানবাত্মার জ্ঞানজনিত শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিত বর্ণিত হইল। এখন ইহার ক্ষমতাজনিত শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা হইতেছে। এই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বও ফেরেশতাদের এক গুণ, এ গুণ পশুপক্ষীর নাই। জড়জগতের কার্য পরিচালনার জন্য ফেরেশতাগণ নিযুক্ত আছেন। জগতের পক্ষে যখন বৃষ্টি হিতকর ও আবশ্যক হয় তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁহারা বসন্তকালে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করেন, বাচ্চাদানিতে জীবের মূর্তি এবং জমিতে উদ্ভিদের আকার গঠন করত বর্ধিত করেন। এক এক রকম কার্যে এক এক শ্রেণীর ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। মানবাত্মাও ফেরেশতা জাতির অন্তর্ভুক্ত। আত্মাকেও আল্লাহ্ ক্ষমতা দিয়াছেন এবং জড়জগতের কিয়দংশ ইহার অধীন করিয়া রাখিয়াছেন।

স্বীয় দেহে আত্মার অপ্রতিহত ক্ষমতা ঃ যে সকল বস্তু আত্মার অধীনে আছে তন্মধ্যে স্বীয় দেহই প্রধান। কারণ, দেহের কোন অঙ্গেই আত্মা আবদ্ধ নহে; অথচ সমস্ত দেহই আত্মার আদেশে চলে। যেমন, আত্মা অঙ্গুলীর মধ্যে নহে, ইহাতে জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তিও নাই ; অথচ আত্মার আদেশে অঙ্গুলী পরিচালিত হয়। হৃদয়ের ক্রোধের সঞ্চার হইলে সমস্ত শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। ইহা বারিবর্ষণ তুল্য। কামভাব হৃদয়ে প্রবল হইলে শরীরে একপ্রকার আন্দেলনের সৃষ্টি হয় এবং ইহার গতি অঙ্গ বিশেষের দিকে পরিচালিত হয়। অন্তরে আহারের ইচ্ছা হইলে রসনার নিম্নস্থ এক প্রকার শক্তি খেদমতের জন্য প্রস্তুত হয় এবং খাদ্যদ্রব্য ভিজাইবার জন্য লালা রস বাহির করে যাহাতে আহার্যবস্তু সহজেই উদরস্থ হইতে পারে। এই সকল বিষয় হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শরীরের উপর আত্মার প্রভুত্ব চলিতেছে এবং শরীর আত্মার অধীন।

অন্যান্য পদার্থের উপর আত্মার প্রভাব ঃ ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল আত্মা অতি শ্রেষ্ঠ ও বলবান এবং যে সকল আত্মায় ফেরেশতাগণের মাত্রা বেশি, স্বীয় শরীর ব্যতীত অন্যান্য পদার্থও তাহাদের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মার প্রতাপ সিংহ-ব্যাঘ্রের উপর পড়িলে তাহারাও নম্র ও অধীন হইয়া পড়ে। আবার কোন সুস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সে পীড়িত হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তিকে নিকট পাইতে ইচ্ছা করিলে সেও তাঁহার নিকট আগমনের ইচ্ছা করে। তদ্রূপ ব্যক্তি বৃষ্টি পাইতে চাহিলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আত্মার যে এই প্রকার ক্ষমতা আছে তাহা যুক্ত দ্বারা প্রমাণ করার যায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত সত্য। বদনযর ও যাদু এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সকল বস্তুর উপরই মানবাত্মার প্রভাব আছে। হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি যদি কোন পশুর দিকে বদনজর করত ইহাকে বিনাশ করিতে চায় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; তেমনি হাদীস শরীফে উক্ত আছে–"বদনজর মানুষকে কবরে ও উটকে ডেগে লইয়া যায়।" আত্মার ক্ষমতাসমূহের মধ্যে ইহা একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা।

মু'জিযা, কারামত ও যাদু ঃ পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তদ্রূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইলে উহাকে মু'জিযা ও ওলীগণের মাধ্যমে প্রকাশ পাইলে উহাকে কারামত বলে এই প্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সৎকার্যে প্রবৃত্ত থাকিলে তাঁহাকে ওলী বলে এবং অন্যায়কার্যে লিপ্ত থাকিলে তাহাকে যাদুকর বলে। যাদু, মু'জিযা, কারামত, এই সমস্তই মানবাত্মার অলৌকিক ক্ষমতার কার্য। কিন্তু উহাদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। এই প্রভেদের বিস্তারিত বর্ণনা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবেশ হইবে না।

নবূওতের হাকীকত ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা যে ব্যক্তি ভালরূপে বুঝতে না পারিবে সে নবূওতের হাকীকত বুঝিতে পারিবে না ; তবে অপরের মুখে শুনিয়া এতটুকু বুঝিতে পারিবে যে, নবুয়ত ও বেলায়েত মানবাত্মার অতি গৌরবান্বিত সোপানসমূহের অন্যতম। এরূপ উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত লোক তিন প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, যথা–(১) স্বপ্নে সর্বসাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পায়, তাহারা জাগ্রতাবস্থায় তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারেন। (২) সর্বসাধারণের আত্মা কেবল নিজ শরীরের উপরই আধিপত্য চালাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা জগতের মঙ্গল সাধনে স্বীয় শরীর ব্যতীত সমস্ত বস্তুর উপর আধিপত্য চালাইতে পারে। (৩) সাধারণ লোক যে ইল্‌ম উস্তাদের নিকট শিক্ষা করিয়া লাভ করে, তাঁহারা ইহা বিনা উস্তাদে স্বীয় হৃদয়ে লাভ করিয়া থাকেন। যাহাদের বুদ্ধি একটু প্রখর ও আত্মা কতকটা পবিত্র তাহারা বিনা শিক্ষায় কোন কোন বিদ্যা লাভ করিতে পারেন। এমত অবস্থায় যাঁহারা অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাঁহাদের আত্মা খুব পবিত্র, তাঁহারা বিনা উস্তাদে নিজে নিজে প্রচুর ইল্‌ম বা সমস্ত ইল্‌ম লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রকারে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইল্‌মে লাদুনী বলে যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ـ

অর্থাৎ "আর আমি তাহাকে আমার নিকট হইতে ইল্‌ম শিখাইয়াছিলাম।" (সূরা কাহাফ, রুকূ ৮, ১৫ পারা। যে ব্যক্তি উক্ত ত্রিবিধ গুণে গুণান্বিত, তিনি শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরগণের বা শ্রেষ্ঠ ওলীগণের অন্তর্ভুক্ত। যাহার মধ্যে এই তিনটি গুণের একটি থাকে। তিনিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে তাঁহারা এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কারণ কাহারও মধ্যে ঐ ত্রিবিধ গুণই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে অতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁহার নবূওতের উন্নত অবস্থার কথা অবগত হইয়া যাহাতে বিশ্ববাসী তাঁহার অনুসরণ করে এবং সৌভাগ্যের পথ পায় তজ্জন্য আল্লাহ্ উক্ত তিনটি গুণের প্রত্যেকটিরই আভাসমাত্র সকলকেই দান করিয়াছেন। এই কারণেই কেহ স্বপ্নে দেখেন ; কেহ বা স্বীয় প্রভাবে অপরের বুদ্ধি সুপথে পরিচালিত করেন, আবার কেহ বা স্বীয় হৃদয়কে

বিনা উস্তাদে জ্ঞানলাভের উপযোগী পাইয়া থাকেন। যে বস্তুর জ্ঞান নাই তৎপ্রতি লোকে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। কারণ, যাহার ছায়ামাত্রও হৃদয়ে নাই তাহার আকৃতি কখনও বুঝা যায় না। এই জন্যই আল্লাহ্‌র হাকীকত আল্লাহ্ ব্যতীত যথাযথভাবে অপর কেহই বুঝিতে পারে না। এই বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা বহু বিস্তৃত। 'মাআনী আসমা ইল্লাহ্' কিতাবে স্পষ্ট দলিলের সহিত আমি ইহা বর্ণনা করিয়াছি।

ওলী ও পয়গম্বরগণের গুণ সাধারণের ধারণাতীত ঃ মোটকথা এই, উপরে যে তিন প্রকার গুণের কথা বলা হইল উহা ছাড়া আর বহু উৎকৃষ্ট গুণ তাঁহাদের আছে যাহার ছায়াও সাধারণের মধ্যে নহে এবং আমরা সৎসমুদয় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আল্লাহ্ ব্যতীত যেমন কেহ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে না, তদ্রূপ পয়গম্বরকেও পয়গম্বর ব্যতীত অপর কেহই সম্যকরূপে চিনতে পারে না। তবে পয়গম্বর নিজকে এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর তাঁহাকে চিনতে পারেন। মানুষের মধ্যে পয়গম্বরগণের মর্যাদা কেবল পয়গম্বরগণই জানেন। আমরা ইহার অধিক আর কিছুই জানি না। আমরা যদি নিদ্রার অবস্থা না জানিতাম এবং কেহ আমাদিগকে বলিত—"অমুক ব্যক্তি বেহুঁশ ও নিশ্চল অবস্থায় কিছুক্ষণ ভূতলে পতিত ছিল তখন সে দেখিতে ও শুনিতে পায় নাই এবং কি ঘটিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারে নাই, কতক্ষণ পর আবার দেখিতে শুনিতে লাগিল, তবে ইতিপূর্বে তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিত না এবং আমরাও উহা বিশ্বাস করিতাম না। কারণ, মানুষ যাহা দেখে নাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ـ

অর্থাৎ "বরং যে বিষয় (কুরআন) তাহাদের জ্ঞানে বেড় পাইল না এবং যাহার মত তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইল না ইহাকে তাহারা মিথ্যা জানিল।"

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "আর যখন তাহারা (কুরআনের দ্বারা) পথ পায় নাই তখন নিশ্চয়ই বলিবে যে, ইহা একটি পুরাতন মিথ্যা।"

ওলী ও পয়গম্বরগণের এমন গুণ আছে যাহার সন্ধানও অপর লোকে জানে না এবং তাঁহারা ইহার কারণে এক অনির্বচনীয় সুখাস্বাদ ভোগ করেন ও অলৌকিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই কথা শুনিয়া তুমি আশ্চর্যবোধ করিও না। কারণ, তুমি জান যে কবিতার প্রতি যাহার আসক্তি নাই, সুরভঙ্গি নাই, সুরভঙ্গিতে সে কোন আনন্দ পায় না। কবিতার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তিকে কেহই কবিতার মাধুর্য বুঝাইতে পারে না, কেননা সে

কবিতা সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। এইরূপ জন্মান্ধ ব্যক্তি বর্ণ-বৈচিত্র্য ও দর্শনের সুখ অনুভব করিতে পারে না। এ বিষয়েও আশ্চর্যবোধ করিও না যে, আল্লাহ্ পয়গম্বরগণকে নবুয়ত প্রদান করার পর আরও কতকগুলি এমন গুণ ও অবস্থা প্রদান করেন যাহা তৎপূর্বে তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

জাহেরী ইল্ম রূহানী ইল্মের অন্তরায় ঃ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা গেল এবং সূফীগণের পথ কি, তাহাও প্রকাশ পাইল। তুমি হয়ত শুনিয়া থাকিবে যে, সুফীগণ বলেন, জাহেরী ইল্ম তাঁহাদের পথের অন্তরায় এবং হয়ত তুমি ইহা অস্বীকারও করিয়া থাকিবে। তুমি একথা অবিশ্বাস করিও না। সূফীগণের একথা সত্য। কারণ, তুমি যদি জড়জগত ও জড়জগতের জ্ঞান লইয়াই মশগুল থাক তবে তুমি সূফীগণের উন্নত অবস্থা হইতে দূরে বহুদূরে এক পর্দার অন্তরালে পড়িয়া থাকিবে। মানবাত্মা কূপসদৃশ। পাঁচ ইন্দ্রিয় যেন এই কূপের পাঁচটি নালা ইন্দ্রিয়রূপ নালাপথে বাহিরজগতের জ্ঞানীরূপ পানি সর্বদা আত্মারূপ কূপে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। কূপের তলদেশ হইতে পরিষ্কার পানি বাহির করিবার তোমার ইচ্ছা থাকিলে প্রথমে নালা কয়টিকে বন্ধ করিয়া দাও, যাহাতে বাহিরের পানি ভিতরে আসিতে না পারে। তৎপর কূপে সঞ্চিত সমস্ত পানি ও কর্দমাদি বাহির করিয়া ফেল। অবশেষে কূপের তলদেশে খনন কর। তাহা হইলে দেখিবে, পাতাল হইতে পরিষ্কার পানি আসিয়া কূপ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। যতক্ষণ পূর্বসঞ্চিত পানিতে কূপ পরিপূর্ণ থাকে এবং বাহির হইতে পানি আসিবার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ পাতাল হইতে নির্মল পানি উঠিতে পারে না। এইরূপ, যতক্ষণ বাহ্য জ্ঞান মন হইতে বিদূরীত না হইবে ততক্ষণ আত্মার অভ্যন্তর হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু আলিম যদি অর্জিত ইল্ম হইতে স্বীয় হৃদয় খালে করিয়া ফেলে এবং উহাতে লিপ্ত না থাকে তবে তদ্রূপ ইল্ম তাহার জন্য অন্তরাল হয় না বরং তাহার অন্তর্চক্ষু খুলিয়া যায় এবং নির্মল ইল্ম তাহার হৃদয়ে উৎপন্ন হইতে থাকে। এমনিভাবে জড়জগতের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের সম্মিলনে হৃদয়ে যে সকল খেয়ালের উদয় হয় তৎসমুদয় হইতে হৃদয় মুক্ত রাখিলে উহা আর তত্ত্বজ্ঞানের পথে অন্তরাল হইবে না। অর্জিত ইল্ম এ পথে অন্তরাল কেন হয় এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদাসমূহ শিক্ষা করিয়াছেন, এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের যাবতীয় আবশ্যক দলিল প্রমাণাদিও সংগ্রহ করিয়াছেন, নিজকে সম্পূর্ণরূপে উহাতেই লিপ্ত রাখিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন যে, এই ইল্ম ব্যতীত আর ইল্মই নাই। এমতাবস্থায় তাহার হৃদয়ে কোন নূতন জ্ঞানের উদ্ভব হইলে তিনি বলিবেন– "যাহা আমি শিখিয়াছি ইহা তাহার বিপরীত এবং যাহা আমার জ্ঞানের বিপরীত তাহা মিথ্যা।" এই প্রকার লোকের জন্য কোন কিছুর হাকীকত উপলব্ধি করা

একেবারে অসম্ভব। কারণ সাধারণ লোককে তাঁহারা যে আকীদা শিখাইয়া থাকেন তাহা হাকীকতের ছাঁচমাত্র, আসল হাকীকত নহে। অস্থি হইতে যেমন মজ্জা বাহির হয় তদ্রূপ সেই ছাঁচ হইতে যে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয় তাহাকেই আসল হাকীকত ও পূর্ণ মা'রিফাত বলে। যে আলিম ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য কেবল তর্ক-বিতর্কের কৌশল শিক্ষা করেন তাঁহার প্রতি হাকীকত প্রকাশ পায় না। কারণ এমন আলিম মনে করেন, "সমস্ত ইল্‌মই আমি শিখিয়া লইয়াছি।" এইরূপ ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের পথে তাহার অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা সামান্য ইল্‌ম শিখিয়াছেন তাঁহাদের মনে এই ধারণা বলবান থাকে। এই জন্যই তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ও পর্দার অন্তরালে থাকেন। কিন্তু যে আলিম তদ্রূপ ধারণা করেন না তাঁহার নিকট অর্জিত ইল্‌ম কিছুমাত্র বাধা জন্মায় না ; বরং অজ্ঞানতার সমস্ত পর্দা তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদূরিত হয়, তাঁহার কাশ্‌ফ হইতে থাকে এবং তিনি পূর্ণতা লাভ করেন। প্রথম হইতে জ্ঞানের পথে যাহার পদ দৃঢ় হয় নাই তাহার পথ হইতে তদ্রূপ আলিমের পথ খুব ভয়শূন্য ও সরল। যে ব্যক্তি আলিম নহে সে হয়ত দীর্ঘকাল কোন মিথ্যা খেয়ালে জড়িত থাকে এবং ফলে সামান্য সন্দেহই তাহার পক্ষে প্রবল অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আলিম এরূপ বিপত্তি হইতে নিরাপদে থাকেন।

জাহেল ভণ্ড সূফী ঃ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি বাহ্য ইল্‌মকে প্রকৃত ইল্‌মের পথে অন্তরাল বলেন তবে তাঁহার কথা অবিশ্বাস না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। কিন্তু আজকাল কতক লোক বাহির হইয়াছে, তাহারা অবৈধকে বৈধ বলিয়া থাকে। এই হতভাগারা রিপুর দাস। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অবস্থা তাহারা কখনই প্রাপ্ত হয় নাই ; কেবল সূফীদের রচিত কতকগুলি রহস্যময় বাক্য মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। পরহিযগারী দেখাবার জন্য বারবার শরীর ধৌত করে, সূফীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, জায়নামায ইত্যাদি দ্বারা শরীর সজ্জিত রাখে এবং ইল্‌ম ও আলিমগণের নিন্দা করিতে থাকে। তাহারা মানুষের মধ্যে শয়তান, আল্লাহ্ ও রাসূলের দুশমন ; তাহারা হত্যার উপযোগী। কারণ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সা) ইল্‌ম ও আলিমের প্রশংসা করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতবাসীকে ইল্‌ম শিখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই হতভাগারা সূফীদের অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই এবং ইল্‌মও শিখে নাই। এমতাবস্থায় ইল্‌ম ও আলিমের নিন্দা করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে বৈধ হইতে পারে? এই সকল হতভাগা এমন ব্যক্তির ন্যায় যে লোকমুখে শুনিয়াছে পরশমণি স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহার সাহায্যে অপরিমিত স্বর্ণ প্রস্তুত করা যায়। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া সে তাহার সম্মুখে স্থাপিত অপরিমিত স্বর্ণরাশি গ্রহণ না করিয়া বলিতে লাগিল—"স্বর্ণ কি কাজে লাগে? ইহার মূল্যই বা কতটুকু? আমি পরশমণি চাই, পরশমণিই স্বর্ণের মূল।" এই বলিয়া সে স্বর্ণ গ্রহণ করিল না। অথচ সে পরশমণি কখনও দেখেও নাই এবং জানেও

না যে, ইহার কেমন পদার্থ। এই প্রকার লোক নিতান্ত হতভাগা, নিঃস্ব ও অতৃপ্ত থাকে। 'স্বর্ণ অপেক্ষা পরশমণি শ্রেষ্ঠ' বাক্য আওড়াইয়া ইহার আনন্দে বেচারা বিভোর থাকে এবং এই প্রকার আরও বহু লম্বা লম্বা কথা বানাইতে থাকে।

আম্বিয়া-আউলিয়া ও আলিমগণের মরতবার তুলনা ঃ আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) পরশমণিতুল্য এবং আলিমগণের ইল্‌ম স্বর্ণসদৃশ। আর স্বর্ণের মালিক অপেক্ষা পরশমণির মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববিষয়ে অধিক। কিন্তু এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে। মনে কর, এক ব্যক্তির নিকট এতটুকু পরশমণি আছে যাহার সাহায্যে এক শতের অধিক স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা যায় না ; কিন্তু অপরজনের নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কিছুতেই অধিক হইতে পারে না। বর্তমানকালে পরশমণি প্রস্তুত বিদ্যার বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে এবং বহু লোক ইহার অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছে। কিন্তু ইহার হাকীকত অতি অল্প লোকেই জানেন। বহু অনুসন্ধানকারী এ বিষয়ে প্রতারিত হইয়া থাকে। আজকালকার সূফীদের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত সূফীইজম তাহাদের মধ্যে নাই। কেহ কেহ ইহার সামান্য অংশ পাইয়াছেন। সুফী ইজমে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। এমতাবস্থায় যাহার মধ্যে সূফীদের অবস্থার কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে তিনি কখনই প্রত্যেক আলিম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ সূফীর ভাগ্যে এমন অবস্থা ঘটে যে, প্রথম প্রথম তাঁহাদের প্রতি সূফীদের ভাব সামান্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী না হইয়া অচিরেই বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহারা আর পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না। আবার এমন কতক সূফী আছেন যাঁহাদের উপর অলীক পাগলামী ও অসার কল্পনা প্রবল থাকে অথচ উহাকে তাঁহারা সত্য বলিয়া মনে করেন। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে সত্য-মিথ্যা উভয়ই থাকে। সূফীদের অবস্থার মধ্যেও তদ্রূপ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ থাকে। যে সকল সূফী এমন কামিল হইয়াছেন যে, যে ইল্‌ম অপর লোকে উস্তাদের নিকট শিক্ষা করে তাহার তাঁহারা বিনা উস্তাদে স্বয়ং আল্লাহ্ হইতে লাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা ধর্ম-শাস্ত্রভিজ্ঞ আলিম হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সূফী নিতান্ত বিরল। অতএব, সূফীগণের আসল জ্ঞানের পথে ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস স্থাপন কর। একালের ভণ্ড সূফীদের আচরণ দেখিয়া প্রকৃত সূফীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না। ভণ্ড সূফীদের যাহারা ইল্‌ম ও আলিমকে তিরস্কার করে তাহারা নিজেদের মূর্খতার কারণেই ইহা করিয়া থাকে।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাতে মানবের সৌভাগ্য নিহিত ঃ এখন হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, কিরূপে বুঝিব যে, আল্লাহ্‌র মা'রিফাতে মানুষের সৌ্যভাগ্য নিহিত আছে? উহার উত্তর বুঝিবার পূর্বে কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। যে কাজে সুখ ও আরাম পায়, সেই কাজেই তাহার সৌভাগ্য নিহিত আছে। আবার প্রকৃতি যাহা চায় তাহাতেই সুখ ও আরাম আছে এবং যে জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে প্রকৃতি তাহাই চাহিয়া থাকে—যেমন কামনার বস্তু পাইলেই কামপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেই ক্রোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় ; সুন্দর বস্তু দর্শনে চক্ষু তৃপ্ত হয় এবং সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে কর্ণ চারিতার্থ হয়। এইরূপ, যে কার্যের জন্য আত্মা সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা ইহার প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাতেই আত্মার তৃপ্তি নিহিত আছে। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ-দর্শন ও প্রত্যেক বিষয়ের সত্যানুসন্ধান আত্মার কার্য এবং উহাই আত্মার প্রকৃতি। বাসনা-কামনা চতুষ্পদ জন্তুরও আছে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহারাও জড়পদার্থের অবস্থা অবগত হইতে পারে। কিন্তু স্বরূপ-দর্শন ও সত্যানুসন্ধান আত্মা ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা করা যায় না। এজন্যই অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে মানব মনে এত আগ্রহ এবং অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ গর্ব করে। এমনকি কেহ যদি দাবা খেলার ন্যায় মন্দ কার্যও শিখিতে ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি এ বিষয়ে পটু তাহাকে যদি কেহ নিষেধ করিয়া বলে যে, এ খেলা আর কাহারও শিখাইও না তবে এই নিষেধ প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। আর সে যে এক বিস্ময়কর খেলা জানে এই আনন্দে সে বাহাদুরী দেখাইতে চায়।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাতে আত্মার পরম তৃপ্তি ঃ এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, জ্ঞানের মধ্যে আত্মার তৃপ্তি নিহিত আছে। ইহাও জানিয়া রাখ, যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান আত্মার নিকট তত আনন্দদায়ক হইবে। এইজন্যই কেহ মন্ত্রিত্বের রহস্য জানিতে পারিলে আনন্দিত হয়। তৎ পর সেই ব্যক্তির নিকট যদি বাদশাহের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে এবং সে রাজ্যসংক্রান্ত সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তবে তাহার আনন্দ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে। দাবা-খেলায় পটুতা প্রদর্শন অপেক্ষা যে ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার, আয়তন ইত্যাদি নির্ণয় করিতে পারে সে অধিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দাবা-খেলায় পটু সে দাবার গুটিস্থাপনে সক্ষম ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। এইরূপ পরিজ্ঞাত বিষয় যত অধিক উৎকৃষ্ট হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও তত অধিক উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক হইবে।

আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণেই সৃষ্টি মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং তিনি সমস্ত বিশ্বের বাদশাহ। বিশ্বের সমস্ত আশ্চর্য বস্তু তাঁহারই শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন। সুতরাং অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার মা'রিফাতের তুল্য উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক

হইতে পারে না। তাঁহার দীদার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দীদার আর নাই এবং আত্মা তাঁহার দীদার লাভের জন্যই উৎসুক। কারণ, যে উদ্দেশ্যে যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে সেজন্যই উহা উৎসুক হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত লাভের আগ্রহ নাই সে এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যাহার আহারে ইচ্ছা নাই এবং রুটি অপেক্ষা মাটিই তাহার নিকট অধিক ভাল লাগে। চিকিৎসা করাইয়া এমন রোগীর মাটিভক্ষণের ইচ্ছা বিদূরিত করত আহারে রুচি পুনরায় জন্মাইতে না পারিলে সে দুনিয়াতে বড় হতভাগ্য এবং সে ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপ, যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মা'রিফাত অপেক্ষা অপর বস্তুর আগ্রহ অধিক সে হৃদয়ও পীড়াগ্রস্ত। এমন আত্মা দুর্ভাগা হইয়া পরকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

মা'রিফাতের অবিনশ্বর ঃ ভোগেচ্ছা ও পার্থিব বস্তুর সুখের সম্বন্ধ একমাত্র শরীরের সঙ্গেই থাকে। মৃত্যুকালে এই সম্বন্ধ আপনা-আপনিই ছুটিয়া যায় এবং সেই সমস্ত ভোগেচ্ছা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে যত পরিশ্রম করে তাহাও ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্‌র মারিফাতের আনন্দ আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, মৃত্যুর পর ইহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কারণ, আত্মা মরিবে না, এবং মারিফাত স্থায়ী থাকিবে, বরং মৃত্যুর পর আত্মা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন আত্মা দুনিয়ার মোহ ও রিপুসমূহের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া পাড়িবে; এইজন্যই মা'রিফাতের আনন্দ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষভাগে 'পরিত্রাণ' খণ্ডে 'মহব্বত' অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।

মানব-দেহের বৈচিত্র ঃ মানবাত্মা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহাই এ গ্রন্থে যথেষ্ট। কেহ ইহার অধিক জানিতে চাহিলে আমা কর্তৃক লিখিত 'আজায়েবুল কুলূব' গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই যে পূর্ণ আত্মপরিচয় লাভ হইবে, তাহা নহে। কারণ আত্মা পুরা মানুষের এক অংশ; অপর অংশ শরীর এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আত্মার গুণসমূহের কতকগুলি মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। দেহ-নির্মাণের মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য রহিয়াছে। মানুষের প্রতিটি বাহ্য অঙ্গ ও প্রতিটি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য বৈচিত্র্য ও অনন্ত কৌশল রহিয়াছে। মানব-দেহে বহু সহস্র শিরা, স্নায়ু ও অস্থিখণ্ড আছে। ইহাদের প্রতিটির আকৃতি ও গুণ বিভিন্ন প্রকার এবং প্রতিটির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। তোমরা অনেকেই এই বিষয়ে অবগত নও। কেবল এতটুকু জান যে, ধারণ করিবার জন্য হস্ত, চলিবার জন্য পদ এবং বলিবার জন্য জিহ্বার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা দশটি পর্দা দিয়া চক্ষু তৈয়ার করিয়াছেন এবং দশটি পর্দা বিভিন্ন প্রকারের। এই দশটির মধ্যে শুধু একটির অভাব হইলে দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটে। এই সকল পর্দা কোন সৃষ্ট হইয়ছে এবং ইহাদের একটির অভাবে দৃষ্টিশক্তির কেন ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হয়ত তোমরা জান না। এখন ভাবিয়া দেখ, চক্ষু একটি বাহিরের অঙ্গ এবং এ সম্বন্ধে বহু বিদ্বান লোক অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় এই বাহ্য অঙ্গের অবস্থাও যখন সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পার না তখন হৃদপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, ফুসফুস প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি কেন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা না জানাতে কি বিস্ময়ের কারণ আছে? আমাদের ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পরিপক্ক হয় এবং উহাকে রক্তে পরিণত করত সমস্ত দেহের গঠন ও রক্ষণের উপযোগী করিবার জন্য হৃদপিণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত বিশোধিত হওয়ার সময় নিচে কিছু গাদ সঞ্চিত হয় এবং এই গাদ শ্লেষ্মায় পরিণত হয়। প্লীহা এই শ্লেষ্মা লইয়া ইহাকে একপ্রকার হরিদ্রবর্ণ ফেনায় পরিণত করে। ইহাই পিত্তরস। যকৃত এই পিত্তরস ছাঁকিয়া রক্তকে পরিষ্কার করে। হৃদপিণ্ড হইতে রক্ত বাহির হওয়ার সময় ইহাকে বিভিন্ন উপাদানের সমতা থাকে না এবং উহা খুব পাতলা থাকে। ফুসফুস হইতে পানি ছাঁকিয়া লয় এবং রক্ত তখন গাদ ও পিত্তরস হইতে বিমুক্ত সমতাপ্রাপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। যকৃতে পীড়া হইলে ইহা আর রক্ত ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিতে পারে না। এই কারণেই পাণ্ডুরোগ ও নানারূপ পিত্তরোগ জন্মে। প্লীহার কোন রোগ দেখা দিলে রক্তের সহিত গাদ থাকিয়া যায়। তখন ইহার রক্তের সহিত সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়া নানারূপ রোগের উৎপন্ন করে। ফুসফুসের কোন বিকার দেখা দিলে রক্তে পানি থাকিয়া যায় এবং এই কারণেই জলন্দর রোগের উৎপন্ন হয়। একই প্রকার মানবদেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র তা'আলা পৃথক পৃথক কার্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটির অভাব হইলেই সমস্ত দেহ বিগড়াইয়া যায়।

মানবদেহে বিশ্বজগতের নমুনা ঃ মানবদেহ ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমস্ত বিশ্বের নমুনা রহিয়াছে। বিশ্বজগতে যাহা আছে তৎসমুদয়ের নমুনা এই ক্ষুদ্র দেহে পাওয়া যায়। দেহের অস্থিখণ্ড জগতের পাহাড়তুল্য, ঘাম বৃষ্টিসদৃশ, লোমসমূহ বৃক্ষ, মস্তিষ্ক আকাশ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নক্ষত্ররাজি স্বরূপ। এই সকলের বিবরণ বহু বিস্তৃত। মোট কথা, জগতে যত প্রকার সৃষ্ট জীব আছে যেমন–শূকর, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ফেরেশতা প্রভৃতি জীবজন্তুর সাদৃশ্য মানব-শরীরে বিদ্যমান আছে। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। এমনকি, মানব– সমাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির নমুনাও মানব–শরীরে পাওয়া যায়। যে শক্তি পাকস্থলীতে ভূক্তদ্রব্য হজম করে তাহা বাবুর্চিতুল্য। যে শক্তি ভূক্তদ্রব্যকে রসে পরিণত করত হৃদপিণ্ড ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে পৌঁছাইয়া দেয় উহা তেলী সদৃশ। যে শক্তি পরিপক্ক রসকে হৃদপিণ্ডে লোহিতবর্ণ রক্তে পরিণত করে তাহাকে রংরজক বলা যাইতে পারে। যে শক্তি রক্তকে মাতৃস্তনে দুগ্ধে ও পুরুষের অণ্ডকোষে শ্বেতশুক্রে পরিণত করে তাহাকে ধোপা বলা চলে। যে শক্তি ভূক্ত দ্রব্য ও রক্তকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায় তাহাকে ভারবাহী মুটিয়া বলা যায়। যে শক্তি পানিকে ফুসফুস ও মুত্রনালী দিয়া প্রবাহিত করে, সে ভিস্তিতুল্য। যে ব্যক্তি

ভূক্তদ্রব্যের অসার ভাগ উদর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, সে মেথরস্বরূপ। যে শক্তি শরীরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিবার জন্য প্লীহা ও যকৃৎকে আপন আপন কার্য হইতে ক্ষান্ত করে তাহাকে ধ্বংসকারী প্রতারক বলা যায়। যে শক্তি পিত্তজনিত ও অন্যান্য রোগ বিদূরীত করে তাহাকে সম্ভ্রান্ত বিচারক বলা চলে এই সমস্তের বিরবণ বহু বিস্তৃত।

তোমার পরিচর্যায় বহু শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তুমি নিতান্ত মোহমুগ্ধ অবস্থায় গাফিল হইয়া রহিয়াছ, ইহা যেমন ভালরূপে বুঝিতে পার এইজন্য এতগুলি কথা বলা হইল। ঐ সকল শক্তি দিবারাত্র তোমার কাজে মশগুল আছে, ইহারা কখনও নিজ নিজ কার্যে অবহেলা করে না এবং অবসরও গ্রহণ করে না। তুমি তাহাদের খবরও জান না এবং যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমার কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করিতেছ না। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি যদি তাহার গোলামকে তোমার খেদমতে একদিনের জন্যও নিযুক্ত করে তবে সারাজীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাক। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোমার দেহ রক্ষার্থে কত শত সহস্র খেদমতগার তোমার খেদমতের জন্যও নিযুক্ত রাখিয়াছেন এবং তাহারা তোমার জীবতাবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও তোমার খেদমত হইতে বিরত থাকে না তথাপি তুমি তাঁহার স্মরণ করিতেছ না।

শরীর বিদ্যা মা'রিফাতের এক পন্থা ঃ যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে শরীরের গঠন-প্রণালী ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকারিতা ও উপযোগিতা অবগত হওয়া যায় তাহাকে শরীর বিদ্যা বলে। ইহা এক বড় বিদ্যা। তথাপি ইহা শিখিতে লোকে বড় একটা ইচ্ছা করে না, কেহ শিখিলেও কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রে পটুতালাভের জন্যই শিখিয়া থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্র স্বয়ং অসম্পূর্ণ ও হাকীকতবিহীন। চিকিৎসা বিদ্যার আবশ্যকতা থাকিলেও ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র বিচিত্র শিল্প-কৌশল বুঝিবার উদ্দেশ্যে ইহা শিক্ষা করে তবে সে নিজে নিজেই আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে তিনটি গুণ অবগত হইতে পারিবে। প্রথমত, এই কৌশলপূর্ণ মানব-দেহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাশীল। তিনি যাহা চাহেন তাহাই করিতে পারেন। তিনি যে এক বিন্দু শুক্র হইতে এই অত্যাশ্চর্য কৌশলময় মানবদেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। যিনি এক বিন্দু নির্জীব শুক্র হইতে এরূপ অত্যাশ্চর্য মানব-দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা তাহার পক্ষে অতি সহজ। দ্বিতীয়ত, সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এত বড় জ্ঞানী যে, তাঁহার অসীম জ্ঞান সমস্ত বিশ্বজগত আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, এই আশ্চর্য কৌশলময় সৃষ্টি পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে। তৃতীয়ত, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, দান ও দয়ার সীমা নাই। কারণ, মানুষের জন্য যে সকল

জিনিস অত্যাবশ্যক– যাহা না হইলে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তৎসমুদয় তিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেনই, যেমন– হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি। আবার মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য, তাহার আরামের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদয়ও তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ দান করিয়াছেন, যেমন– হস্ত, পদ, জিহ্বা, চক্ষু এবং অন্যান্য পদার্থ। শুধু উহাই নহে, বরং যাহা তাহার জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নহে এবং তাহার অভাব মিটাইবার জন্যও প্রয়োজনীয় নহে এমন কতকগুলি বস্তুও তিনি মানুষকে কেবল শোভাসৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রদান করিয়াছেন, যথা– কেশের কৃষ্ণতা, ওষ্ঠের রক্তিমা, ভ্রূযুগলের বক্রতা, নয়ন-পক্ষের সমতা প্রভৃতি। নর-নারী যেন এই সমস্ত গুণে বিভূষিত হইয়া সুন্দর দেখায়, এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তৎসমুদয় দান করিয়াছেন। দয়াময় আল্লাহ্র এই কৃপা শুধু মানব জাতির জন্যই সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীই আল্লাহ্ তা'আলার এই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এমনকি, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও তিনি তাহাদের প্রয়োজনীয় এবং সৌন্দর্য ও শ্রীবর্ধক যাবতীয় বস্তু দান করিয়াছেন এবং উহাদিগকে নানাবিধ রঙ্গে বিভূষিত করিয়াছেন।

এই জন্যই মানবদেহের আকৃতি ও গঠন-ক্রিয়াতে আল্লাহর যে ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রযুক্ত হইয়াছে তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করাকে তাহার গুণ- পরিচয়ের কুঞ্জী বলা হয়। এই কারণেই- শরীর- বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব। চিকিৎসকের ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়া ইহার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। যেরূপ কাব্যের সৌন্দর্য ও রচনার কৌশল এবং শিল্প- কার্যের বৈচিত্র যত অধিক অবগত হওয়া যায় ততই কবি ও শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে অনুভূতি হয় তদ্রূপ মানবদেহের বিচিত্র গঠন, অদ্ভূত নির্মাণ-কৌশল মনোযোগের সহিত দেখিলে নিপুণতম শিল্পী আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করা চলে। এইজন্য শরীর বিদ্যা (Anatomy) আত্মদর্শনের এক উপায়।

শরীর-বিদ্যা অপেক্ষা আত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ ঃ কিন্তু আত্মবিদ্যার তুলনায় শরীরবিদ্যা অতি সংক্ষিপ্ত তুচ্ছ। কারণ, শরীর-বিদ্যায় কেবল দেহের বিবরণ জানা যায় এবং দেহ বাহনস্বরূপ ও আত্মা আরোহী সদৃশ। সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাহন নহে, বরং আরোহী। আরোহীর জন্যই বাহনের সৃষ্টি, বাহনের জন্য আরোহীর প্রয়োজন হয় না।

জগতের সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা তিনি নিজের তোমার অধিক নিকটবর্তী, তথাপি তুমি নিজকে উত্তমরূপে চিনিতে পার না–এই কথা তোমার বুঝাইবার জন্যই এতটুকু বলা হইল। যে ব্যক্তি নিজকে চিনে না, অথচ অপরকে চিনে বলিয়া দাবি করে সে এমন নিঃস্ব ব্যক্তিতুল্য যাহার নিজের আহার্যের সংস্থান নাই অথচ নগরবাসী সমস্ত দীন-দুঃখীদের আহার প্রদান করে বলিয়া দাবি করে তাহার এরূপ দাবি নিতান্ত বাজে ও আশ্চর্যের বিষয়।

আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-উন্নতিতে পরিশ্রম আবশ্যক ঃ এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিয়াছ। এখন বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ্ তোমাকে এই অতি উত্তম পদার্থ দান করিয়াছেন এবং ইহাকে তোমা হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। তুমি যদি ইহার পর্যবেক্ষণে অনুসন্ধান না কর, ইহাকে ধ্বংস করিয়া দাও এবং ইহা হইতে গাফিল থাক তবে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং পরিশ্রমের সহিত আত্মার অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে একেবারে নির্লিপ্ত করিয়া ইহাকে গৌরবের উচ্চতম সিংহাসনে আরোহণ করাও। তাহা হইলে পরকালে তোমার অনন্ত সৌভাগ্য ও অসীম সম্মান প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ তখন তুমি অবিমিশ্র সুখ, অবিনশ্বর জীবন, অপ্রতিহত ক্ষমতা, সন্দেহশূন্য মারিফাত লাভ ও নির্মল সৌন্দর্য দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করিবে। আত্মা যদি পরকালে প্রকৃত সম্মান ও গৌরব লাভের উপযোগী হয় তবে ইহকালেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে। অন্যথায় মানবের ন্যায় অসহায় ও অসম্পূর্ণ আর কেহই নেই। কারণ, মানুষ এ সংসারে শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা ও যাতনায় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। আবার যাহাতে তাহার তৃপ্তি ও আনন্দ তাহাই তাহার ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ এবং যাহা তাহার জন্য উপকারী তাহা দুঃখ ও তিক্ততাশূন্য নহে। জ্ঞান, ক্ষমতা, সংকল্প, ধৈর্য অথবা সৌন্দর্যের কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, মানুষ অপেক্ষা মূর্খ জগতে আর নাই। কেননা, তাহার মস্তিষ্কের একটি মাত্র রগ বক্র হইয়া পড়িলে সে উন্মাদ বা একেবারে ধ্বংস হইতে পারে। অথচ সে ইহার কারণও বুঝিতে পারে না এবং উপশমের উপায়ও সে জানে না। এমনও হয় যে, ঔষধ তাহার সম্মুখে বিরাজমান থাকে, অথচ সে তাহা চিনিতে পারে না। আবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিরাজমান থাকে, অথচ সে তাহা চিনিতে পারে না। আবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মানুষের ন্যায় দুর্বল আর কোন প্রাণীই নহে। একটি মাছিকেও সে পরাস্ত করিতে পারে না। আল্লাহ্ একটি মশাকে মানুষের বিপক্ষে নিযুক্ত করিলে ইহার নিকট সে পরাজিত হয়। একটি মৌমাছির ডাক শুনিয়া মানুষ ভীত ও অস্থির হয়।

তৎপর ধৈর্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ কণামাত্র কমতি সহ্য করিতে পারে না; সামান্যতম ক্ষতি হইলেও দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও পেরেশান হইয়া উঠে। ক্ষুধার সময় এক গ্রাস খাদ্য না পাইলে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া পড়ে। মানুষ অপেক্ষা সংকীর্ণমনা আর কে আছে? পরিশেষে মানুষের সৌন্দর্য ও আকৃতির দিকে মনোনিবেশ করিলে বুঝা যায় যে, স্তূপীকৃত অপবিত্রতাকে চর্ম দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। মানুষ যদি দুই দিন নিজ শরীর ধৌত না করে তবে তাহার শরীর হইতে নিঃসৃত ময়লার দুর্গন্ধে সে নিজেই অতিষ্ট হইয়া পড়িবে ; তখন তাহার সমস্ত

শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। মানব-দেহ অপেক্ষা অধিক ময়লাযুক্ত আর কিছুই নাই। কারণ, ইহার ভিতরে সর্বদাই অপবিত্র মল-মূত্রাদি থাকে, আর এইগুলি বহন করিয়াই মানুষ চলে এবং প্রত্যহ নিজ হস্তে এই মলমূত্র ধৌত করে।

কাহিনী ঃ একদা হযরত শাইখ আবূ সাঈদ (র) সূফীগণের সহিত কোন স্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে দেখিতে পাইলেন, মেথরগণ পায়খানা পরিষ্কার করিতেছে। রাস্তায় কিছু মল পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং নাক বন্ধ করত অন্যদিকে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সে স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "বন্ধুগণ, বুঝিয়া বলত, এই ময়লা আমাকে কি বলিতেছে?" তাঁহার উত্তর করিলেনঃ "হযরত, কি বলিতেছেন আপনি বলিয়া দিন।" তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ "ময়লা বলিতেছে–গতকল্য আমরা বাজারে নানাবিধ উপাদেয় ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি আকারে দোকানে বিরাজ করিতেছিলাম। লোকে আমাদিগকে ক্রয় করিবার জন্য রাশি রাশি টাকা-পয়সা লুটাইতেছিল। এক রাত্র মাত্র আমরা তোমাদের উদরে ছিলাম। ইহাতেই আমরা দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছি। এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাদের নিকট হইতে আমাদের পলায়ন করা উচিত, না আমাদের নিকট হইতে তোমাদের পলায়ন করা উচিত?"

মানবের উন্নতির উপায় ঃ প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ এ দুনিয়াতে নিতান্ত ক্রটিপূর্ণ, অত্যন্ত অক্ষম ও বড়ই অসহায়। কিয়ামতের দিন ইহা উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। কিন্তু সৌভাগ্যের পরশমণিকে স্বীয় আত্মার উপর বারবার ঘর্ষণ করিতে থাকিলে মানুষ ইতর প্রাণীর শ্রেণী অতিক্রম করিয়া ফেরেশতার মরতবায় উন্নীত হইতে পারিবে। অপর পক্ষে দুনিয়া ও দুনিয়ার লোভ-লালসায় নিবিষ্ট থাকিলে কিয়ামতের দিন মানুষ কুকুর ও শূকর হইতে নিকৃষ্ট হইবে; কারণ কুকুর ও শূকর সেই দিন মাটিতে মিশিয়া গিয়া দোযখের আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে; কিন্তু মানুষ নিজ কর্মদোষে আযাবে নিপতীত থাকিবে। মানুষ যখন নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবগত হইল তখন নিজের দোষ-ক্রটি, অক্ষমতা ও অসহায়তা সম্বন্ধেও তাহার অবগত থাকা আবশ্যক। কারণ, এইরূপ আত্মপরিচয় আল্লাহ্‌র মারিফাত লাভের অন্যতম উপায়।

আত্ম-পরিচয়ের জন্য যাহা বলা হইল তাহাই এগ্রন্থে যথেষ্ট। এ স্থলে ইহার অধিক বর্ণনা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ-পরিচয় (তত্ত্বদর্শন)

আল্লাহ্-পরিচয়ের জন্য আত্ম-পরিচয়ের আবশ্যকতা ঃ পূর্বকালের পয়গম্বর (আ)-গণের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ -

অর্থাৎ ঃ "তুমি আত্ম-পরিচয় লাভ কর ঃ তাহা হইলে আল্লাহ্‌র পরিচয় পাইবে।"

এ সম্বন্ধে পূর্বকালের বুযর্গগণের উক্তি মশহুর আছে ঃ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ -

অর্থাৎ " যে ব্যক্তি নিজকে চিনিয়াছেন তিনি আল্লাহ্‌কে চিনিয়াছেন।"

এ সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, মানবাত্মা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। মনোযোগের সহিত স্বীয় আত্মার প্রতি লক্ষ্য করিলে আল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়া যায়। বহু লোক স্বীয় আত্মার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রকৃত আত্ম-পরিচয় লাভ করা আবশ্যক; কেননা ইহা আল্লাহ্‌র- পরিচয় লাভের আয়নাস্বরূপ।

আত্ম-পরিচয়ের দুইটি উপায় আছে। তন্মধ্যে একটি নিতান্ত কঠিন। অধিকাংশ লোক ইহা বুঝিতে পারে না এবং যাহা অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে অক্ষম তাহা বর্ণনা করাও সঙ্গত নহে। যে উপায়ে সকলের বোধগম্য হয় তাহাই বর্ণনা করা উচিত এবং তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী বুঝিবার সহজ উপায় ঃ মাবন নিজের অস্তিত্ব দেখিয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে; স্বীয় গুণ দেখিয়া আল্লাহ্‌র গুণ চিনিয়া লইবে এবং স্বীয় দেহ-রাজ্যের উপর তাহার যে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা চলে তাহা হইতে সমস্ত বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে।

(১) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পরিচয় ঃ মানুষ স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে তাহার নাম ও নিশানা কিছুই ছিল না। এই

সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই মানুষের উপর কালের এমন একটি অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না। নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মানুষকে সম্মিলিত শুক্র-বিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর তাহাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী বানাইয়াছি।"

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ এক বিন্দু নাপাক শুভ্র শুক্রমাত্র ছিল। ইহাতে বুদ্ধি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মস্তক, হস্ত-পদ, জিহ্বা, চক্ষু, স্নায়ু, অস্থি, গোশ্‌ত, চর্ম কিছুই ছিল না। অতঃপর ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আশ্চর্য কৌশলপূর্ণ, যন্ত্রসমূহ ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। মানুষ নিজ দেহ নিজে সৃষ্টি করে নাই; বরং অপর কোন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, এখন সে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হইয়াও এক গাছি কেশ পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে না। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, একবিন্দু শুক্ররূপে থাকাকালে মানুষ কত দুর্বল ও অক্ষম ছিল। এমতাবস্থায় নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সে নিজে কিরূপে তৈয়ার করিবে? সুতরাং মানুষ নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে আপনা-আপনিই বুঝিতে পারে যে, এক মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা তাহাকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করিয়াছেন। অতএব, মানুষ নিজ অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বুঝিতে পারে।

(২) আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিচয় ঃ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা– মানুষ স্বীয় বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির আশ্চর্য গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বুঝিতে পারে এবং জানিতে পারে যে, তাঁহার ক্ষমতা অনন্ত। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ চাহেন সেইরূপই সৃষ্টি করেন। তিনি এমন পূর্ণ ক্ষমতাশালী যে, এক বিন্দু নিকৃষ্ট শুক্র হইতে কেমন পূর্ণ সৌন্দর্যসম্পন্ন ও কৌশলপূর্ণ বিস্ময়কর মানব-দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌র অপরিসীম জ্ঞান ঃ মানব যখন নিজের গুণাবলী ও স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তাহার প্রত্যেকটি বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যথা-হস্ত, পদ, চক্ষু, জিহ্বা, দন্ত ইত্যাদি এবং প্রত্যেকটি আভ্যন্তরিক যন্ত্র, যথা– হৃদপিণ্ড, যকৃত, প্লীহা প্রভৃতিকে আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তখন সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম জ্ঞানের সন্তান লাভ করে; জানিতে পারে তাঁহার জ্ঞান কত পূর্ণ ও কত ব্যাপক। বিশ্বজগতের সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞানের

অন্তর্গত, কোন পদার্থই তাঁহার জ্ঞান কত পূর্ণ ও কত ব্যাপক। বিশ্বজগতের সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্গত, কোন পদার্থই তাঁহার জ্ঞানের বহির্ভূত নহে; বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদিগকে যদি বলা হয় আল্লাহ্ যে প্রণালীতে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সৃজন ও সংযোজন করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান খাটাইয়া তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী বাহির কর এবং এই কার্য সমাধা করিতে যদি তাহাদিগকে অসীম আয়ুও দেওয়া হয় তথাপি তাহারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী বাহির করিতে পারিবে না। দেখ, আল্লাহ্ দন্তপাটিকে কেমন সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। খাদ্য-দ্রব্য কর্তনের জন্য পার্শ্বের দাঁতগুলিকে চওড়া করিয়াছেন। দাঁতের নিকটেই জিহ্বা অবস্থিত থাকিয়া জাঁতার মধ্যে শস্য-নিক্ষেপকারী যন্ত্রের ন্যায় কার্য করে। জিহ্বার নিচের লালারস নির্গমনকারী শক্তি ছানা নির্মাণকারী এবং আটাতে পানি-সিঞ্চনকারীর ন্যায় কার্য করিয়া থাকে। এই শক্তি আবার চর্বিত দ্রব্যকে ভিজাইয়া সহজে গলধঃকরণের উপযুক্ত লালারস সরবরাহ করে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানীব্যক্তি একত্রিত হইয়া গবেষণা করিলেও আল্লাহ্ যে প্রণালীতে দন্তপাটি ও জিহ্বাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

তদ্রূপ, হাতে পাঁচটি আঙ্গুল আছে। তন্মধ্যে চারিটি এক প্রকার এবং এক অঙ্গুষ্ঠ একাকী উহাদের হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ও দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র। তথাপি ইহা সকল আঙ্গুলির সহিত কাজ করে ও সকলের উপর ঘুরিতে পারে। সকল আঙ্গুলেই তিনটি করিয়া গ্রন্থি আছে; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মাত্র দুইটি। অঙ্গুলিগুলি এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট ও স্থাপিত বলিয়া ইহাদের সাহায্যে সহজেই কোন বস্তু ধারণ ও উত্তোলন করা চলে, কোষ বানাইয়া পানপ্রাত্ররূপে ব্যবহার করা চলে এবং হস্ত তালুকে সম্প্রসারণপূর্বক আরও বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানিগণ মিলিত হইয়া যদি আঙ্গুলগুলিকে অন্যরূপে সাজাইবার প্রস্তাব করত বলে যে, পাঁচটি আঙ্গুলই সমান করা হউক, কিংবা তিনটি এক দিকে ও দুইটি অপর দিকে থাকুক, অথবা পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টি বা চারটি গ্রন্থি হউক–এইরূপ যে কোন পরিবর্তনই করা হউক না কেন, সর্বত্রই দেখা যাইবে ইহা ত্রুটিপূর্ণ ও অসুবিধাজনক এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্ যে পদ্ধতিতে সৃজন করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র জ্ঞান জগতের সমস্ত বস্তুকে ঘিরিয়া আছে এবং তিনি সমস্ত অবগত আছেন। মানব-দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই ঐ প্রকার আশ্চর্য আশ্চর্য কৌশল রহিয়াছে। যে ব্যক্তি এই সমস্ত যত অধিক অবগত সে আল্লাহ্র জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীমতা বুঝিতে পারিয়া ততই বিস্ময়াপন্ন হইবে।

আল্লাহ্র অনন্ত দয়া ঃ মানুষ স্বীয় প্রয়োজন ও অভাবের দিকে লক্ষ্য করিলে সর্বপ্রথমেই বুঝিবে যে, সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষী। তৎপর সে পানাহার, বস্ত্র ও বাসগৃহের আবশ্যকতা অনুভব করিবে। ইহার পর দেখিবে-খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে পানি, বায়ু, শীত-গ্রীষ্মের প্রয়োজন। আবার খাদ্যদ্রব্যসমূহ আহারের উপযোগী করিতে নানাবিধ শিল্প-কর্মের আবশ্যক। সে-সকল শিল্পের জন্য আবার লৌহ, তামা, পিতল, সীসার প্রয়োজন। পুনরায় দেখা যাইবে যে, এই সকল ধাতু হইতে কিরূপে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে হয় তাহাও শিক্ষা করা দরকার।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাব পূরণের উপাদান সামগ্রী আল্লাহ্ পূর্বেই প্রয়োজনমত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি উপাদান-সামগ্রী পূর্বেই তৈয়ার করিয়া না রাখিলে বা ইহাতে গুণ ও উপযোগিতা অগ্রেই সংযোজন করিয়া না দিলে লোকে স্বীয় অভাব দূর করিবার যন্ত্রাদি তৈয়ার করিতে পারিত না; এমন কি কিরূপে সেই অভাব দূর হইবে, তাহার কল্পনাও করিতে পারিত না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সমস্তই মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্র অযাচিত দান। একমাত্র অনুগ্রহ ও মেহেরবানিপূর্বক এ সকল বস্তু আল্লাহ্ মানুষকে দান করিয়াছেন। আল্লাহ্র এই গুণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার অনন্ত দয়া বিশ্বের সকল পদার্থের উপরই ব্যাপক এবং এই ব্যাপক দয়ার অপর একটি নিদর্শন হইল মানব-জাতির মধ্যে ওলী ও নবীর আবির্ভাব। এই মর্মেই হাদীসে কুদ্সিতে আছে ঃ

سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ -

"আমার (রাল্লাহ্র) অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।"

রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও এ-সম্বন্ধে বলেন ঃ "দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি জননীর স্নেহ অপেক্ষা বান্দার প্রতি করুণাময় আল্লাহ্র স্নেহ অধিক।"

মোটকথা, নিজ অস্তিত্ব হইতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব জানা গেল এবং মানবদহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া আল্লাহ্র পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-কার্যে আশ্চর্য কৌশল এবং উহাদের উপকারিতা দর্শনে তাঁহার অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। যে-সকল বস্তু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, যেগুলি আমাদের আরাম ও সুখদায়ক এবং যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এই সমস্তই তিনি অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন। এই সকল পর্যালোচনা করিলে আল্লাহ্র অপার স্নেহ অপরিসীম দয়া অবগত হওয়া যায়। এই প্রকার আত্মদর্শনই আল্লাহ্র মারিফাত লাভের কুঞ্জী।

আল্লাহ্র পবিত্রতা ঃ মানুষ যেমন নিজ গুণ দ্বারা আল্লাহ্র গুণাবলীর পরিচয় পাইল এবং আপন অস্তিত্ব দ্বারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল, তদ্রূপ স্বীয় পবিত্রতা

দ্বারা আল্লাহ্র পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারে। আল্লাহ্র পবিত্রতার অর্থ এই যে, তাঁহার গুণাবলী চিন্তা করিতে গেলে যাহা কিছু কল্পনায় আসে তিনি উহা হইতে বহু উর্ধ্বে। যদিও বিশ্বজগতের কোন স্থানই তাঁহার জ্ঞান ও ক্ষমতার বহির্ভূত নহে তথাপি কোন বিশেষ স্থানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নহে। এইরূপ পবিত্রতার প্রত্যঙ্গ আত্মার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয়। আত্মা সমস্ত দেহের বাদ্শাহ্। তদ্রূপ আল্লাহ্ও কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন; তথাপি সমস্ত বিশ্ব-চরাচর তাঁহার পরিচালনাধীনে রহিয়াছে।

আত্মার প্রকৃত অবস্থা ও গূঢ়তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিলেই আল্লাহ্র পবিত্রতার সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কিন্তু উহা করিবার অনুমতি নাই এবং আত্মার গূঢ়তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিলেই ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ -

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন) বাক্যের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটিত হইবে।

(৩) আল্লাহ্র কার্যাবলীর পরিচয় ঃ উল্লিখিত বর্ণনা হইতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণ অবগত হইয়াছে, তিনি যে 'কি-কেমন-কি প্রকার?' তর্কের বহির্ভূত তাহাও বুঝিতে পারিয়াছে; তিনি যে কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন তাহাও বুঝিয়া লইয়াছে এবং ইহাও জানা গেল যে, আত্ম-পরিচয় আল্লাহ্র পরিচয়ের কুঞ্জী। কিন্তু আল্লাহ্র পরিচয় লাভ সম্পর্কীয় একটি অধ্যায় এখনও বর্ণিত হয় নাই। এ অধ্যায়ে বর্ণনার বিষয় হইল– সমস্ত বিশ্বজগতের উপর আল্লাহ্র বাদশাহী কিরূপে চলিতেছে, ফেরেশতাগণের প্রতি আল্লাহ্র আদেশ প্রেরণ ও ফেরেশতাগণ কর্তৃক আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালন ফেরেশতাগণ দ্বারা কার্য সম্পাদন, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আদেশ প্রেরণ, আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রাদির পরিচালন, আকাশের সহিত জগদ্বাসীর কার্যের সম্বন্ধ স্থাপন এবং তাহাদের জীবিকার 'কুঞ্জী' আসমানের যিম্মায় সমর্পণ প্রভৃতি। আল্লাহ্র মারিফাতের ইহা একটি বড় অধ্যায়। পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলিকে যেমন– অস্তিত্ব-দর্শন ও গুণ-দর্শন বলা হয় তদ্রূপ এইগুলিকে ক্রিয়া দর্শন বলা হইয়া থাকে। আত্ম-দর্শন ক্রিয়া-দর্শনেরও কুঞ্জী।

আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রভাব প্রকাশের ক্রমিক ধারা ঃ তোমার দেহ-রাজ্যের উপর তোমার বাদশাহী ও প্রভুত্ব কিরূপে চলিতেছে, ইহা তুমি অবগত না হইলে বিশ্বজগতের একমাত্র বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে স্বীয় বিশাল রাজ্য চালাইতেছেন, তাহা কখনও তুমি বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং প্রথমেই তুমি নিজকে চিন এবং তোমরা প্রত্যেকটি কাজ সম্বন্ধে অবগত হও। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, তুমি

'বিসমিল্লাহ' শব্দটি কাগজে লিখিতে চাও। প্রথমে লেখার ইচ্ছাটি তোমার মধ্যে উদিত হয়। তৎপর হৃদয়ে এক প্রকার আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তোমার বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে 'দিল' নামক যে একখণ্ড গোশ্‌ত আছে ইহাতে এই আলোড়নের সৃষ্টি হয় না। বরং হৃদপিণ্ড হইতে এক প্রকারের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ উহাকে আলোড়িত করিয়া মস্তিষ্কের দিকে ছুটিয়া যায়। দেহতত্ত্ববিদগণ এই সূক্ষ্ম পদার্থকে রূহ বা জীবন বলেন। এই জীবনই সর্বপ্রকার অনুভব ও গতিবিধির শক্তি বহন করিয়া থাকে। এই জীবন পূর্ববর্ণিত আত্মা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা জীব-জন্তুর মধ্যেও আছে। ইহা মৃত্যুর অধীন। অপর পক্ষে আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ; জীব-জন্তুর মধ্যে ইহা নাই এবং ইহা অমর। কারণ, কেবল এই আত্মাই আল্লাহ্‌র মারিফাতের স্থান। যাহা হউক, সেই জীবনী–শক্তি মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া ইহার প্রথম কুঠরি কল্পনার স্থানে 'বিসমিল্লাহ্' শব্দের আকৃতি উৎপন্ন করে। তাহার পর মস্তিষ্ক হইতে এক প্রকার ক্রিয়াশক্তি স্নায়ু পথে অঙ্গুলির অগ্রভাগে উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া স্নায়ুসকল শরীরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং উহার কতকগুলি সূত্রবৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ক্ষীণ ব্যক্তির বাহুতে ঐ প্রকার স্নায়ু-সূত্র বাহির হইতেই দেখা যায়। মোটকথা, মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত সেই ক্রিয়াশক্তি স্নায়ুগুলিকে, স্নায়ুগুলি আবার অঙ্গুলির অগ্রভাগকে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ কলমকে চালিত করে ফলে চক্ষের সাহায্যে মস্তিষ্কের খেয়াল-কুঠরিতে পূর্ব হইতে অঙ্কিত ছবির অনুরূপ 'বিসমিল্লাহ্' লিখিত হয় এই কার্যে দর্শনশক্তির আবশ্যকতা অত্যধিক।

মানবের প্রত্যেক কার্যের প্রথমে ইহার ইচ্ছা যেমন তাহার মনে উদিত হয় তদ্রূপ আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কার্যের আরম্ভও তাঁহার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় গুণের মধ্যে হইয়া থাকে; লিখিবার ইচ্ছা যেমন প্রথমে তোমার মনে উদ্ভব হইয়া ক্রমে তদ্‌পথে অন্যান্য স্থানে পৌঁছিয়াছিল, সেইরূপ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে আরশে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে অন্যান্য স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। তেজসদৃশ যে সূক্ষ্ম পদার্থ তোমার ইচ্ছার প্রভাবকে হৃদ্‌পিণ্ডের স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া থাকে উহাকে যেমন জীবনী-শক্তি বলা হয় তদ্রূপ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রভাবকে যে পরম শক্তি আরশ হইতে কুর্সী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে উহাকে ফেরেশতা ও রুহুল কুদ্দুস বলা হয়। হৃদপিণ্ডের প্রভাব যেমন মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয় এবং মস্তিষ্ক হৃদপিণ্ডের শাসনে ও আজ্ঞাধীনে পরিচালিত তদ্রূপ আল্লাহ্‌র নমুনা মানুষ নিজের মধ্যেও দেখিতে পায়। কারণ, প্রাণের মূল যাহাকে আমরা দিল বা রূহ্ বলি তাহাও মানব-কল্পনার অতীত। ইহাকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে যত প্রকারের আকার ও গুণাবলী মানুষের কল্পনায় উদিত হয়, আত্মা উহার সবকিছু হইতেই পবিত্র। কেননা, আত্মার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ কিছুই নাই এবং ইহা বিভাজ্যও নহে। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই এবং যাহা বিভক্তও হইতে পারে না তাহার কোন বর্ণ থাকাও অসম্ভব। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নাই এবং যাহা অবিভাজ্য তাহা

কল্পনায়ও উদিত হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু বা যাহার সমজাতীয় বস্তু চক্ষু দেখিতে পায় কেবল তাহাই কল্পনায় আসে। বর্ণ ও আকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই কল্পনাও দৃষ্টিপথে উদিত হয় না। 'অমুক জিনিস কেমন?' এই প্রশ্নের উত্তরে লোকে ইহাই মনে করে যে, সেই জিনিসের আকৃতি ও বর্ণ কি প্রকার– ছোট কি বড়। যে জিনিসের আকৃতি, বর্ণ ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব নাই তৎসম্বন্ধে 'ইহা কি প্রকার' এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। যে পদার্থে 'কি প্রকার' প্রশ্নের অধিকার নাই তাহা জানিতে চাহিলে স্বীয় আত্মার দিকে লক্ষ্য কর। দেখিবে, একমাত্র আত্মাই আল্লাহ্‌র মারিফাতের স্থান– ইহা বিভক্ত হয় না; ইহার আকার– প্রকার, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও বর্ণ কিছুই নাই। 'আত্মা কি প্রকার পদার্থ– এ প্রশ্ন কেহ করিলে ইহাই উত্তর হইবে যে, ইহাতে এমন প্রশ্নের কোন অধিকার নাই। তুমি যখন স্বীয় আত্মাকে ধারণা ও কল্পনার অধিকারমুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিবে তখন ইহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহ্‌র আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণাদি প্রভৃতি বাহ্য গুণাবলী হইতে আরও বহুগুণে পবিত্র।

অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবে যে, এমন আকৃতি-প্রকৃতিবিহীন বস্তু কিরূপে বিরাজমান থাকিতে পারে? তাহারা নিজ আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখে না যে, ইহা আকার-প্রকারবিহীন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মানব নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সহস্র রকমের আকার-প্রকারবিহীন বস্তু দেখিতে পাইবে বেদনা, ক্রোধ, প্রেম, আস্বাদ ইত্যাদি সহস্র প্রকার নিরাকার বস্তু তাহার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ এই সমস্ত কি, কেমন, কি প্রকার– জানিতে চাহিলে সে কখনও জানিতে পারিবে না। কারণ, ইহাদের বর্ণ বা আকার কিছুই নাই। ক্রোধাদি নিরাকার গুণগুলিতে যেমন 'কেমন'? কি প্রকার? প্রশ্নের অধিকার নাই, অথচ ইহারা বিদ্যমান আছে তদ্রূপ আরও এমন বহু বস্তু মৌজুদ আছে যাহাতে ' কেমন?' ও 'কি প্রকার?' প্রশ্ন করা চলে না। শত চেষ্টা করিলেও শব্দ, আস্বাদ বা গন্ধের মূলতত্ত্ব কেহই অবগত হইতে পারিবে না। কারণ, ' কেমন?' কি প্রকার?' প্রশ্নগুলি খেয়ালের অধীন। দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত উহা অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং বস্তুটি ' কেমন? কি প্রকার?' এই সকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দর্শনের পর খেয়ালে সঞ্চিত জ্ঞান হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। যে বস্তুর উপর কর্ণের অধিকার আছে তাহাতে চক্ষের কোন অধিকার নাই; যেমন কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, চক্ষু শ্রবণ করে না। বরং শব্দের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, কর্ণ দ্বারা যেমন বর্ণ ও আকৃতি অবগত হওয়া যায় না। চক্ষুর দ্বারাও তদ্রূপ শব্দ বুঝা যায় না। এইরূপ, যে বস্তু অন্তরে অনুভূত হয় এবং বুদ্ধিতে বুঝা যায়, বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি তাহা অনুভব করিতে ও বুঝিতে পারে না। চক্ষু, কর্ণ ইন্দ্রিয়গুলি কেবল জড়পদার্থের আকার- প্রকার, অবস্থা বুঝিতে পারে, জড়াতীত পদার্থের উপর এই সকল ইন্দ্রিয়ের কোনই অধিকার নাই। এই সমস্ত কথা গভীর চিন্তার বিষয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দর্শনশাস্ত্রে আছে। এ স্থলে যতটুকু বলা হইল, ইহাই এ গ্রন্থে যথেষ্ট।

উক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মানবাত্মা যেমন কল্পনা ও ধারণার বহির্ভূত, ইহা অনুভব করত আল্লাহ্ কল্পনা ও ধারণার ততোর্ধ্বে তাহা বুঝিয়া লইবে। আর ইহাও বুঝিয়া লইবে যে, আত্মা যেমন দেহের মধ্যে বাদশাহস্বরূপ বিরাজ করিতেছে এবং দেহ ও দেহস্থিত সমস্ত আকার বিশিষ্ট পদার্থ আত্মার আজ্ঞাধীনে চলিতেছে, অথচ আত্মা নিরাকার তদ্রূপ বিশ্বজগতের বাদশাহ্ আল্লাহ্ স্বয়ং নিরাকার হইয়াও এই জড়ময় বিশ্বজগত চালাইতেছেন।

আল্লাহ্র পবিত্রতার ব্যাখ্যা অন্য প্রকারেও হইতে পারে। আল্লাহ্ কোনও এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। মানবাত্মাও কোন এক বিশেষ অঙ্গে আবদ্ধ নহে। আত্মা না হস্তের মধ্যে, না পদে, না মস্তকে, না দেহের অন্য কোন বিশেষ অঙ্গে বিরাজমান আছে, বরং দেহের সকল অঙ্গেই আত্মা বিরাজমান রহিয়াছে। দেহের প্রত্যেক অঙ্গই বিভক্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্মা বিভক্ত হইতে পারে না। আর অবিভাজ্য বস্তু বিভাজ্য বস্তুতে সমাবেশ হইতে পারে না। কারণ, যদি সমাবেশ হইতে পারিত তবে বিভাজ্য বস্তুর সহিত উহাও বিভক্ত হইয়া পড়িত। আত্মা কোন অঙ্গের সহিত আবদ্ধ না থাকিলেও দেহের কোন অঙ্গই আত্মার ক্ষমতা বহির্ভূত নহে। বরং সমস্ত অঙ্গ অভিপ্রায়ের প্রভাব প্রথমে আরশে উৎপন্ন হইয়া পড়ে কুর্সীতে বিস্তারিত হয় বলিয়া কুর্সী আরশের আজ্ঞাধীন। মানুষ যে কাজ করিতে ইচ্ছা করে তাহার ছবি পূর্ব হইতেই মস্তিষ্কের খেয়াল কুঠরিতে অঙ্কিত থাকে এবং পরে তদনুযায়ী কার্যসম্পন্ন হয়। যে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি লেখা তোমার উদ্দেশ্য ছিল তাহার ছবি পূর্ব হইতেই তোমার মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছিল। লেখা হইয়া গেলে দেখা যায় যে, লিখন মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছবির ন্যায়ই হইয়া থাকে। এই প্রকার যাহা কিছু এ জগতে প্রকাশ পায় উহার ছবিও পূর্ব হইতেই লওহে মাহফূজে অঙ্কিত থাকে। যে সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মস্তিষ্কে থাকিয়া স্নায়ু সকলকে আলোড়িত করে এবং তদ্সাহায্যে হাতের অঙ্গুলী ও অবশেষে কলম পরিচালিত করে তদ্রূপ এক প্রকার শক্তি আরশ ও কুর্সীতে অবস্থিত থাকিয়া আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে পরিচালিত করে এবং ইহাদের প্রভাব নিম্নজগত পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। শেষোক্ত শক্তিকে ফেরেশতা বলে।

পার্থিব প্রকৃতি চারি প্রকার, যথা– উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা। কলম যেমন কালিকে আলোড়িত, বিক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করিলে 'বিসমিল্লাহ্' শব্দ লিখিত হয়, উষ্ণতা ও শীতলতা তদ্রূপ পানি, মাটি ও অন্যান্য উপাদানকে আলোড়িত বিক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করিলে দৃশ্যমান আকৃতি সকল গঠিত হয়। কলমের সাহায্যে কাগজের উপর কালি ছড়াইয়া দিলে কাগজ যেমন সেই কালি চোষণ করে তদ্রূপ আর্দ্রতা জড়পদার্থের মূল উপাদানসমূহকে ভিজাইয়া উহার সাহায্যে আকৃতি গঠন করিলে শুষ্কতা সেই আকৃতি রক্ষা করে। পদার্থসকল যাহাতে নিজ নিজ আকৃতি পরিত্যাগ করিতে না

পারে, এইজন্যই শুষ্কতা সর্বদা প্রহরীর ন্যায় কাজ করে। তরলতা না থাকিলে আকৃতি গঠিত হইতে পারিত না; আবার শুষ্কতা না থাকিলে মূর্তি সকলের আকৃতি রক্ষা পাইত না। কলম আপন গতিবিধি ও কার্য শেষ করিলে যেমন দেখা যায় যে পূর্ব হইতে চক্ষুর সাহায্যে মস্তিষ্কে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় 'বিসমিল্লাহ্' শব্দ লিখিত হইয়াছে তদ্রূপ উষ্ণতা ও আর্দ্রতা কর্তৃক জড়পদার্থের অন্যান্য উপাদানগুলি আলোড়িত হইলে ফেরেশতাগণের সাহায্যে এ জগতে লওহে মাহফূজে অঙ্কিত ছবির ন্যায় প্রাণী ও উদ্ভিদের মূর্তি গঠিত হয়।

প্রত্যক্ষ ইচ্ছার প্রভাব যেমন প্রথমে তোমার মনে আরম্ভ হইয়া ক্রমে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তারিত হয়, সেইরূপ জড়জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনার মূল আল্লাহ্র ইচ্ছা আরশে সূত্রপাত হয়। ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে মনে গৃহীত হয়। তৎপর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য লোকে মনকে তোমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তুমি মনে বাস করিয়া থাক। তদ্রূপ সকলের উপর আল্লাহ্র প্রভুত্ব যখন আরশের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তখন লোকে মনে করে আল্লাহ্ আরশে অবস্থান করেন। মনের উপর তুমি প্রবল হইয়া বসিলে দেহ- রাজ্যের সমস্ত কার্য যেমন সূচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি হইতেই আরশের উপর প্রবল প্রভু হইয়া বসিলেন ও আরশ আল্লাহ্র সমস্ত অভিপ্রায়ের অধীন হইয়া পড়িল তখন বিশ্বজগতের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ -

অর্থাৎ "তৎপর আরশকে আল্লাহ্ নিজ আধিপত্যের অধীন করিলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।" তিনিই সকল কাজের সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মানবদেহে আল্লাহ্র রাজ্যের নমুনা ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তদ্সমুদয়ই সত্য। চক্ষুষ্মান সাধক ওলিগণ কাশ্ফের দ্বারা উহা অবগত হইয়াছেন এবং যথার্থই তাঁহারা জানেন যে, আল্লাহ্ আদমকে নিজের অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, বাদশাহ্কে বাদশাহ ব্যতীত অপর কেহই চিনিতে পারে না। আল্লাহ্ তোমাকে তোমার দেহ-রাজ্যের বাদশাহ্ করিয়া না বানাইলে এবং তাঁহার স্বীয় মহাসাম্রাজ্যের এক সংক্ষিপ্ত নমুনা তোমাকে দান না করিলে তুমি বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ্কে কখনই চিনিতে পারিতে না। অতএব যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে বাদশাহের মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং স্বীয় রাজ্যের নমুনাস্বরূপ তোমাকে একটি রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র নিকট তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তোমার দিল

আরশতুল্য, দিল হইতে নিঃসৃত তোমার জীবনী-শক্তি ইসরাফীলসদৃশ; এইরূপ মস্তিষ্ক–কুর্সী; মস্তিষ্কের খেয়াল-কুঠরি-লওহে মাহফূজ; চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি– ফেরেশতা; মস্তিষ্কের বহির্গত হইয়া সর্বদেহে পরিব্যপ্ত হইয়াছে, সেই বিন্দু সকল গ্রহ-নক্ষত্র; অঙ্গুলী, কলম ও কালি প্রকৃতিস্বরূপ। আল্লাহ্ তোমার আত্মাকে কল্পনাতীত ও নিরাকাররূপে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর বাদশাহ্ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন ঃ "খবরদার, স্বীয় অস্তিত্ব ও বাদশাহী ভুলিও না। ভুলিলে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া ফেলিবে।" এইজন্যই বলা হইয়াছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে তাহার আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, হে মানব, নিজকে চিন। তাহা হইলেই তোমার প্রভু আল্লাহ্‌কে চিনিবে।"

আত্ম-জ্ঞান ও বিশ্ব-জ্ঞান ঃ দেহ-রাজ্যে মানুষের প্রভুত্বের সহিত বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র বাদশাহীর তুলনা করিতে গিয়া দুইটি প্রধান জ্ঞানের আভাস দেওয়া হইল। প্রথম, মানুষের আত্মজ্ঞান-মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত উহার বিবিধ শক্তি ও গুণাবলীর সম্বন্ধ এবং এই সকল শক্তি ও গুণাবলীর উপর আত্মার আধিপত্য। এ সকল জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়, বিশ্বজ্ঞান–বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র বাদশাহীর সঙ্গে ফেরেশতাগণের সম্পর্ক ও এই সকল ফেরেশতার মধ্যে একের সহিত অপরের সম্বন্ধ এবং আসমান, আরশ ও কুর্সীর সহিত ফেরেশতাগণের সম্পর্ক। ইহাও এক বড় জ্ঞান। এ কথার আভাস দিবার উদ্দেশ্য এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথাগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং উহা হইতে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব অনুভব করিবে। পক্ষান্তরে নির্বোধ ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবে, কি কারণে সে অজ্ঞ ও ক্ষতিগ্রস্ত রহিল যে, এইরূপ প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ ও পরম সৌন্দর্যের আধার আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিতে পারিল না। বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্‌র জ্ঞান মানুষ কতটুকু লাভ করিতে পারে? তবে এতটুকু বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন বুঝিতে পারে যে, সে কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র!

জড়জগতের মূল নির্ণয়ে প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদগণের ভুল ঃ প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদগণের দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, তাহারা প্রকৃতি ও গ্রহ-নক্ষত্রদিগকেই যাবতীয় কার্য ও ঘটনার মূল বলিয়া মনে করে। তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন কোন এক পিপীলিকা কাগজের উপর দিয়া চলিবার সময় দেখিতে পাইল, কাগজের উপর কালির দাগ পড়িয়া এক প্রকার চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। তৎপর সেই পিপীলিকা কলমের অগ্রভাগের প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করত প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল ঃ আমি চিত্র অঙ্কনের মূল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। কলমই কাগজের উপর চিত্র অঙ্কন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পিপীলিকাটি নিশ্চিত হইল প্রকৃতিবাদিগণের অবস্থাও ঠিক

এইরূপ। সর্বশেষে কাজটি কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইল, ইহা ছাড়া তাহারা আর কিছুই দেখে না। অবশেষে ঐ পিপীলিকার পার্শ্বে আর একটি পিপীলিকা আসিল। সে প্রথমে পিপীলিকা হইতে দূরদর্শী এবং ইহার দৃষ্টিশক্তিও তদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। সে প্রথম পিপীলিকাকে বলিল ঃ তুমি ভুল করিয়াছ। আমি কলমকে আজ্ঞাধীন দেখিতেছি। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, কলম ভিন্ন এক পদার্থ কলমকে চালাইয়া চিত্র অঙ্কন করিতেছে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি যাহা জানিয়াছি তাহাই ঠিক। অঙ্গুলী চিত্র অঙ্কন করে, কলম করে না। কারণ, কলম অঙ্গুলীর অধীনে চলিতেছে। জ্যোতির্বিদগণ এই পিপীলিকা সদৃশ। তাহাদের দৃষ্টি প্রকৃতিবাদীদের অপেক্ষা অধিক দূরে পৌঁছিয়াছে। তাহারা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহকে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অধীন দেখিতেছে বটে, কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রাদি যে ফেরেশতাগণের অধীন, তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং ফলে তাহারা জ্ঞানের তদপেক্ষা উপরের স্তরসমূহে পৌঁছিতে পারে নাই।

জ্ঞানের তারতম্যানুসারে জ্ঞানীগণের মধ্যে প্রভেদ ঃ জড়জগতের কার্যাবলীর মূল কারণ সম্বন্ধে প্রকৃতিবাদী বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদদের মধ্যে যেমন প্রভেদ ঘটিয়াছে এবং এইজন্যই তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতে যাহারা উন্নতি করেন তাহাদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশ লোকই জড়জগত ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্নতি করিতে পারেন নাই। জড়জগতের বাহিরের কোন জিনিসই তাহারা দেখে নাই। তাহারা আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছেন এবং এইদিকে তাহাদের উন্নতির পথ বন্ধ রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগত অতি দুর্গম ও বহু বাধা-বিপত্তি পরিপূর্ণ। এই জগতে উন্নতির স্তর অনুসারে কাহারও অবস্থা তারকাতুল্য কাহারও অবস্থা চন্দ্রসদৃশ, কাহারও মর্যাদা সূর্যতুল্য। আল্লাহ্ তা'আলা ঊর্ধ্ব জগতের যাঁহাকে যত অধিক দেখাইয়াছেন তদনুসারেই তাঁহাদের গৌরবের শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে; যেমন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ "এইরূপে আমি ইবরাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর রাজস্যসমূহ দেখাইয়াছি।" এই সমস্ত দেখিয়াই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বলিয়াছিলেনঃ

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার মুখ তাঁহার দিকে ফিরাইলাম যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।" আর এই কারণেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "নিশ্চয়ই সত্তর হাজার নূরের পর্দা আছে। এই সমস্ত দূর করা হইলে

তাঁহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি দর্শকগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।" ইহার বিশদ ব্যাখ্যা 'মিশকাতুল আনওয়ার' ও 'মিসবাহুল আসরার' কিতাবদ্বয়ে দেওয়া হইয়াছে। তথায় দেখিয়া লওয়া উচিত।

জড়জগতের মূল নির্ণয়ে মতভেদ সম্বন্ধে সত্যাসত্যের বিচার ঃ উপরে যাহা বলা হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য হইল, জড়বাদীগণ কোন বস্তুর সৃষ্টির কারণরূপে যে উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এক হিসাবে সত্য, উহা জানাইয়া দেওয়া। কারণ, জড়জগতের ক্রিয়া-কলাপে আল্লাহ্ যে সমস্ত উপকরণ রাখিয়াছেন উহাতে এই সকল না থাকিলে চিকিৎসাশাস্ত্র অকর্মণ্য হইয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহারা এইজন্য ভুল করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত কম ও সংকীর্ণ। ফলে ইহা তাঁহাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই এবং তাঁহারা প্রথম সোপানেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারা উষ্ণতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি উপাদানগুলিকে মূল কারণ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন, এই সমস্তকে অপরের অধীন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, উহাদিগকে ভৃত্য না বুঝিয়া কর্তা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। অথচ উষ্ণতা, আর্দ্রতা, ইত্যাদি উপাদান প্রকৃত কর্তার ভৃত্যগণের মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যস্বরূপ। জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ–নক্ষত্রাদিকে আল্লাহ্র জাগতিক কার্যাবলী ও ঘটনাসমূহের উপকরণ বলিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কারণ, উহারা আল্লাহ্র জাগতিক কার্যাবলীর উপরকণ না হইলে দিবা-রাত্রের প্রভেদ থাকিত না–শীত-গ্রীষ্ম সমান হইত। কেননা, সূর্য একটি গ্রহ; ইহা হইতেই পৃথিবীতে আলো ও উত্তাপ আসিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য মধ্যগগনের নিকটে থাকে বলিয়া গ্রীষ্ম হয় এবং শীতকালে দূরে থাকে বলিয়া শীত হয়। যে-আল্লাহ্র এই শক্তি রহিয়াছে যে, তিনি সূর্যকে উষ্ণ ও উজ্জ্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে শনিগ্রহকে শীতল ও শুষ্ক এবং শুক্রগ্রহকে উষ্ণ ও আর্দ্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? এরূপ বিশ্বাসে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে জাগতিক ঘটনাবলীর মূল কর্তা সাব্যস্ত করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে অন্য এক শক্তির অধীন বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারে নাই; অথচ এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ -

অর্থাৎ "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নির্দেশমত নিয়ম-কানুনের অধীনে চলিতেছে।" তিনি আরও বলেন ঃ

وَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ -

অর্থাৎ "সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁহারই অনুগত!" প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদগণ এই সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই। অনুগত তাহাকেই বলে যে অপরের অধীনে কাজ করে। অতএব গ্রহ-নক্ষত্রাদির কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই, বরং ইহারা ফেরেশেতাগণের পরিচালনাধীনে থাকিয়া কাজ করে। স্নায়ুসূত্র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আলোড়িত করিলে যেমন মস্তিষ্কের শক্তি কার্যনির্বাহে অগ্রসর হয় তদ্রূপ আল্লাহ্‌র নিয়োজিত ফেরেশতাগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে। আল্লাহ্‌র ভৃত্যদের মধ্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি নীচ শ্রেণীর ভৃত্য বটে; কিন্তু চারি প্রকৃতি যেমন লেখকের হস্তস্থিত সর্বনিম্ন শ্রেণীর আজ্ঞাবহ কলমের ন্যায় ভৃত্য তদ্রূপ উহারা একেবারে নিম্নতম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে।

লোকদের মধ্যে মতভেদের কারণ ঃ লোকের মধ্যে এমন বহু মতভেদ আছে বিভিন্ন কারণে যাহাদের প্রত্যেকের কথাই সত্য। এরূপ মতভেদের কারণ এই যে, তাহাদের কেহ বা কোন বিষয়ের কিয়দংশ দেখিয়া বুঝিয়াছে, অপর অংশ দেখে নাই; আবার অপর লোক অন্য অংশ দেখিয়াছে, সম্পূর্ণটা দেখে নাই; অথচ তাহারা সকলেই সম্পূর্ণটা দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে। এমন লোকের অবস্থাকে 'অন্ধের হস্তী দর্শনে'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অন্ধগণ তাহাদের শহরে হাতী আসিয়াছে শুনিয়া ইহা কেমন জানিবার জন্য রওয়ানা হইল এবং মনে করিল যে, হাতীর শরীরে হাত বুলাইয়া উহার যথার্থ পরিচয় লাভ করা যাইবে। সকলেই হাতীর শরীরে হাতড়াইতে লাগিল। কাহারও হাত হাতীর কানের উপর পড়িল; কাহারও হাত ইহার পায়ের উপর পড়িল; আবার কেহ ইহার দাঁত স্পর্শ করিল। এই অন্ধগণ অপর অন্ধদের নিকট গেলে তাহারা ইহাদিগকে হাতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তির হাত হাতীর পায়ের উপর পড়িয়াছিল সে বলিল ঃ হাতী থামের মত; যে ব্যক্তির হাত হাতীর দাঁত স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল ঃ হাতি মূলার মত; যে-ব্যক্তি হাতির কান স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল ঃ হাতী কুলার মত। পৃথক পৃথক কারণে তাহাদের প্রত্যেকের মতই কিছুটা সত্য বটে। কিন্তু তাহারা সকলেই এই কারণে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই হাতীর সমস্ত শরীরের পরিচয় না পাইয়াই বলিয়াছে ঃ "আমি হাতীকে সম্পূর্ণ রূপে চিনিয়াছি"; অথচ গোটা হাতীর পরিচয় তাহাদের কেহই লাভ করে নাই।

এইরূপে জ্যোতির্বিদ ও প্রকৃতিবাদীদের দৃষ্টি আল্লাহ্‌র এক এক বান্দার উপর পড়িয়াছে এবং ইহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা দর্শনে অবাক হইয়া বলিয়াছে ঃ

هٰذَا رَبِّىْ অর্থাৎ "ইহাই আমার প্রভু।" কিন্তু যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়েত করিলেন তিনি এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রাকৃতিক শক্তির অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ঃ যাহাকে আমি আল্লাহ্ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম

তাহাতে অন্যের আজ্ঞাধীন এবং যাহা অন্যের আজ্ঞাধীন তাহা কখনই আল্লাহ্ হওয়ার উপযুক্ত নহে; তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন- لَا أُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ অর্থাৎ "আমি অস্তগামীদিগকে পছন্দ করি না।"

বিশ্বপ্রকৃতির কার্যনির্বাহের ধারা ঃ চারি প্রকৃতি,গ্রহ-নক্ষত্র, দ্বাদশ রাশি, কক্ষপথ এবং তদ্ব্যতীত মহান আরশ–এই সমস্তকে এক হিসাবে এমন এক রাজার রাজ্য-শাসন প্রণালীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাঁহার একটি খাস কামরা আছে, এই কামরায় তাঁহার উযির বসিয়া রহিয়াছেন। কামরার চতুর্দিকে একটি বারান্দা আছে ইহার বারটি দরজা। প্রত্যেক দরজায় এক একজন সহকারী উযির উপবিষ্ট আছেন এবং সাতজন অশ্বারোহী উযির হইতে প্রাপ্ত শাহী আদেশ সহকারী উযিরগণের মারফতে পাইবার প্রতীক্ষায় অনবরত বারটি দরজার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। অশ্বারোহিগণ হইতে একটু দূরে চারিজন পেয়াদা ফাঁদ হাতে দাঁড়াইয়া শাহী নির্দেশের প্রতীক্ষায় অশ্বারোহীদের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র এই ফাঁদের সাহায্যে তাহারা কাহাকেও নির্দেশ অনুযায়ী শাহী দরবারে হাযির করিবে, কাহাকেও বা দূর করিয়া দিবে, কাহাকেও পুরস্কার প্রদান করিবে, আবার কাহাকেও শাস্তি দিবে।

আরশ উক্ত খাস কামরাতুল্য। এই স্থানে উযির অবস্থান করেন ঃ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। গ্রহ-নক্ষত্রবিশিষ্ট আসমান বারান্দাস্বরূপ এবং দ্বাদশ রাশি বার দরজা সদৃশ। এই সকল দরজায় অবস্থিত সহকারী উযির-ফেরেশতাগণ উক্ত শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা অপেক্ষা মরতবায় একটু নিম্নে। ইহাদের এক একজনের উপর এক এক কাজের ভার আছে। সাতটি গ্রহ সাতজন অশ্বারোহী তুল্য। তাহারা দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত ফেরেশতাগণের নিকট হইতে আল্লাহর নির্দেশের প্রতীক্ষায় আসমানের চারিদিকে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক রাশি হইতে ইহাদের নিকট বিভিন্ন আদেশ আসিয়া থাকে। আগুন, পানি মাটি ও বায়ু এই চারি উপাদান সেই চারি পেয়াদাস্বরূপ। ইহারা নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া যায় না। উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা এই চতুর্বিধ প্রকৃতি উহাদের হস্তস্থিত চারিটি ফাঁদ।

রোগ-শোক প্রদানের কারণ ও রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন মত ঃ যদি কাহারও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া দুনিয়া হইতে সে মুখ ফিরাইয়া লয়–দুঃখ ও অনুতাপ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে–দুনিয়ার নিয়ামত তাহার নিকট খারাপ বোধ হয় এবং অন্তিমকালের চিন্তা-ভাবনা তাহাকে ঘিরিয়া লয় তখন চিকিৎসকগণ বলিবেন ঃ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে এ ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এক প্রকার ভেষজ পদার্থের পাঁচন ইহার ঔষধ। প্রকৃতিবাদিগণ তাহার সম্বন্ধে বলিবেন ঃ শীতকালের শুষ্ক বায়ুর কারণে মস্তিষ্কে শুষ্কতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার এ রোগ জন্মিয়াছে। বসন্তের স্নিগ্ধ বায়ু

মস্তিষ্কে প্রবেশ করত ইহাকে আর্দ্র না করিলে এ রোগ সারিবে না। জ্যোতির্বিদগণ বলিবেন ঃ এই ব্যক্তির উন্মাদনা রোগ হইয়াছে। বধু গ্রহের সহিত মঙ্গল গ্রহের অশুভ সংক্রমণ হইয়া এই দুই গ্রহের কুদৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে বলিয়াই এ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। চন্দ্র-সূর্য বা অন্য কোন শুভ গ্রহের সহিত সংক্রমণ হইয়া তাহার উপর ইহার শুভ-দৃষ্টি না পড়িলে এ রোগ দূর হইবে না। চিকিৎসক, প্রকৃতিবাদী ও জ্যোতির্বিদ তাহাদের নিজ নিজ চিন্তাধারা অনুযায়ী এ ব্যক্তি সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবার হইতে সৌভাগ্যের আদেশ হইল। তদানুসারে বুধ ও মঙ্গল গ্রহকে তিনি অনুমতি করিলেন যেন ইহারা একত্রে উদিত হইয়া তাঁহার অন্যতম পিয়াদা বায়ুকে শুষ্কতার ফাঁদের সাহায্যে ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক শুষ্ক করিয়া ফেলিবার ইঙ্গিত করে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি হইতে তাহার মুখ ফিরাইয়া লয় এবং অনুতাপ ও ভয়ের চাবুক মারিয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে লইয়া যায়। চিকিৎসা-শাস্ত্র, প্রকৃতিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। বরং এই খবর একমাত্র পয়গম্বরগণের ইল্‌মে নবুয়তরূপ মহারত্নের অসীম সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়। পয়গম্বরগণের জ্ঞান-সমুদ্র বিশ্ব-জগতের সমস্ত রাজ্য এবং আল্লাহ্‌র কর্মচারী ও ভৃত্যদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আর তাদের কে কোন্ কাজে নিযুক্ত আছে, কাহার আদেশে পরিচালিত হয় এবং সৃষ্টিকে কোন্ দিকে লইয়া যায় ও কোন্ দিকে যাইতে বাধা দেয়– এ সমুদয় কেবল পয়গম্বরগণই জানেন। তথাপি উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পণ্ডিতগণ যাহা বরেন তাহা এক হিসাবে সত্য বটে। তবে পার্থক্য এই যে, বিশ্বজগতের বাদশাহ্, তাহার বিশাল রাজ্য, প্রধান প্রধান কর্মচারী ও ভৃত্যগণের সংবাদ তাহারা কিছুই রাখেন না। তাহারা এমন মূর্খ পল্লীবাসীর ন্যায় যে বাদ্‌শাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যসামন্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তাঁহার কর্মচারীবৃন্দকে দেখিয়া বলে ঃ "আমি বাদ্‌শাহকে দেখিয়াছি।" তাহার এরূপ উক্তি এক হিসাবে সত্য। কারণ, সে বাদ্‌শাহের দরবারকে বাদশাহের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহার উক্তির বিপরীত ছিল। কেননা, সে বাদশাহের দরবারের গোলামকে দেখিয়া তাহাকেই বাদশাহ বলিয়া মনে করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহার উক্তির বিপরীত ছিল। কেননা, সে বাদশাহের দরবারের গোলামকে দেখিয়া তাহাকেই বাদশাহ্ বলিয়া মনে করিয়াছিল।

ফলকথা, আল্লাহ্ মানুষকে বিপদাপদ, রোগ, উন্মাদনা ও কষ্ট দ্বারা নিজের দিকে আহবান করিতেছেন এবং বলিতেছেন ইহা রোগ নহে, বরং ইহা আমার দয়ারূপ ফাঁদ। এই ফাঁদ দ্বারা আমি আমার বন্ধুগণকে আমার দিকে আকর্ষণ করিয়া লই।

اِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكَّلٌ بِالاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الاَمْثَلُ فَالاَمْثَلُ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পয়গম্বরগণকে বড় বড় বিপদে নিপতিত করিয়াছেন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিপদ ওলীদের উপর দিয়াছেন। তৎপর তাঁহার বান্দাগণের মর্যাদার তারতম্য অনুসারে লঘু হইতে লঘুতর বিপদে তাহাদিগকে ফেলিয়াছেন।" এই সকল লোকগণের সম্বন্ধেই হাদীসে আল্লাহ্র উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

مَرِضْتُ فَلَمْ تَعِدْنِىْ -

অর্থাৎ "আমি পীড়িত হইয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা কর নাই।"

মানব-দেহের অভ্যন্তরে যে বাদ্শাহী চলিয়াছে তাহা প্রথম উদাহরণে বর্ণিত হইল এবং দেহের বাহিরে যে বাদ্শাহী চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় উদাহরণে প্রকাশ পাইল। নিজকে চিনিলেই মানব-দেহের বাহিরের বাদশাহী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জন্যই আত্ম-দর্শন প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ্র মা'রিফাতের সমষ্টিরূপে চারিটি বাক্যের ব্যাখ্যা

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ পবিত্র', 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র,' 'আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই' এবং 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাক্যগুলির তাৎপর্য এখন তোমার বুঝিয়া লওয়া দরকার। এই চারিটি বাক্য নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও আল্লাহ্র মা'রিফাতের সমষ্টি। নিজের পবিত্রতা দৃষ্টে যখন আল্লাহ্র পবিত্রতা তুমি বুঝিলে তখন 'আল্লাহ্ পবিত্র' এই কলেমার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে। নিজের বাদ্শাহী চিনিয়া যখন আল্লাহ্র বাদ্শাহী সংক্ষেপে চিনিতে পারিলে– যেমন কলম লেখকের হাতের অধীন তদ্রূপ সমস্ত উপাদান ও মধ্যবর্তী কারণ একই আল্লাহ্র আজ্ঞাধীন– তখন 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র' এই বাক্যের মর্ম উপলব্ধি করিলে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ যখন নিয়ামতদাতা নাই তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভন, তাঁকে ছাড়া অপর কেহই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাইতে পারে না। যখন বুঝিতে পারিলে যে, তিনি ব্যতীত অপর কাহারও আজ্ঞা করিবার স্বাধীন ক্ষমতা নাই তখন 'আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই' এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিলে। 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ,' এই বাক্যের মর্ম এখন বুঝিয়া লও। জানিয়া রাখ, তুমি যত বড় জ্ঞানীই হও না কেন, মহান আল্লাহ্র হাকীকত তুমি কখনও বুঝিতে পারিবে না। কারণ, তিনি এত মহান ও শ্রেষ্ঠ যে, মানব কল্পনায় ইহা অনুধাবন করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। নতুবা তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কোন তুলনা নাই যদ্দ্বারা তুমি তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া

লইতে পারিবে। বরং আল্লাহ্ ব্যতীত বিশ্বজগতে অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই যাহার তুলনায় তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইবে। বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই আল্লাহ্র অস্তিত্বের নূর। সূর্যের আলো সূর্য হইতে পৃথক কোন বস্তু নহে। অতএব, আলো অপেক্ষা সূর্য শ্রেষ্ঠ, এরূপ বলা চলে না। তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র নূর। সুতরাং তাঁহাকে কোন কিছুর সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থ এই যে, বুদ্ধি বা কল্পনা দ্বারা কেহই তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। তিনি বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অসম্পূর্ণ ঃ আল্লাহ্র পবিত্রতা কি মানুষের পবিত্রতার অনুরূপ? এরূপ ধারণা হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন। তাঁহার তুলনায় মানুষ তো কিছুই নহে। সমস্ত সৃষ্টির সহিত তুলনা হইতে তিনি পবিত্র। মানুষের যে বাদশাহী তাহার নিজ শরীরের উপর চলে আল্লাহ্র বাদশাহী কি মানুষের এই বাদশাহীর তুল্য? আল্লাহ্র জ্ঞান ও শক্তি কি মানুষের জ্ঞান ও শক্তির অনুরূপ? নাউযুবিল্লাহ; কখনও নহে, কখনও এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিও না। কিন্তু আল্লাহ্র ঐ সকল গুণের নামেমাত্র সামঞ্জস্য মানবের মধ্যে এইজন্য রাখিয়াছেন যেন সে নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় হওয়া সত্ত্বেও পরম করুণাময় আল্লাহ্র অনুপম সৌন্দর্য ও গুণাবলী কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে। ইহা বুঝাইবার জন্য একটি উপমা দেওয়া হইতেছে। কোন বালক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল–প্রভুত্ব ও বাদশাহীতে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়? আমি উত্তরে বলিব–ডাণ্ডাগুলী খেলায় যেমন আনন্দ পাওয়া যায় প্রভুত্ব এবং বাদশাহীতেও তদ্রূপ আনন্দ মিলে। এরূপ উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, ঐ বালক ডাণ্ডাগুলীর আনন্দ ব্যতীত কোন আনন্দ জানেই না এবং যে আনন্দ সে লাভ করে নাই তাহা কখনও সে বুঝিতে পারিবে না। তবে বালকের হৃদয়ে কোন প্রকার আনন্দের লেশমাত্রও না থাকিলে তাহাকে উহা বুঝান কঠিন হইত। সকলেই জানে যে, বাদশাহীর আনন্দের সহিত ডাণ্ডাগুলীর আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। তথাপি উভয়ের নামই আনন্দ। তাই নামের মিলে উভয়ের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা গেল। আল্লাহ্র মারিফাতের ময়দানে যাহারা নাবালক তাহাদিগকে এইরূপ সাদৃশ্য দ্বারাই মা'রিফাতের আনন্দ বুঝাইতে হয়। আল্লাহ্র মারিফাত সম্বন্ধে যাহা বলা হইল এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসমুদয়ই ঐ প্রকার বালককে ডাণ্ডাগুলীর আনন্দ দ্বারা বাদশাহীর আনন্দ বুঝানোর ন্যায়। ফলকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার পূর্ণ হাকীকত কেহই বুঝিতে পারে না।

ইবাদত মানব-সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ ঃ আল্লাহ্র মা'রিফাতের বিবরণ বিস্তৃত যে, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার সম্যক বর্ণনা সম্ভব নহে। লোকে কিছুটা অবগত হইয়া

আল্লাহ্‌র যথাসাধ্য পূর্ণ পরিচয় লাভের আগ্রহ-উদ্দীপনা তাহার মনে জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ্‌র মা'রিফাতই মানব সৌভাগ্যের মূল। বরং সৌভাগ্যের উপায় হইল আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও ইবাদত-বন্দেগী। ইবাদত সৌভাগ্যের উপায় হওয়ার কারণ এই যে, মৃত্যুর পর একমাত্র আল্লাহ্‌র সহিতই তাহার সম্বন্ধ থাকিবে।

اِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ "সকলেই একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাগমন ও পুনরাগমন করে।" আর যাঁর সহিত অবস্থান করিতে হইবে তাহার সহিত পূর্ব হইতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া লওয়াতেই সৌভাগ্য নিহিত আছে। বন্ধুত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে সৌভাগ্যও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, প্রিয়জনের দর্শনে আনন্দ ও আরাম মিলে এবং মারিফাতের ও যিকিরের ফলেই মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পায়। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার কথাই অধিক মনে পড়ে। আবার যাহাকে অধিকাংশ সময় স্মরণ করা হয় সে স্বভাবতই প্রিয় হইয়া উঠে। এইজন্যই আল্লাহ্ হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল করিয়াছেন ঃ

اَنَا بُدَّكَ الاَّزِمُ فَالْزِمْ بُدَّكَ -

অর্থাৎ "একমাত্র আমি তোমার আশ্রয়স্থল এবং কেবল আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ, অতএব আমার যিকির হইতে এক মুহূর্তও গাফিল থাকিও না।" মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদতে সর্বদা লিপ্ত থাকিলে তাহার মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রবল হয় এবং প্রবৃত্তির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং সকল পাপ হইতে বিরত হওয়াই একাগ্রচিত্তে ইবাদতে রত হওয়ার মূল কারণ। আমার ইবাদত মনে যিকির প্রবল হওয়ার কারণে হইয়া থাকে। যিকির ও ইবাদত আবার মহব্বতের মূল কারণ এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত সৌভাগ্যের বীজ। আর সৌভাগ্যের বীজ। আর সৌভাগ্যের অর্থ হইল নাজাত লাভ করা; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ "অবশ্যই মু'মিনগণ নাজাত পাইয়াছে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

"যে ব্যক্তি আত্ম-শুদ্ধি লাভ করিয়াছে, আপন প্রভুর নাম স্মরণ করিয়াছে এবং নামায কায়েম করিয়াছে সে নিশ্চয়ই নাজাত পাইয়াছে।"

সকল কাজ ইবাদত হইতে পারে না; কোন কোন কাজ ইবাদত, কোন কোন কাজ ইবাদত নহে এবং সর্ববিধ প্রবৃত্তি হইতে বিরত থাকা সম্ভবও নহে, আর সঙ্গতও নহে। কারণ, আহার না করিলে মানুষ মরিয়া যায় এবং স্ত্রী সহবাস না করিলে বংশ রক্ষা পায় না। কতক প্রবৃত্তি একেবারে পরিত্যাজ্য এবং কতকগুলি গ্রহণীয়। সুতরাং গ্রহণীয়গুলি হইতে পরিত্যাজ্যগুলিকে পার্থক্য করিবার জন্য একটি মাপকাঠি ও সীমারেখা থাকা আবশ্যক। এই সীমারেখা নির্ধারণের দ্বিবিধ উপায় আছে। মানুষ হয়ত নিজে বিচার-বুদ্ধি ও ইচ্ছা অনুসারে তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে অথবা অন্যের দ্বারা উহা করাইয়া লইবে। সাধারণত মানুষকে নিজ স্বাধীন ক্ষমতার উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার হৃদয়ে প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে সে কখনও সত্যের পথ পায় না এবং যাহা দ্বারা মানুষের অভিলাষ পূর্ণ হয় তাহা তাহার নিকট উত্তম বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। বরং এ বিষয়ে অন্যের অধীনে চলা উচিত। কিন্তু সকলেই পরিচালকের উপযুক্ত হইতে পারে না। কেবল দূরদর্শী ও প্রবল বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই পরিচালক হওয়ার উপযুক্ত। নবীগণই এই প্রকার দূরদর্শী ও সূক্ষ্ম বিচারক। তাঁহারা কর্তব্যাকর্তব্যের যে সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহাকেই শরীয়ত বলেন ঃ সুতরাং শরীয়তের অনুশাসন মানিয়া চলাই সৌভাগ্য অর্জনের উপায় এবং ইহার নামই ইবাদত।

শরীয়ত অমান্যকারীদের ভ্রমের সাতটি কারণ ঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজে নিজেই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তির আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে।" যাহারা হারামকে হালাল জানিয়া আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করিয়াছে তাহাদের ভ্রম ও অজ্ঞতার সাতটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ ঃ আল্লাহ্‌র উপর তাহাদের ঈমানই নাই। তাহারা নিজেদের খেয়াল ও কল্পনার বলে 'আল্লাহ্ কিভাবে হইলেন', 'তিনি কিরূপ' অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যখন কিছুই বুঝিতে পরিল না তখন স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করিয়া বসিল এবং প্রকৃতি ও গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে জগতের সকল কার্যের মূল কারণ বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহারা আরও মনে করিয়া লইল যে, মানব, জীবজন্তু এবং এই বিশ্বজগত আশ্চর্য অনুভূতি, চমৎকার কৌশল ও সুশৃঙ্খলার সহিত আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা অনাদিকাল হইতে আপনা-আপনিই এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে বা এই সমস্তই প্রকৃতির কাজ। প্রকৃতিবাদিগণ যখন নিজেদের সম্বন্ধেই একেবারে অজ্ঞ তখন অন্যের সম্বন্ধে তাহারা কি জানিবে? তাহাদের উদাহরণ এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি সুন্দর

লেখা দেখিয়া ভাবিল, ইহা নিজে নিজেই হইয়াছে, লেখকের জ্ঞান ক্ষমতা ও ইচ্ছার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই অথবা ইহা এইরূপ লিখিত অবস্থাতেই অনাদিকাল হইতে আছে। যাহারা এতটুকু অন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহারা দুর্ভাগ্যের পথ হইতে কখনও ফিরিয়া আসিবে না জ্যোতির্বিদ ও প্রকৃতিবাদীদের ভ্রম পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ শরীয়ত-অমান্যকারিগণ আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না। কারণ, তাহারা মনে করে মানুষ ও তৃণলতা, বৃক্ষ এবং অন্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মৃত্যুর পর ধ্বংস হইয়া যাইবে। মন্দ কৃতকর্মের জন্য তাহাকে পরকালে তিরস্কার করা হইবে না, কোন প্রকার হিসাব নিকাশ তাহার দিতে হইবে না এবং তথায় কোনরূপ দণ্ড বা পুরস্কার নাই। এইরূপ ব্যক্তিরা নিজদিগকে চিনে নাই। কেননা, তাহারা তাহাদিগকে গরু, গাধা, লতাপাতার ন্যায় মনে করে। মানবাত্মা যে দেহের মূল, অমর ও চিরস্থায়ী ইহা তাহারা জানে না। কেবল দেহরূপ কাঠামো হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। ইহাকেই মৃত্যু বলে। মৃত্যুর হাকীকত চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় কারণ ঃ আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তাহাদের ঈমান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের ঈমান নিতান্ত দুর্বল। শরীয়তের অর্থ না বুঝিয়া তাহারা বলে–'আমাদের ইবাদতে আল্লাহ্র কি প্রয়োজন? আমাদের পাপেই বা তাহার অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ কি? তিনি তো বিশ্বজগতের বাদশাহ এবং তিনি আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নহেন। তাহার নিকট পাপ-পুণ্য সবই সমান।' এই মূর্খেরা কি কুরআন শরীফে আল্লাহ্র আদেশ শ্রবণ করে নাই? আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়াছে সে একমাত্র নিজের মঙ্গলের জন্যই আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়াছে।" তিনি আরও বরেন ঃ

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পুণ্যলাভে কঠোর সাধনা করে সে নিজের জন্যেই তদ্রূপ সাধনা করিয়া থাকে। তিনি বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নেক কাজ করিয়াছে সে নিজের জন্যই করিয়াছে।" এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বান্দা যে নেক আমল করে উহার উপকারিতা তাহার নিজেরই, উহাতে আল্লাহ্র কোন লাভ নাই?

এই হতভাগ্য জাহিলগণ শরীয়তের অর্থ বুঝে না এবং মনে করে, শরীয়তের আদেশ নিষেধ মানিয়া চলা কেবল আল্লাহ্র জন্য, তাহাদের নিজের জন্য নহে।

তাহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপ যেমন, কোন রোগী নিজকে কুপথ্য হইতে রক্ষা করে না এবং বলে—আমি চিকিৎসকের উপদেশ মান্য করি বা না করি ইহাতে তাহার কি? তাহার কথা সত্য বটে; কারণ ইহাতে চিকিৎসকের কোন লাভ-লোকসান নাই। তবু কুপথ্য বর্জন না করিলে রোগী নিজেই বিনষ্ট হইবে। চিকিৎসকের প্রয়োজনের জন্য রোগী বিনষ্ট হইবে না, বরং কুপথ্য বর্জন না করার দরুন বিনষ্ট হইবে। সুস্থ হওয়ার জন্য চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য বর্জনের উপদেশ দিয়াছিলেন। রোগী তাহা মানে নাই; ইহাতে উপদেশদাতার কি ক্ষতি? বরং রোগী নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। শারীরিক রোগ যেমন এ জগতে ধ্বংসের কারণ আত্মার রোগও তদ্রূপ পরকালে দুর্ভোগের কারণ। ঔষধ সেবন ও কুপথ্য বর্জনে যেমন শারীরিক পীড়া দূর হয়, তদ্রূপ ইবাদত, মারিফাত ও পাপ বর্জনে আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্‌র নিকট নিষ্পাপ ও নিরোগ আত্মা লইয়া যাইতে পারিবে তাহারা ব্যতীত অপর কেহই মুক্তি পাইবে না।"

চতুর্থ কারণ ঃ শরীয়ত বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন তাহারা বলে, কুপ্রবৃত্তি, ক্রোধ ও রিয়া হইতে হৃদয়কে পাকপবিত্র করিবার জন্য শরীয়ত আদেশ দিয়াছে, অথচ উহা নিতান্তই অসম্ভব। কারণ, মানুষকে আল্লাহ্ এই সকল প্রবৃত্তি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা আরও বলে, কৃষ্ণ বর্ণকে শুভ্র বর্ণে পরিণত করা যেমন অসম্ভব, শরীয়তের এই আদেশ পালন ও তদ্রূপ অসম্ভব। কিন্তু এই নির্বোধগণ জানে না যে, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আদেশ শরীয়তে নাই; বরং এই সকল রিপুকে সায়েস্তা করত শরীয়ত ও বুদ্ধির অধীন করিয়া রাখিবার আদেশ রহিয়াছে যাহাতে ইহারা অবাধ্য হইতে না পারে এবং শরীয়তের সীমালঙ্ঘন না করে। রিপুগুলিকে এইরূপে দমন করিয়া কবিরা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে করুণাময় আল্লাহ্ সগিরা গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ক্রোধ-লোভাদি রিপুকে বশীভূত করিয়া রাখা মানব-ক্ষমতা বহির্ভূত নহে। বহু লোকে ইহা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, কাম, ক্রোধ, রিপু থাকা উচিত নহে। অথচ তাহার নয়জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন—"আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ; মানুষের ন্যায় আমার হৃদয়েও ক্রোধের উদ্রেক হয়।" যাঁহারা ক্রোধ দমন করিয়াছেন তাহাদের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ -

অর্থাৎ "যাহারা ক্রোধ দমনকারী ও লোকের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শনকারী, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।" কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেকই হয় না, আল্লাহ্ তাহাদের প্রশংসা করেন নাই।

পঞ্চম কারণ ঃ তাহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলে, "আল্লাহ্ দয়াময় ও ক্ষমাশীল যাহাই করি না কেন সর্বাবস্থায়ই তিনি আমাদের উপর দয়া করিবেন।" তিনি দয়াময় হইলেও যে আবার কঠিন শাস্তিদাতাও এ কথা তাহারা ভাবেন না। তাহারা দেখে না যে আল্লাহ্ দয়াময় ও ক্ষমাশীল হওয়া সত্ত্বেও এ জগতে বহু লোককে বিপদাপদ, রোগ-শোক এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিপতিত রাখিতেছেন। কৃষি ও বাণিজ্য না করিলে ধন পাওয়া যায় না, পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না–ইহা বুঝিয়া তাহারা দুনিয়ার কাজে পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। আল্লাহ্ পরম করুণাময়; কৃষিকার্য ও বাণিজ্য ব্যতীতই তিনি রিযিক দান করিবেন– এ কথা ভাবিয়া কেহই সাংসারিক কার্য হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া নিষ্কর্মা হইয়া থাকে না; অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং সকল প্রাণীর রিযিকের যিম্মাদার, যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রিযিকের যিম্মাদার আল্লাহ্ নহেন।" এবং পরকালে উন্নতি ও সৌভাগ্য তিনি প্রত্যেকের আমলের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ـ

অর্থাৎ "মানুষ শুধু তাহার চেষ্টায় সফলতা লাভ করিয়া থাকে।" প্রকৃত প্রস্তাবে এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ্‌কে করুণাময় বলিয়া বিশ্বাস করে না। কারণ, তাহারা আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জনে হস্ত সঙ্কুচিত করত নিষ্কর্মা বসিয়া থাকে না, কেবল পরকালের কার্যে শৈথিল্য করিয়া থাকে। সুতরাং পরকালের কার্যের বেলায় তাহারা যাহা কিছু বলে তাহা কেবল মৌখিক উক্তি এবং শয়তানের প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা সম্পূর্ণ অমূলক।

ষষ্ঠ কারণ ঃ এই সকল লোক গর্বিত হইয়া বলে ঃ "আমরা এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, পাপ আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আমাদের অবস্থা দুই কুল্লা পানির মত; গুনাহের অপবিত্রতা আমাদিগকে অপবিত্র করিতেই পারে না।" (যে পাত্রে বিশ মণ পানি ধরে তাহাকে কুল্লা বলে। শাফেয়ী আলিমগণের মতে দুই কুল্লা পরিমাণ পানিতে সামান্য নাপাক মিশ্রিত হইলে পানি নাপাক হয় না।) এই নির্বোধের অনেকে এত সংকীর্ণ মনা যে, তাহাদের সহিত কেহ কোন বেয়াদবির কথা বলিলে এবং তাহাদের অভিমানে আঘাত হানিলে ও রিয়া প্রকাশ করিয়া দিরে তাঁহারা চিরতরে তাহার শত্রু হইয়া পড়ে; লালসার বস্তুর এক গ্রাস কম হইলে তাহারা দুনিয়া আঁধার দেখে। মানবতাগুণে যাহাদের স্বভাব এত সংকীর্ণ ও অনুদার, দুই কুল্লা পানির ন্যায় কোন পাপই তাহাদের ক্ষতি করিতে পারে না–এরূপ মিথ্যা দাবি করা তাহাদের

পক্ষে কি প্রকারে শোভা পায়? বস্তুত পাপ হইতে নির্ভয় হওয়ার ন্যায় উচ্চ মর্যাদায় এই নির্বোধগণ উপনীত হয় নাই। আর যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, শত্রুতা, ক্রোধ, লালসা, রিয়া হইতে ব্যক্তি বিশেষ একেবারে পাকপবিত্র তথাপি তাহার পক্ষেও তদ্রূপ দাবি করা অহংকারমাত্র। কারণ তাহার মরতবা কখনও পয়গম্বরগণের মরতবা হইতে বৃদ্ধি পাইবে না অথচ পয়গম্বরগণ সামান্য অসাবধানতা ও পদস্খলনের জন্য রোদন করিতেন এবং তওবা করিতেন। বড় বড় সাহাবা ছোট ছোট পাপ হইতেও সভয়ে দূরে থাকিতেন। বরং সন্দেহের ভয়ে হালাল বস্তু হইতেও তাঁহারা বহু দূরে সরিয়া পড়িতেন। পক্ষান্তরে এই নির্বোধগণ কিরূপে জানিল যে, শয়তানের প্রতারণায় তাহারা পড়ে নাই? আর কেমনে বুঝিল যে, পয়গম্বর ও সাহাবাগণ অপেক্ষা তাহাদের মরতবা বৃদ্ধি পাইয়াছে? এই নির্বোধগণ যদি বলে পয়গম্বরগণও এমন ছিলেন যে, পাপ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিত না; কিন্তু মানবের শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্য তাহারা সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে রোদন ও তওবা করিতেন তবে তাহারাও মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তদ্রূপ করে না কেন? অথচ তাহারা দেখিতেছে যে, যে কেহ তাহাদের কথা ও কর্মের অনুসরণ করিতেছে সে-ই ধ্বংস হইতেছে। তাহরা যদি বলে, মানবজাতি ধ্বংস হইলে 'আমাদের কি ক্ষতি?' তবে দেখ রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই বা কি ক্ষতি ছিল? কোন ক্ষতিই না থাকিলে তিনি তাকওয়া ও পরহেযগারিতে এত কঠোর সাধনায় লিপ্ত ছিলেন কেন? একদা তিনি অসাবধানতা বশত সাদকার একটি খেজুর মুখে দিলেন। কিন্তু সাদকার বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ইহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহা তিনি খাইয়া ফেলিলে ইহাতে মানবজাতির কি ক্ষতি হইত? বরং তিনি খাইয়া ফেলিলে সাদকার মাল সকলের জন্য হালাল হইয়া যাইত। যদি বল, ঐ খেজুর ভক্ষণে তাঁহার অনিষ্ট ছিল, তবে বল দেখি, গামলা গামলা মদে কি এই নির্বোধদের কোন ক্ষতি নাই? মোট কথা এই নির্বোধদের মরতবা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মরতবা অপেক্ষা অধিক নহে এবং একটি সদকার খেজুর অপেক্ষা একশত গামলা মদ নিশ্চয়ই অধিক অপবিত্র এব কি এই হতভাগ্যরা নিজদিগকে মহাসমুদ্রের ন্যায় মনে করিতেছে যে, উহার মধ্যে শত শত গামলা মদ ঢালিয়া দিলেও উহা অপবিত্র হইবে না এবং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি ক্ষুদ্র পানি পাত্র বলিয়া মনে করিতেছে যাহাতে একটিমাত্র খেজুর পড়িলেই পানি অপবিত্র হইয়া যাইবে! (নাউযুবিল্লাহ) বস্তুত শয়তান তাহাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। আর দুনিয়ার নির্বোধ লোকেরা তাহাদিগকে লইয়া তামাশা করিতেছে। কেননা জ্ঞানিগণ তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহেন না এবং তাহাদিগকে বিদ্রূপ করাও ঘৃণার কাজ বলিয়া মনে করেন। বুযর্গগণ জানেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে দমন ও বশীভূত করিতে অক্ষম সে মানুষ নামে যোগ্য নহে, বরং নরাকৃতি পশু।

জানিয়া রাখা উচিত যে, মানুষের রিপু নিতান্ত প্রবঞ্চক ও দাগাবাজ। ইহা অন্যায় দাবি করে, অসার বাহাদুরী দেখায় এবং নিজকে জবরদস্ত বলিয়া মনে করে। সুতরাং রিপুর নিকট হইতে সর্বদা ইহার দাবিদার সত্যতার প্রমাণ তলব করা সকলেরই কর্তব্য। রিপুগণ যখন স্বাধীনভাবে না চলিয়া শরীয়তের আজ্ঞাধীন থাকে এবং সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে শরীয়তের আদেশ মানিয়া চলে তখন ইহাদিগকে বিশ্বস্ত বলা যায়। কিন্তু শরীয়তের বিধান মান্য করার বেলায় ছল-চাতুরি ও টালবাহানা তালাশ করিলে সে শয়তানের গোলাম, যদিও সে নিজকে আল্লাহ্র ওলী বলিয়া দাবি করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নফসের নিকট সাধুতার দাবির সত্যতার প্রমাণ তলব করা উচিত। অন্যথায় গর্বিত ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নফসকে সর্বোতভাবে শরীয়তের আজ্ঞাধীন করিয়া রাখা মুসলমানীর প্রথম সোপান; অথচ সকলে একথা জানে না।

সপ্তম কারণ ঃ এ কারণটি লোকের গাফলতি ও খাহেশ হইতে উৎপন্ন হয়; অজ্ঞতা মূর্খতা ইহার কারণ নহে। প্রবৃত্তির দাস এই সকল মোহাবিষ্ট লোক হারামকে হালাল করিয়া লয় এবং উপরে তাহাদের মোহান্ধতার কারণ স্বরূপ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা তাহারা বুঝে না। যাহারা হারামকে হালাল করিয়া লয়, সমাজে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। মিষ্ট ও চাটু কথা বলে এবং সূফীদের পোশাক পরিধানপূর্বক দরবেশীর দাবি করে তাহাদের দেখাদেখি এই শ্রেণীর লোকেরাও ঐরূপ কার্যে আনন্দ পায়। তাহাদের হৃদয়ে বাজে কাজ ও কামনার বস্তুর দিকে টান অধিক বলিয়াই তাহারা এই সকলের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। তাহরা জানে না যে, এই সকল কার্যের জন্য তাহারা পরকালে আযাব ভোগ করিবে। ইহা জানিলেও তাহাদের নিকট এই সকল কাজ তিক্ত ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। এই সমস্ত দুষ্কর্মের সমালোচকগণকে তাহারা মিথ্যা অপবাদকারী ও মনগড়া নূতন কথা বলেন বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকে; অথচ মিথ্যা অপবাদ ও মনগড়া নূতন কথা কাহাকে বলে তাহাও তাহারা জানে না। এই ধরনের লোক বাস্তবিক গাফিল ও প্রবৃত্তির গোলাম। তাহারা শয়তানের আজ্ঞাধীন। শত বুঝাইলেও তাহারা ঠিক হয় না। কারণ, তাহাদের অবলম্বিত পথ যে খাঁটি সত্য, ইহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেনঃ

انَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا - وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا -

অর্থাৎ "তাহাদের হৃদয়সমূহের উপর পর্দা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কানের উপর বধিরতা চাপিয়া বসিয়াছে। এইজন্য তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। যদি আপনি তাহাদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন তথাপি অবশ্যই তাহারা কখনও পথ পাইবে না।"

এই সকল লোকের সহিত যবান দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া তলোয়ারের যবান দ্বারা কথা বলা উচিত।

শরীয়ত লঙ্ঘনকারী গাফিলদের স্বরূপ ও প্রতিকার ঃ যাহারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে তাহাদের ভ্রম-প্রদর্শন ও উপদেশ দান সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই যথেষ্ট। তাহাদের ভ্রম ও গোমরাহির কারণ এই–হয়ত তাহারা নিজকে চিনে নাই বা আল্লাহ্‌কে চিনে নাই কিংবা শরীয়তের জ্ঞান লাভ করে নাই। প্রকৃতির অনুকূল ব্যাপারে মানুষের অজ্ঞতা থাকিলে ইহা বিদূরিত করা বড় কঠিন। এইজন্যই লোকেরা নিঃসন্দেহে ও অনায়াসে হারামকে হালাল মানিয়া চলিয়াছে। তাহারা বলে, তাহারা হতভম্ব হইয়া রহিয়াছে। কোন্ বিষয়ে হতভম্ব হইয়া রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন উত্তর দিতে পারে না। কারণ, তাহাদের সত্যের অনুসন্ধান নাই এবং যে গোমরাহির পথে তাহারা চলিয়াছে তদ্‌প্রতি তাহাদের কোন সন্দেহও নাই। তাহাদের অবস্থা এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যে, চিকিৎসককে বলে, আমি পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু কি পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি তাহা সে বলে না। অতএব রোগ না জানিয়া চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে পারে না। তদ্রূপ লোকের অভিযোগের উত্তরে এইমাত্র বলা উচিত– তুমি যাহা চাহ তাহাতেই হতভম্ব থাক। কিন্তু এই বিষয়ে মোটেও সন্দেহ পোষণ করিও না যে, তুমি আল্লাহ্‌র একজন গোলাম, তোমার সৃষ্টিকর্তা অসীম ক্ষমতাশালী, অনন্ত জ্ঞানবান; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

উল্লিখিত দলিল প্রমাণাদি দ্বারা এই ধরনের লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার পরিচয়

দুনিয়ার অর্থ ঃ দুনিয়া ধর্মপথে অবস্থিত একটি পান্থশালা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে গমনকারীদের রাস্তা ও মারিফাতের মরুভূমি পার হইবার অভিলাষী পথিকদের পাথেয় খরিদের জন্য একটি সুসজ্জিত বাজার। মানুষের মৃত্যুর পূর্ববর্তী নিকটস্থ অবস্থাটিকে দুনিয়া এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাকে আখিরাত বলে। আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের জন্যই দুনিয়ার আবশ্যকতা। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় আল্লাহ্ মানুষকে নিতান্ত অপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, এমন যোগ্যতা তাহার মধ্যে থাকে এবং আধ্যাত্মিক জগতের ছবি নিজ হৃদয়পটে এমনভাবে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারে যে, আল্লাহ্‌র মহান দরবারে স্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করত তাঁহার অনন্ত রূপরাশি দর্শনে লিপ্ত থাকিতে পারে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বেহেশ্‌ত লাভ হয় এবং ইহাই মানব সৌভাগ্যের চরম সীমা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মানুষকে এই অবস্থা লাভের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পর্যন্ত মানবের আধ্যাত্মিক চক্ষু না ফুটিবে, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র চির অক্ষয় সৌন্দর্যের পরিচয় না পাইবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকিবে। আল্লাহ্‌র মারিফাত দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র আশ্চর্য শিল্প-কৌশলের পরিচয় লাভ করিলেই তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের ইন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহ্‌র শিল্প-কৌশল চিনা যায় আবার পানি ও মাটি দ্বারা গঠিত এই দেহ পিঞ্জর ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের স্থিতি অসম্ভব। এইজন্য মানুষ এই পানি ও মাটির জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব জগত হইতে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবে। এবং আত্মপরিচয় ও বহির্জগতের জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করিবে। যতদিন ইন্দ্রিয়সমূহ মানুষের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া সংবাদ সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকে, ততদিনই মানুষকে দুনিয়াতে আছে বলিয়া বলা হয়। অতঃপর ইন্দ্রিয়সমূহ বিদায় নিলে মানবাত্মা যখন কেবল স্বাভাবিক গুণে বিরাজমান থাকে তখন মানুষের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই মানবের দুনিয়াতে অবস্থানের উদ্দেশ্য।

মানুষের পার্থিব আবশ্যকতা ঃ দুনিয়াতে মানুষের দুই প্রকার বস্তুর আবশ্যক। প্রথম আত্মাকে ধ্বংসের কারণসমূহ হইতে রক্ষা করা এবং আত্মার আহার্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়, দেহকে ধ্বংসকারী কারণসমূহ হইতে রক্ষা করা এবং দেহের খাদ্য সংগ্রহ করা।

আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তাহার মহব্বতই আত্মার আহার্য। কারণ, যাহা প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুযায়ী তাহাই খাদ্য। মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য পদার্থের মহব্বতে ডুবিয়া থাকা আত্মার ধ্বংসের কারণ। আত্মার জন্যই শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন; কেননা শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং আত্মা চিরস্থায়ী থাকিবে। আত্মার জন্যই যে শরীর আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কা'বা শরীফে যাইবার পথে হাজীর জন্য যেমন উটের আবশ্যক, আত্মার গন্তব্য পথে শরীরেরও তদ্রূপ আবশ্যক। হাজীর জন্যও উটের আবশ্যক, উটের জন্য হাজী নহে। কা'বা শরীফে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত উটের আবশ্যক এবং সেই পর্যন্ত আহারাদি দিয়া উটকে প্রতিপালন করাও হাজীর কর্তব্য। কিন্তু উটের পরিচর্যা আবশ্যক পরিমাণ হওয়া উচিত। পথ চলায় ক্ষান্ত দিয়া হাজী উটের আহার যোগাইতে ও সাজসজ্জা করিতে দিবারাত্র মশগুল থাকিবে সে কাফেলার পিছনে পড়িয়া বিনাশ হইবে। তদ্রূপ মানুষ দিবারাত্র শরীরের পরিচর্যা করিলে অর্থাৎ আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে স্বীয় সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে।

মানব শরীর রক্ষার জন্য তিন প্রকার বস্তুর আবশ্যক। (১) আহার্য বস্তু, (২) পরিধেয় বস্ত্র ও (৩) শীত, গ্রীষ্ম ও অন্যান্য বিপদাপদ হইতে হিফাজতের জন্য বাসস্থান। এই তিন প্রকার পদার্থ ব্যতীত মানুষের শরীর রক্ষার জন্য তাহার আর কিছুর আবশ্যক নাই। বস্তুত এই তিনটিই দুনিয়ার মূল।

আল্লাহ্র মারিফাত আত্মার খাদ্য। যত অধিক পরিমাণে ইহা লাভ করা যায় ততই মঙ্গল। আর খাদ্যদ্রব্য শরীরের আহার। সীমা ছাড়াইয়া অধিক আহার করিলে বিনাশের কারণ হয়। আল্লাহ্ মানুষকে খাহেশ প্রদান করিয়াছেন; উদ্দেশ্য এই যে, আহার বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য ইহা মানুষকে প্রেরণা দিবে যেন তাহার বাহনস্বরূপ দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু খাহেশের স্বভাব এই যে, সে সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক পাইতে চায়। খাহেশকে ইহার সীমায় ঠিক রাখিবার জন্য আল্লাহ্ বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খাহেশের সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবার জন্য তিনি পয়গম্বরগণের মধ্যস্থতায় শরীয়ত প্রদান করিয়াছেন। দেহ রক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া শৈশবকালেই আল্লাহ্ মানুষকে খাহেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাই খাহেশ বুদ্ধির অগ্রে মানব-মনে স্থান অধিকার করিয়া প্রবল হইয়া উঠে এবং বুদ্ধি ও শরীয়তের অবাধ্য হইয়া মানুষকে আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের অন্বেষণে দেহ-মনে ব্যাপৃত রাখে। এইজন্যই মানুষ নিজকে ভুলিয়া যায়। আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান আবশ্যক কেন, মানুষ কি জন্য দুনিয়াতে আসিয়াছে, আত্মার খোরাক ও পরকালের পাথেয় কি–এই সমস্তই সে তখন ভুলিয়া যায়। এই বর্ণনা হইতে দুনিয়ার অর্থ, ইহার আবাদ ও আবশ্যকতা বুঝা গেল। এখন দুনিয়ার শাখা-প্রশাখা ও দুনিয়াতে কি কাজ করিতে হইবে তাহা জানা আবশ্যক।

পার্থিব বস্তুর শ্রেণী বিভাগ ঃ দুনিয়ার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে বুঝা যাইবে যে, তিন শ্রেণীর বস্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যথা– (১) ভূমিজাত-বস্তু, যেমন উদ্ভিদ; (২) খনিজ পদার্থ ও (৩) জীবজন্তু বাসস্থান ও কৃষিকার্যের জন্য ভূমির দরকার। বাসনপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের জন্য খনিজ পদার্থ, তামা, পিতল ও লৌহের আবশ্যক। আর বাহন ও খাদ্যের জন্য জীব-জন্তুর প্রয়োজন। মানুষ নিজের দেহ ও মনকে এই তিন শ্রেণীর বস্তু সংগ্রহেই মশুগল রাখে। মনকে এই সমস্তের কামনায় ও ভালবাসায় এবং হস্তুপদকে এইগুলি সংগ্রহ ও নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত রাখে। মনকে এইরূপে লিপ্ত রাখার দরুন হৃদয়ে লোভ, কৃপণতা, শত্রুতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণের উদ্রেক হয় এবং পরবর্তীকালে এইগুলি তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। হস্তপদকে দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রাখিরে সঙ্গে সঙ্গে মনও উহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মানুষ নিজকে ভুলিয়া একমাত্র দুনিয়ার কাজেই তাহার সর্বশক্তি নিযুক্ত রাখে।

পার্থিব ব্যবসায়ে পরস্পর নির্ভরশীলতা ঃ আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান যেমন সংসারের মূল তদ্রূপ মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকার্য ও ত্রিবিধ ঃ যথা–(১) স্বর্ণকারের কার্য, (২) বয়নকার্য ও (৩) স্থপতি কার্য। কিন্তু ইহাদের প্রতিটিরই শাখা-প্রশাখা আছে। কোন ব্যবসায়ী তো মূল শিল্পকার্যের উপাদান সংগ্রহ করে; যেমন ধনুকর ও সূত্রকরগণ, তাঁতীর আবশ্যক সূতা তৈয়ার করিয়া দেয়। দরজি আবার তাঁতীর কাজ পূর্ণ করে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীর জন্য আবার কাষ্ঠ, লৌহ, চর্ম ইত্যাদি দ্রব্য-নির্মিত যন্ত্রপাতির আবশ্যক। এইজন্যই কর্মকার, চর্মকার, সূত্রধরের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং একে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। কারণ, কোন ব্যবসায়ীই নিজ নিজ ব্যবসায়ের জন্য আবশ্যক সমস্ত কার্য একাকী সম্পন্ন করিতে পারে না। এইজন্য তাহারা দুনিয়াতে পরস্পর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। দরজি তাঁতি ও কর্মকারকে সাহায্য করে; কর্মকার আবার তাহাদের উভয়কে সাহায্য করে। এইরূপে দুনিয়াতে একজন অপরজনের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাতেই সমাজ-বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কারণেই একজনের সঙ্গে অপরজনের শত্রুতা জন্মিয়াছে–একে অন্যের হক আদায়ে অনিচ্ছুক হইয়াছে–একজন অপরজনের ক্ষতি করিতে চেষ্টা

করিয়াছে। সুতরাং এই সমস্তের মীমাংসার জন্য অপর তিন শ্রেণীর কার্যের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে ঃ যথা– (১) শাসন ও সাম্রাজ্য পরিচালনা (২) বিচার ও (৩) আইন-প্রণয়ন। আইন-শাস্ত্র মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনকার্যের প্রণালী শিক্ষা দেয়। অন্যান্য ব্যবসায় হস্তপদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে এইগুলিতে তদ্রূপ না থাকিলেও উহাদিগকে ব্যবসাই বলা চলে। এই কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর মানুষ এই সকল ব্যবসায় ডুবিয়া থাকিয়া নিজকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সংসারের ছলনায় মানবের ভ্রম ঃ মানব এ কথা বুঝে না যে সংসারের অসংখ্য ব্যবসায়ের মূল হইল একমাত্র আহার, পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান। এই তিন পদার্থ লাভের জন্যই দুনিয়ার সকল ব্যবসা। আবার এই ত্রিবিধ পদার্থ শরীর রক্ষার জন্য। শরীর আত্মার বাহনের জন্য এবং আত্মা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। কিন্তু মানুষ নিজকে ও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে। সে এমন হজ্জযাত্রীর ন্যায় যে নিজের উদ্দেশ্যে, কা'বা শরীফের কথা ও যাত্রার বিষয় ভুলিয়া গিয়া বাহন উটের পরিচর্যায় তাহার সমস্ত সময় অপচয় করে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই দুনিয়া ও দুনিয়ার অর্থ। যে ব্যক্তি দুনিয়া হইতে প্রস্থানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত না থাকে, আখিরাত যাহার একমাত্র লক্ষ্য না হয় এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে আবশ্যকের অতিরিক্ত লিপ্ত হয়, সে দুনিয়াকে চিনে নাই। এই অজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়া হারুত ও মারুত অপেক্ষা অধিক যাদুকর; ইহা হইতে দূরে থাক।

দুনিয়ার ছলনার দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়া যখন এত বড় যাদুকর তখন ইহার ছলনা-প্রবঞ্চনা অবগত হওয়া এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার চাতুরি মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এখন দুনিয়ার ছলনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে ঃ

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়া নিজকে তোমার নিকট এমনভাবে দেখায় যে, তুমি মনে করিতেছ, সে চিরকাল তোমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তাহা নহে, দুনিয়া সর্বদা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতেছে। দুনিয়ার অবস্থা ছায়ার ন্যায়। ছায়াকে প্রথম দৃষ্টিতে স্থির বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রতি পলকে ইহা সরিয়া পড়িতেছে। তুমি জান, তোমার পরমায়ুও তদ্রূপ সর্বদা তোমা হইতে পলায়ন করিতেছে এবং তোমাকে দূরে সরাইয়া দিতেছে তাহাই দুনিয়া। অথচ তুমি একেবারে বেখবর।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়া তোমার নিকট নিজকে তোমার প্রেয়সী ও প্রেমিকারূপে উপস্থাপিত করে এবং প্রকাশ করে যে, সে কখনই তোমার সহিত প্রতারণা করিবে না

ও তোমাকে ছাড়িয়া কাহারও নিকট যাইবে না। কিন্তু সে হঠাৎ তোমাকে ছাড়িয়া তোমার দুশমনের নিকট চলিয়া যায়। দুনিয়া লম্পট কুলাটা রমণীর ন্যায় পুরুষদিগকে নিজের প্রতি আসক্ত করিয়া আপন গৃহে লইয়া যায় এবং তৎপর তাহাদিগকে ধ্বংস করে। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম দুনিয়াকে কাশ্‌ফ দ্বারা বৃদ্ধা রমণীর মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কয়টি স্বামী গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল ঃ অসংখ্য, গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাহারা মরিয়া গিয়াছে, না তাহারা তোমাকে তালাক দিয়াছে? সে বলিল ঃ না, আমি সকলকেই মারিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ঐ সকল ও এই সমস্ত নির্বোধের ব্যাপার অতীব বিস্ময়কর। তুই অপরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিস তাহা দেখিয়াও তাহারা তোর প্রতি আসক্ত হইতেছে, উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না। হে আল্লাহ্ আমাদিগকে দুনিয়ার যাদু হইতে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঃ বাহ্যিক আকৃতিতে দুনিয়া নিজকে সুন্দর সাজসজ্জায় বিভূষিত করিয়া রাখে এবং ইহার ভিতরে যে সকল বিপদ ও ক্লেশ আছে উহা লুকাইয়া রাখে যাহাতে নির্বোধগণ ইহার বাহ্য আকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। দুনিয়া এমন এক বৃদ্ধা রমণীর ন্যায় যে আপন মুখমণ্ডল ঢাকিয়া বহুমূল্যবান বিচিত্র বেশভূশায় ও অলংকারে বাহ্য শরীর সর্বদা সজ্জিত রাখে এবং যাহাকে লোকে দূর হইতে দেখিয়া তৎপ্রতি একান্ত আশিক হইয়া পড়ে। কিন্তু তৎপর ইহার মুখমণ্ডল হইতে ঘোমটা উন্মোচন করত কুৎসিত আকার দেখিয়া লজ্জিত ও বিরক্ত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ দুনিয়াকে কদাকার বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করিবে। ইহার চক্ষু সবুজ থাকিবে, বড় বড় দাঁত মুখের বাহিরে দৃষ্টিগোচর হইবে। লোকের ইহাকে দেখিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে ঃ এ কদাকার ও পাপিষ্ঠা রমণী কে? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলিবে ঃ ইহাই সেই দুনিয়া যাহার কারণে তোমরা পরস্পর হিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হইয়া একে অন্যের সহিত ঝগড়া ও মারামারি কাটা-কাটি করিতে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করত ইহার প্রেমে পাগল হইয়া পড়িতে। ইহার পর দুনিয়াকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন সে বলিবে ঃ হে আল্লাহ্, যাহারা আমার বন্ধু ছিল তাহারা কোথায়? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তাহাদিগকেও ইহার সহিত দোযখে নিক্ষেপ কর।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত ঃ হিসাব করিলে দেখা যাইবে, সৃষ্টির আদিম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং আদিম সময়ে বহুকাল তাহার সহিত দুনিয়ার কোন সম্বন্ধই ছিল না। আবার শেষভাগেও অনন্তকাল দুনিয়া থাকিবে না। সুতরাং দুনিয়ার মুসাফিরের পথ-স্বরূপ। ইহার আরম্ভ সূতিকা-গৃহে ও শেষ কবর। উভয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট মঞ্জিল রহিয়াছে। প্রত্যেকটি

বৎসর যেমন ঃ এক একটি মঞ্জিল প্রত্যেকটি মাস এক একটি যোজন, প্রত্যেক দিন এক মাইল এবং প্রত্যেক নিঃশ্বাস এক পদক্ষেপ। আর মানুষ অবিরত চলিয়াছে। কাহারও সম্মুখে এক যোজন পথ রহিয়াছে, কাহারও অধিক কাহারও আবার কম। দুনিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু মানুষ মনে করে দুনিয়া সে স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল এইভাবেই থাকিবে। এই ধারণায় দুনিয়ার দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহে সে এমনভাবে মত্ত হয় যাহাতে আগামী দশ বৎসরে তাহার কোন অভাব অনটন না ঘটে। অথচ দশ দিনের মধ্যেই সে ইহলোক পরিত্যাগ করে।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ার যে সমস্ত লোক সংসারের আপাতমধুর সুখ-শান্তিতে লিপ্ত হয়, ইহার বিনিময়ে পরকালে তাহারা অপমান ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে। তাহাদিগকে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায় যে, ঘৃতাক্ত ও সুমিষ্ট উপাদেয় খাদ্য অধিক পরিমাণে আহার করে। ইহাতে তাহার পেটে ভীষণ অসুখ হইয়া পড়ে। ফলে তাহার বমি হইতে থাকে এবং মানুষের নিকট লজ্জিত ও অপমানিত হয়। উত্তম খাদ্য আহারজনিত সুখ তো আহারের সময়ই বিলীন হইয়া গেল; কিন্তু তজ্জনিত যন্ত্রণা ও লজ্জা থাকিয়া যায়। খাদ্য দ্রব্য যত উত্তম ও সুখাদ্য হয়, ইহার মলও তত অধিক দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। এইরূপ দুনিয়া যাহার নিকট যত সুখকর আখিরাত তাহার নিকট তত অধিক কষ্টকর ও অপমানজনক হইবে। মৃত্যুর সময়ে এই সত্য আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পার্থিব ধনৈশ্বর্য যেমন প্রমোদ কানন, দাসদাসী, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি যাহাদের যত অধিক মৃত্যুর সময় দরিদ্রের তুলনায় ইহাদের বিয়োগ-যন্ত্রণা তাহাদের তত অধিকই হইয়া থাকে। মৃত্যুতে এই যন্ত্রণার অবসান ঘটে না, বরং বৃদ্ধি পায়। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা চিরকাল বিদ্যমান থাকে।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ঃ প্রত্যেকটি সাংসারিক কাজ প্রথমত মানুষের নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। সে ভাবে এ কাজে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকিতে হইবে না। কিন্তু কার্যে প্রবৃত্ত হইলে ইহা হইতে আরও শত শত কার্যের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং সমস্ত জীবন এই সকল কার্যেই শেষ হইয়া যায়। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন ঃ দুনিয়া অন্বেষণকারী সমুদ্রের পানি পানকারীর ন্যায়। সে যত অধিক পান করে পিপাসা ততই বৃদ্ধি পায়। তৎপর সে পান করিতে করিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার পিপাসা কখনই মিটে না। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পানিতে গেলে শরীর যেমন না ভিজিয়া যায় না, তদ্রূপ দুনিয়ার কাজে প্রবৃত্ত হইলে কেহই কলুষিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

সপ্তম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ায় আগত ব্যক্তির উপমা এইরূপ। মনে কর, কোন নিমন্ত্রণকারীর গৃহে কোন একজন মেহ্মান আসিল। নিমন্ত্রণকারীর এরূপ অভ্যাস যে,

তিনি সর্বদা মেহ্মানদের জন্য গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখেন, মেহমানদিগকে তিনি দলে দলে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করেন, আগরবাতি প্রজ্বলিত করেন এবং বিচিত্র রৌপ্যপাত্রে সুগন্ধি দ্রব্যাদি জ্বালাইয়া থাকেন। মেহমানগণ পান-ভোজনে সুগন্ধ দ্রব্য সেবনে মুগ্ধ হউক এবং অপর দলের জন্য ঐ সমস্ত স্বর্ণপাত্র ও ধূপদান রাখিয়া যাউক এই তাহার উদ্দেশ্য। মেহমানদের মধ্যে যাহারা নিমন্ত্রণকারীর রীতি অবগত আছে এবং বুদ্ধিমান তাহারা পান-ভোজন করিয়া ধূপদানে সুগন্ধিদ্রব্য নিক্ষেপ করত ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করে এবং স্বর্ণপাত্র ও ধূপদান রাখিয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে আনন্দের সাথে চলিয়া যায়। কিন্তু নির্বোধ মেহমান মনে করে এই সকল স্বর্ণপাত্র, ধূপদান, আগরবাতি ও সুগন্ধিদ্রব্য নিমন্ত্রণকারী আমাকে দান করিয়াছেন, আমি এগুলি লইয়া যাইব। কিন্তু লইয়া যাওয়ার সময় যখন লোকে ঐ সমস্ত কাড়িয়া রাখিয়া দেয় তখন সে নিতান্ত দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। দুনিয়া যেন একটি মেহমানখানা। আখিরাতের পথিকদের জন্য ইহা উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহা হইতে শুধু পাথেয় সংগ্রহ করা এবং ইহার কোন দ্রব্য লইবার লোভ না করাই তাহাদের উচিত।

অষ্টম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়াদার লোক দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হইয়া আখিরাতের কথা ভুলিয়া যায়। ইহাদিগকে একদল নৌকারোহী যাত্রীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যাত্রাপথে নৌকা কোন দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিল। আরোহীগণ মল-মূত্র পরিত্যাগ ও হস্তপদ ধৌত করিবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিল। নৌকার মাঝি ঘোষণা করিয়া দিল ঃ কেহই অধিক বিলম্ব করিতে পারিবে না, মল-মূত্র পরিত্যাগপূর্বক পাকসাফ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইতে পারিবে না। কারণ, নৌকা শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু যাত্রীরা দ্বীপে গিয়াই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যাহারা অতি বুদ্ধিমান, তাহারা তাড়াতাড়ি মল-মূত্র পরিত্যাগ করত পাকসাফ হইয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল। তখন নৌকা খালি থাকায় তাহারা নিজেদের পছন্দমত স্থান বাছিয়া লইল। অপর একদল যাত্রী দ্বীপের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখিবার জন্য রহিয়া গেল। তাহারা তথায় মনোরম পুষ্প, সুগায়ক পক্ষী, কারুকার্যখচিত প্রস্তর ও নানাবিধ রঙ-বেরঙের দ্রব্যাদি দেখিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যাগমন করত স্থান না পাইয়া সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময় স্থানে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। অন্য একদল দ্বীপের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখিয়াই ক্ষান্ত হইল না, দ্বীপ হইতে ভাল ভাল পাথরসমূহ বাছিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু নৌকায় এইগুলি রাখিবার স্থান পাইল না। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে উপবেশনপূর্বক পাথরগুলি নিজেদের স্কন্ধের উপর রাখিল। দুই দিন পর ঐ বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরসমূহের রং পরিবর্তিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এখন এই কদাকার দুর্গন্ধময় প্রস্তরগুলি ফেলিয়া দিবার স্থানও

পাওয়া গেল না। তাই এই দলটি নিতান্ত লজ্জিত হইল এবং প্রস্তরের বোঝা নিজেদের স্কন্ধে রাখিয়া অপরিসীম যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সর্বশেষ দলটি দ্বীপের বিচিত্র দৃশ্যাবলী দর্শনে এত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, উহা দেখিতেই থাকিল। এদিকে নৌকা চলিয়া আসিল, উহারা দূরে পড়িয়া রহিল যে, উহা দেখিতেই থাকিল। এদিকে নৌকা চলিয়া আসিল, উহারা দূরে পড়িয়া রহিল। মাঝির নিষেধ না মানিয়া ঐ দ্বীপে রহিয়া গেল। তাহাদের কেহ কেহ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা পড়িল; আবার কতকগুলিকে হিংস্রজন্তু হত্যা করিল। প্রথম দলের বুদ্ধিমান লোকদিগকে পরহেযগার মুসলমানের সহিত তুলনা করা যায়। আর সর্বশেষ যে দলটি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও হিংস্রজন্তুর হস্তে প্রাণ হারাইল তাহারা কাফিরদের তুল্য। তাহারা নিজেকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার মোহে লিপ্ত ছিল। তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِسْتَحَبُّوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ "তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছে।"

মধ্যবর্তী দুই দল গুনাহ্গার মু'মিনের তুল্য। তাহারা আসল ঈমান রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু দুনিয়া হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে নাই। একদল দীনতার সহিত ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। অপর দল ভ্রমণের তৃপ্তি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্কন্ধে স্থাপন করত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

দুনিয়াতে চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপাদান ঃ দুনিয়ার অনিষ্টকারিতা যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে ভাবিও না যে, দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সবই মন্দ। বরং দুনিয়াতে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, ইল্ম ও আমল দুনিয়াতে থাকিলেও দুনিয়ার অন্তর্গত নহে। কেননা এ দুইটি মানুষের সহিত পরকালে যাইবে। ইল্ম তো প্রকাশ্য তা সঠিকভাবে মানুষের সহিত থাকিবে এবং আমল সঠিকভাবে না থাকিলেও ইহার প্রভাব থাকিবে। সৎ আমলের প্রভাব দুই প্রকার। একটি আত্মার পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। ইহা পাপ পরিত্যাগের ফলস্বরূপ অর্জিত হইয়া থাকে। অপরটি আল্লাহ্র যিকিরের মহব্বত। ইহা সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকার ফলে অর্জিত হয়। এইগুলি চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক কার্যরূপে পরিগণিত। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ـ

অর্থাৎ "আর চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক কর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকট অতি উত্তম।"

পরকালের সহায়ক পার্থিব বস্তু অমঙ্গলজনক নহে ঃ ইল্ম ও মুনাজাতের আনন্দ এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি আসক্তি, সংসারের সকল ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা মিষ্টতম।

এগুলি দুনিয়াতে থাকিলেও দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। এইজন্য দুনিয়ার সকল ভোগ্যবস্তুই মন্দ নহে। এমনকি যে সকল ভোগ্যবস্তু ধ্বংস হইয়া যায়, স্থায়ী থাকে না, তাহাদের সবই মন্দ নহে। ভোগ্যবস্তুও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, যে সকল বস্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসও হইয়া যায়, কিন্তু পরকালের কার্য ইল্ম ও আমলের সহায়তা করে এবং মুসলমানের বংশ বৃদ্ধি করে, এগুলি মন্দ নহে; যেমন বিবাহ, পানাহার-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান। এই সকল বস্তু পরিমাণগত ও পরকালের আবশ্যক অনুযায়ী ব্যবহার করিলে খারাপ নহে। প্রশান্ত মনে ইবাদতে লিপ্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই সকল বস্তু আবশ্যক পরিমাণে লাভ করিয়া পরিতুষ্ট থাকে, সে দুনিয়াদার নহে। দ্বিতীয় পার্থিব বস্তুর মধ্যে যেগুলির উদ্দেশ্য পরকাল নহে। বরং যাহা ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা, অহংকার ও দুনিয়ার আসক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরকালের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয় তাহাই ঘৃণ্য ও মন্দ। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّ مَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ وَ اِلاَهُ -

অর্থাৎ "দুনিয়া স্বয়ং অভিশপ্ত এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও আল্লাহ্‌র যিকিরকার্যে সাহায্যকারী ব্যতীত জগতে আর যাহা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"

দুনিয়ার অর্থ ও দুনিয়ার উদ্দেশ্য বুঝাইতে উপরে যাহা বর্ণিত হইল এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

পরকালের পরিচয়

আধ্যাত্মিক ও আদিভৌতিক বেহেশত-দোযখ ঃ মৃত্যুর অর্থ না বুঝা পর্যন্ত কেহই পরকালের অর্থ বুঝিতে পারে না। আবার জীবনের অর্থ বুঝিতে না পারিলে মৃত্যুর অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আত্মার মর্ম না বুঝিয়া জীবনের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আত্মার মর্ম উপলব্ধি করার নামই নিজকে চেনা। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ দুই পদার্থে গঠিত–একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। আত্মা আরোহী ও শরীর ইহার বাহন। শরীরের কারণে পরকালে আত্মা এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে যাহার দরুন সে বেহেশতের পরমসুখ অথবা দোযখের চরম শাস্তি ভোগ করিবে। ইহা ছাড়া শরীরের কোন সম্পর্ক ও অধিকার ব্যতীত শুধু আত্মার আর একটি স্বাভাবিক অবস্থা আছে যাহার ফলে ইহাকে বেহেশতের সুখ বা দোযখের শাস্তি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। শরীরের সম্পর্ক ব্যতীত কেবল স্বাভাবিক অবস্থার জন্য আত্মা যে সুখ ও সৌভাগ্য ভোগ করিবে ইহা আধ্যাত্মিক বেহেশত ও শরীরের সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মা যে যন্ত্রণা ভোগ করিবে ইহা আত্মিক দোযখ। শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বেহেশত-দোযখের কথা সর্বজনবিদিত। রম্য কানন, সুন্দর স্রোতস্বিনী, সুনয়না সহধর্মিণী, সুরম্য অট্টালিকা, উপাদেয় পানাহার ইত্যাদি দৈহিক বেহেশতে পাওয়া যাইবে। অগ্নি, সর্প, বিচ্ছু, কণ্টকময় বৃক্ষ প্রভৃতি দৈহিক দোযখে রহিয়াছে। কুরআন হাদীসে দৈহিক বেহেশত-দোযখের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে এবং সকলেই উহা বুঝিতে পারে। আর 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে 'মওতের বর্ণনা' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ স্থলে আধ্যাত্মিক বেহেশত-দোযখের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া মৃত্যুর অর্থ বিশদভাবে বর্ণিত হইবে। কারণ, মৃত্যুর হাকীকত সকলে অবগত নহে। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

أُعِدَّتْ لِعِبَدِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَّأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ـ

অর্থাৎ "আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের কল্পনায় উদয়ও হয় নাই।" ইহাতে আধ্যাত্মিক বেহেশত সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। মানবাত্মার একটি দ্বার আধ্যাত্মিক জগতের দিকে খোলা আছে। ইহার সাহায্যে এই আধ্যাত্মিক বেহেশতের রহস্য জানা যায়। আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাহার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বেহেশত সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় থাকে না এবং তাহার মনে পরকালের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া থাকে। শুধু অপরের নিকট শুনিয়া মানিয়া লওয়াতে নহে বরং প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

মানবাত্মার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের কারণ ঃ চিকিৎসক জানে, এই জগতে মানবদেহের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পীড়া আছে। স্বাস্থ্য ও পীড়ার অনেক কারণ রহিয়াছে। ঔষধ সেবন ও কুপথ্য বর্জন স্বাস্থ্যের কারণ এবং অতিরিক্ত আহার ও কুপথ্য ভক্ষণ পীড়ার কারণ। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়াছে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, মানবাত্মার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আছে। মারিফাত ও ইবাদত আত্মার পীড়ার ঔষধ এবং সৌভাগ্য লাভের উপায়; অজ্ঞানতা ও পাপ আত্মার পক্ষে ধ্বংসকারী বিষয়স্বরূপ। এই সমস্ত জানা একটি বড় গৌরবের বিদ্যা। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত এমন বহু বিদ্বান লোকও এই সকল বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এমনকি কেহ কেহ উহা অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল দৈহিক বেহেশত-দোযখ মানেন এবং একমাত্র অপরের কথা শুনিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আখিরাতের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ের প্রকৃত অর্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা আমি [অর্থাৎ হযরত ইমাম গাযালী (র) সাহেব] প্রমাণাদিসহ আরবী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহার বুদ্ধি আছে এবং যাহার হৃদয় অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ বিশ্বাসের মলিনতা হইতে পবিত্র তাহার জন্য এ-স্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, সে পরকালের পথ পাইবে এবং তাহার অন্তরে পরকালের অবস্থা দৃঢ়রূপে প্রতিফলিত হইবে। পরকাল সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস নিতান্ত দুর্বল ও নড়বড়ে (পরিবর্তনশীল)।

জীবাত্মা ও মানবাত্মা ঃ মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ ও অবস্থা জানিতে চাহিলে প্রথমেই মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের দুই প্রকার আত্মা আছে। একটি সাধারণ জন্তুর আত্মার সমজাতীয়। ইহাকে জীবাত্মা বলে। অপরটি ফেরেশতাগণের আত্মার সমজাতীয়। ইহাকে মানবাত্মা বলে।

জীবাত্মার মূল উৎস বক্ষঃস্থলে বাম পার্শ্বে অবস্থিত হৃদপিণ্ড নামক গোশ্ত খণ্ড। ইহা প্রাণী-দেহের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম তেজসদৃশ বস্তু।

ইহার প্রকৃতি নাতিশীতোষ্ণ। ইহার প্রভাব হৃদপিণ্ড হইতে প্রবহমান স্নায়ুপথে বাহির হইয়া মস্তিষ্কে ও অন্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে। এই জীবাত্মা সংজ্ঞা ও চলার শক্তি প্রদান করে। ইহার প্রভাব মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলে ইহার উষ্ণতা কমিয়া সমভাবাপন্ন হয়। ইহার প্রভাবেই চক্ষু দর্শন ক্ষমতা লাভ করে এবং কর্ণ শ্রবণশক্তি পাইয়া থাকে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ক্ষমতা লাভ করে। জীবাত্মাকে প্রদীপের সহিত তুলনা করা চলে। প্রদীপ গৃহের অভ্যন্তরে যে-স্থানে স্থাপিত হয় ইহার আলোকে গৃহের প্রাচীরসমূহ আলোকিত হয়। প্রদীপের আলোক প্রাচীরে পতিত হইলে প্রাচীর যেমন আলোকিত হয় তদ্রূপ আল্লাহ্র কৌশল ক্রমে জীবাত্মার প্রভাব চক্ষে পতিত হইলে ইহা দর্শন ক্ষমতা লাভ করে; কর্ণে পতিত হইলে শ্রবণশক্তি পাইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় আপন আপন ক্ষমতা লাভ করে।

কোন স্নায়ুতে বন্ধন পড়িলে বন্ধনের পশ্চাতে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে তাহা অকর্মণ্য ও অবশ হইয়া যায়। ইহাতে তখন কোন সংজ্ঞা ও নড়াচড়ার শক্তি থাকে না। চিকিৎসক ঐ বন্ধন খুলিবার চেষ্টা করে। জীবাত্মা প্রদীপের শিখাস্বরূপ, হৃৎপিণ্ড শলিতা এবং পানাহার তৈল সদৃশ। প্রদীপে তৈল না দিলে যেমন প্রদীপ নিভিয়া যায় তদ্রূপ আহার না করিলে জীবাত্মার সাম্যভাব থাকে না এবং প্রাণ মরিয়া যায়। তৈল থাকিলেও তৈল টানিতে টানিতে শলিতা কিছুদিন পরে এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে, আর তৈল টানিতে পারে না। সুতরাং প্রদীপ নিভিয়া যায়। তদ্রূপ বহুদিন পর হৃদপিণ্ডও এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে, আর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। প্রদীপে আঘাত করিলে তৈল– শলিতা থাকা সত্ত্বেও প্রদীপ নিভিয়া যায়। সেইরূপ কোন প্রাণীকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেও ইহা মরিয়া যায়। যতদিন জীবাত্মার স্বভাব সমভাবাপন্ন থাকে ততদিন সে আল্লাহর আদেশক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের নূর হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বোধশক্তি ও গতিশক্তি গ্রহণ করে। কিন্তু উষ্ণতা বা শীতলতার আধিক্য অথবা অন্য কোন কারণে উহার সেই সাম্যভাব না থাকিলে জীবাত্মা আর ঐ শক্তি গ্রহণের উপযোগী থাকে না। দর্পণ যতক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ জড় পদার্থের ছবি গ্রহণ করে অর্থাৎ ইহাতে ছবি দেখা যায়, কিন্তু দর্পণ নষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন হইলে ইহার ছবি গ্রহণের ক্ষমতা আর থাকে না অর্থাৎ ইহাতে আর ছবি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ভাবিও না যে, জড় পদার্থের আকৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে ; বরং ইহার কারণ এই যে, দর্পণের আর প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা নাই। এই প্রকার জীবাত্মাতে যতকাল শীতোষ্ণতার সাম্যভাব বিদ্যমান থাকে ততকাল উহা বোধশক্তি ও গতিশক্তি গ্রহণ করিতে পারে। যখন ঐ সাম্যভাব নষ্ট হয় তখন আর পারে না। জীবাত্মা এইরূপ অক্ষম হইয়া গেলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে ; সুতরাং সংজ্ঞাশূন্য ও গতিশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থা ঘটিলে লোকে বলে প্রাণীটি মরিয়া গিয়াছে। ইহাই মৃত্যুর অর্থ।

যে ব্যক্তি জীবাত্মার শীতোষ্ণতার সাম্যভাব বিনাশের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন। তাঁহাকে মালেকুল মওত বলে। লোকে তাঁহার নাম জানে, কিন্তু তাঁহার হাকীকত বুঝে না। ইহা বুঝাও নিতান্ত দুষ্কর। জীবের মৃত্যুর বিষয় উপরে বর্ণিত হইল। মানুষের মৃত্যু কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, সর্বসাধারণের জীবের যে আত্মা আছে, মানুষের মধ্যেও তাহা আছে। ইহা ছাড়া মানুষের আরও একটি আত্মা আছে ; ইহাকে মানবাত্মা বলে। উপরের কয়েক অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। মানবাত্মা জীবাত্মার সমজাতীয় নহে। জীবাত্মা সূক্ষ্ম বায়ু ও তেজ সদৃশ একটি শরীরী পদার্থ। কিন্তু মানবাত্মা শরীরী পদার্থ নহে ; কারণ, ইহা বিভক্ত হইতে পারে না। ইহাতে আল্লাহর মারিফাতের সমাবেশ হয়। আল্লাহ্ যেমন একক ও অবিভাজ্য তদ্রূপ তাঁহার মারিফাতও এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং অবিভাজ্য মারিফাত কখনই বিভাজ্য পদার্থে সমাবেশ হইতে পারে না। ইহা শুধু সমজাতীয় অবিভাজ্য পদার্থেই স্থান পাইতে পারে।

জীবাত্মা মানবাত্মার তুলনা ঃ প্রদীপের ন্যায় মানবের মধ্যেও শলিতা, আলোক-শিখা ও জ্যোতি এই তিন পদার্থ আছে বলিয়া মনে কর। দেহ শলিতাতুল্য, জীবাত্মা প্রদীপশিখা এবং মানবাত্মা জ্যোতি-সদৃশ। প্রদীপের জ্যোতি যেমন প্রদীপ অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম এবং প্রদীপকে জ্যোতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ মানবাত্মা ও জীবাত্মা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম এবং মানবাত্মাকে জীবাত্মার সহিত তুলনা করা যাইতে পরে না। কেবল সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে বিচার করিলে এ তুলনা ঠিক হইবে, কিন্তু অন্য কোন সম্বন্ধে বিচার করিলে ঠিক হইবে না। প্রদীপের জ্যোতি প্রদীপের অস্তিত্বের অধীন এবং জ্যোতির মূল প্রদীপ। যতক্ষণ প্রদীপ জ্বলিবে ততক্ষণ জ্যোতি থাকিবে ; প্রদীপ নিবিয়া গেলে জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু মানবাত্মা জীবাত্মার অধীন নহে ; বরং মানবাত্মা মুল এবং জীবাত্মা ধ্বংস হইলেই মানবাত্মা ধ্বংস হয় না। ইহার উপমা চাহিলে, মনে কর প্রদীপ অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম একটি জ্যোতি আছে এবং ইহাই প্রদীপের স্থিতির কারণ। ইহার স্থিতি প্রদীপের স্থিতির উপর নির্ভর করে না। তখন এই উপমাটি জীবাত্মা ও মানবাত্মার সম্পর্কের সহিত ঠিক হইবে। জীবাত্মাকে এক কারণে মানবাত্মার বাহন এবং অপর কারণে হাতিয়ার বলা চলে। জীবাত্মার সাম্যভাব নষ্ট হইলে শরীর মরিয়া যায় বটে কিন্তু মানবাত্মা তখনও স্থায়ী থাকে। তবে শরীর তখন বাহনবিহীন ও হাতিয়ার শূন্য হইয়া পড়ে। বাহন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আরোহীর অস্তিত্ব বিলীন হয় না ; আরোহী বাহনশূন্য হয় মাত্র। মানবাত্মাকে জীবাত্মারূপে হাতিয়ার এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা সে আল্লাহর মহব্বত ও তাঁহার মারিফাতরূপ শিকার ধরিয়া লইবে। শিকার ধরিয়া ফেলিলে হাতিয়ার সঙ্গে না থাকাই শিকারীর পক্ষে মঙ্গল ; কেননা সে তখন

হাতিয়ারের বোঝা বহনের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পায়। এই মর্মেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মৃত্যু মু'মিনের জন্য উৎকৃষ্ট উপহার ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন কোন শিকারী ফাঁদ, জাল ইত্যাদি লইয়া শিকারে বাহির হইল এবং এই সকলের বোঝাও তাহাকে বহন করিতে হইল। শিকার হস্তগত হইলে এই বোঝা তাহার উপর না থাকাই তাহার জন্য মঙ্গল। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন ; শিকার হস্তগত হইবার পূর্বে শিকারী অস্ত্রশূন্য হইলে তাহার মর্মবেদনা ও বিপদের সীমা থাকে না। কবর আযাবরূপে এই মনস্তাপ ও মর্মবেদনার প্রথম সূত্রপাত হয়।

দেহ মানবের আসল সত্তা নহে ঃ কাহারও হস্ত-পদ অবশ হইয়া গেলেও তাহার অস্তিত্ব অটুট থাকে ; কেননা সে হস্তও নহে, পদও নহে। বরং হস্তপদ তাহার হাতিয়ার মাত্র। লোকে হস্ত-পদ নিজ নিজ কার্যে ব্যবহার করে। হস্ত-পদ যেমন তোমার আসল সত্তা নহে তদ্রূপ উদর, পৃষ্ঠ এমনকি সমস্ত দেহও তোমার মূল সত্তা নহে। তেমাার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেলেও তোমার বর্তমান থাকা সম্ভব। সমস্ত দেহ অবশ হইয়া যাওয়াকেই মৃত্যু বলে। হস্ত অবশ হওয়ার অর্থ এই যে, ইহা আর তোমার আজ্ঞাধীন নাই অর্থাৎ ইহার উপর তোমার ক্ষমতা চলিতেছে না। হস্তে এমন একটি গুণ ছিল যাহাকে শক্তি বলে। এই শক্তি বলেই হস্ত তোমার খেদমত করিত। ঐ শক্তি জীবাত্মারূপ প্রদীপের জ্যোতি ছিল। ইহা হস্তে প্রবেশ করিয়া হস্তকে কর্মক্ষমতা প্রদান করিত। যে শিরা দিয়া জীবাত্মার প্রভাব হস্তে প্রবেশ করিত সেই শিরায় কোনরূপ বন্ধন পড়িয়া গেলে হস্তের শক্তি বিনষ্ট হয় এবং ইহা কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ জীবাত্মার প্রভাবে সমস্ত দেহ তোমার পরিচর্যা করে এবং তোমার আজ্ঞা মানিয়া চলে। জীবাত্মার সাম্যভাব নষ্ট হইলে দেহ তোমার আদেশ মানিয়া চলিতে পারে না, ইহাকেই মৃত্যু বলে। তোমার দেহ আজ্ঞাধীন না থাকিলেও অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় জীবিত না থাকিলেও তুমি স্বয়ং পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকিবে। এমতাবস্থায় দেহকে তোমার অস্তিত্বের মূল কিরূপে বলা যাইতে পারে? তুমি চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, শৈশবে তোমার যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল, তাহা এখন নাই। জীবনী-শক্তির প্রভাবে শৈশবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া গিয়াছে এবং তদস্থলে নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য নূতন নূতন উপাদান-সংযোগে নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করিয়া দিয়াছে। শৈশবের দেহ এখন নাই ; কিন্তু শৈশবে যেই তুমি ছিলে এখনও সেই তুমিই রহিয়া গিয়াছ। সুতরাং তোমার অস্তিত্ব দেহের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নহে। দেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও তুমি স্বয়ং এইরূপই জীবিত থাকিবে।

মানুষের নিত্য ও অনিত্য গুণ ঃ মানুষের মধ্যে দুই প্রকার গুণ আছে। শরীরের সহিত এক প্রকার গুণের সম্বন্ধ এবং শরীরের উপরই উহা নির্ভরশীল। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি। এ সমস্ত জড়দেহ ব্যতীত প্রকাশ পায় না এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। আর এক প্রকার গুণের শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; যেমন, আল্লাহর পরিচয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তাঁহার চিরস্থায়ী সৌন্দর্য দর্শনের অনুরাগ ও আনন্দ। এইগুলি মানুষের নিজস্ব গুণ এবং তাহার সহিত চিরকাল থাকিবে। এই সমস্তই চিরস্থায়ী সদগুণ। মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহর মারিফাতের পরিবর্তে তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকে তবে ইহাও মানুষের নিজস্ব গুণ এবং ইহাও তাহার সহিত চিরকাল থাকিবে। এই অজ্ঞতা হইল মানবাত্মার অন্ধত্ব এবং মানুষের দুর্ভাগ্যের বীজ। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকে সে পরকালেও অন্ধ থাকিবে এবং সে পথভ্রষ্ট।"

যতদিন তুমি মানুষের দুই প্রকার আত্মার মর্ম, ইহাদের পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিবে ততদিন তুমি মৃত্যুর অর্থ বুঝিতে পারিবে না।

মানবাত্মার দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য ঃ জীবাত্মা এই নিম্ন জগতের পদার্থ। কেননা, রক্ত, শ্লেষ্মা পিত্ত, বাত এই চারি ধাতুর মিশ্রণজনিত তেজের সাম্যভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু সেই চারি ধাতুর মূল। উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতার তারতম্যের কারণে ঐ সকল ধাতুর মধ্যে অনৈক্য ও আনুকূল্য দেখা দেয়। চিকিৎসাবিদ্যার উদ্দেশ্য হইল ঐ চতুর্বিধ ধাতু ও জীবাত্মার মধ্যে এমন সাম্যভাব রক্ষা করা যাহাতে জীবাত্মা মানবাত্মার বাহনের উপযোগী হইয়া উঠে। মানবাত্মা নিম্ন-জগতের পদার্থ নহে, বরং উর্ধ্ব-জগতের পদার্থ এবং ফেরেশতাগণের সমজাতীয়। মুসাফির-স্বরূপ সে এই নিম্ন-জগতে আসিয়াছে ; সে নিজ ইচ্ছায় আসে নাই। আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়েত পালন করত স্বীয় পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবার উদ্দেশ্য সে এ জগতে আগমন করিয়াছে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি বলিলাম, তোমরা সকল এখান (বেহেশত) হইতে নিচে (অর্থাৎ নিম্ন-জগতে) যাও। তৎপর তোমাদের নিকট আমার হইতে যখন হিদায়েত আসিবে তখন যাহারা আমার হিদায়েতের অনুবর্তী হইবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা অনুতাপ পাইবে না।" আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিব। তৎপর যখন তাহাকে সমভাবে ঠিক করিয়া দিব এবং তাহার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁৎকার করিয়া দিব-----।" এই বাক্যে দুইটি পৃথক আত্মার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তিনি একটির সহিত মাটির সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন এবং সমভাবে ইহাকে ঠিক করিয়া দেওয়ার বিষয় বলিয়াছেন। এই কথায় তিনি জীবাত্মার প্রকৃতিগত সমভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর অন্য আত্মার সন্ধান দিয়াছেন। 'তাহার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁৎকার করিয়া দিব' এই বাক্যে তিনি মানবাত্মার সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ এইরূপ---মনে কর, এক ব্যক্তি মিহিন ছিন্ন বস্ত্রে একটি মশাল প্রস্তুত করিয়া ইহাতে এমন উপকরণ সংযোগ করিয়া দিল যাহাতে ইহা অতি সহজে অগ্নি গ্রহণ করত প্রজ্বলিত হইতে পারে। তৎপর তাহা আগুনের নিকট লইয়া গিয়া ফুৎকার দেওয়ামাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

জীবাত্মা ও মানবাত্মার স্বাস্থ্য ঃ জীবাত্মা নিম্ন-জগতের বস্তু, ইহার একটি সাম্যভাবে আছে। চিকিৎসাবিদ্যা জীবাত্মার এই সামভাব রক্ষার উপায় বাহির করিয়া শরীর হইতে পীড়া দূর করত জীবাত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। মানবাত্মা উর্ধ্ব- জগতের বস্তু। ইহাই মানুষের মুল এবং ইহারও সাম্যভাব আছে। শরীয়ত হইতে প্রাপ্ত নীতিবিদ্যা ও রিয়াযত (চরিত্র সংশোধনে কঠোর সাধনা) এই সাম্যভাব রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখে। ইহাতেই মানবাত্মার স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। বিনাশন পুস্তক ও পরিত্রাণ পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

মানবাত্মার গুঢ় রহস্যবিশেষের বর্ণনা নিষিদ্ধ ঃ উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, নিজের পরিচয় না পাইলে যেমন আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় না তদ্রূপ মানুষের আত্মার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও পরকালের অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্য আত্মজ্ঞান যেমন আল্লাহর মারিফাতের কুঞ্জী সেইরূপ আত্মা বিষয়ক জ্ঞানও পরকাল-জ্ঞানের কুঞ্জী। আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস স্থাপন করা ধর্মের মূল। এইজন্যই আত্মদর্শনের কথা প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মা-দর্শনের মধ্যে মানবাত্মার গুণাবলীর একটি মূল দৃঢ় রহস্যের কথা এখনও বলা হয় নাই। ইহা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং বর্ণনা করিলেও ইহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। আবার আল্লাহর মারিফাত ও পরকালের পরিচয় ইহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং নিজে নিজে আত্মার এই গুঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য যথোপযুক্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা কর। কারণ, অন্যের নিকট হইতে এই গুঢ় রহস্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছে কিন্তু বিশ্বাস করে নাই এবং ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া অবিশ্বাস করত বলিয়াছে, ইহা সম্ভবই নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

তাহারা আল্লাহর পবিত্র গুণ বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছে, উহা অভাব ও নিষ্ক্রিয়তা-মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষের ঐরূপ গুণ আছে শুনিয়া তুমি কিভাবে বিশ্বাস করিবে? তদুপরি আল্লাহর ঐ গুণ সম্বন্ধে কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে কোন উল্লেখ নাই। এই জন্যই লোকে ইহা শুনিয়া অস্বীকার করে। আর এই কারণেই নবী (আ)-গণ বলেন ঃ

تَكَلَّمُوْا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ -

অর্থাৎ "লোকের সহিত তাহাদের বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে কথা বল।" কোন কোন নবী (আ)-র উপর ওহী নাযিল হইয়াছিল ঃ "আমার গুণাবলীর মধ্যে যাহা লোকে বুঝিতে পারিবে না তাহা তাহাদিগকে বলিও না। কারণ, তাহারা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া অস্বীকার করিবে এবং এই অস্বীকার তাহাদের জন্য ক্ষতিকর হইবে।"

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, জীবাত্মা মানবাত্মার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু মানবাত্মার অস্তিত্ব ও গুণ দেহের উপর নির্ভরশীল নহে। মৃত্যুর অর্থ মানবাত্মার ধ্বংস নহে ; বরং শরীরের উপর মানবাত্মার আধিপত্য লোপকেই মৃত্যু বলে।

পুনরুত্থান ঃ পুনরুত্থানের অর্থ এই নহে যে, ধ্বংস ও বিলোপের পর আত্মাকে পুনর্বার অস্তিত্বে আনয়ন করা হইবে। বরং ইহার অর্থ এই যে, আত্মাকে একটি শরীর প্রদান করা হইবে অর্থাৎ আর একবার শরীরকে আত্মার আজ্ঞাপালন করিবার জন্য গঠন করা হইবে। মৃত্যুর পর পুনরায় আত্মাকে শরীর দেওয়া আল্লাহর পক্ষে নিতান্ত সহজ ; কারণ, প্রথমবার আত্মা ও শরীর উভয়কেই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পর আত্মা স্থায়ী থাকে এবং শরীরের উপদানসমূহও নিজ নিজ স্থানে মৌজুদ থাকে। ইহাদিগকে একত্র করা নূতন সৃষ্টি অপেক্ষা অতি সহজ। আমাদের দৃষ্টির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ইহাকে সহজ বলা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর কার্য সম্বন্ধে সহজ বা কঠিনের কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যেখানে কঠিন কাজ আছে কেবল সেখানেই সহজ কাজের কথা উঠিতে পারে। (অথচ আল্লাহর পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নহে)। দ্বিতীয়বার জীবিত করিবার সময় প্রথম বারের শরীর প্রদান করা জরুরী নহে। কারণ, শরীর বাহনমাত্র। ঘোড়া পরিবর্তন হইলে আরোহীর কোন পরিবর্তন হয় না। শৈশব হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের উপাদান দ্বারা সর্বদাই বদলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মানবাত্মা সৃষ্টির সময়ে যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়।

পুনরুত্থানের সময় শরীর বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ ঃ যাঁহারা বলেন, পুনরুত্থানের সময় পূর্ব শরীর মিলিবে, তাঁহাদের কথার উপর অনেক প্রতিবাদ হইয়াছে। এই সকল প্রতিবাদের যে সমস্ত জওয়াব তাঁহারা দিয়াছেন উহা দুর্বল। যদি একজন অপরজনকে

ভক্ষণ করে এবং ভুক্ত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হজম হইয়া ভক্ষণকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যার তবে পুনরুত্থানের সময় ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাহাকে দেওয়া হইবে? আবার কাহারও শরীর হইতে যদি কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলা হয় এবং কাটিবার পর সে ব্যক্তি ইবাদত করে তবে ঐ ইবাদতের ফল ভোগ করিবার সময় ঐ কর্তিত অঙ্গ সেই ব্যক্তির শরীরে থাকিবে কি না? যদি না থাকে, তবে হস্ত-পদ চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গহীন লোক বেহেশতে থাকিবে। আর যদি ঐ কর্তিত অঙ্গ শরীরে থাকে তবে উহা পুণ্যকর্মের অংশী না হইয়া কিরূপে পুণ্যের ফল ভোগ করিবে? অনেকে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ করে এবং প্রতিপক্ষ বাহ্যাড়ম্বরে উহার উত্তর দিয়া থাকে। তুমি যখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার সময় প্রথম বারের শরীর পাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই তখন ঐরূপ বাজে প্রশ্নোত্তরেরও কোন প্রয়োজন নাই। উক্তরূপ প্রতিবাদের কারণ এই যে, তাহারা বুঝিয়াছে, শরীরের অস্তিত্বই তোমার অস্তিত্ব। অতএব, শরীরটি অবিকল না হইলে পূর্বে তুমি যেরূপ ছিলে তদ্রূপ হইতে পারিবে না। এই কারণেই তাহারা মুশকিলে পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ সকল প্রতিবাদের মূল নিতান্ত দুর্বল।

তুমি হয়ত বলিতে পার, আইনজ্ঞ ও তার্কিকগণের সর্বজনবিদিত অভিমত এই যে, মৃত্যুতে জীবন নষ্ট হয়, পরে ইহাকে তৈয়ার করিতে হয়। সুতরাং এ গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইল তাহা এই মতের বিপরীত। ইহার উত্তর শুনিয়া লও। যে ব্যক্তি অন্যের কথা শুনিয়া চলে সে অন্ধ। আর যে–ব্যক্তি মানবাত্মা ধ্বংস হয় বলিয়া বিশ্বাস করে, সে মুকাল্লিদ (অনুবর্তী–বিশ্বাসী) ও চক্ষুষ্মান, এই দুই-এর কোনটাই নহে। চক্ষুষ্মান হইলে সে নিজেই বুঝিত যে, শারীরিক মৃত্যু মানুষের আসল সত্তাকে ধ্বংস করে না। আর মুকাল্লিদ হইলে কুরআন ও হাদীস হইতে জানিত যে, মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরও আপন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

মৃত্যুর পরও মানবাত্মা অবিনশ্বর ঃ মৃত্যুর পর আত্মাসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণী দুর্ভাগা ব্যক্তিদের আত্মা এবং অপর শ্রেণী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের আত্মা। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের আত্মা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ـ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ “যাহারা আল্লাহর পথে শহীদ হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বলিয়া মনে করিও না ; বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিত আছে, জীবিকাও পাইতেছে ; আল্লাহ তাহার অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে যাহা দান করিতেছেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট।” বদর-যুদ্ধে নিহত দুর্ভাগা কাফিরদিগকে সম্বোধন করিয়া রাসূলে মাকবূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে অমুক, হে অমক ; আল্লাহ তাঁহার শত্রুদের প্রতি শাস্তি দানের যে অঙ্গীকার আমার সঙ্গে করিয়াছিলেন আমি তাহা সত্য দেখিতে পাইলাম। আর আল্লাহ তোমাদিগকে শাস্তি প্রদানে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর তোমরাও কি তাহা সত্য পাইয়াছ? ইহা শুনিয়া সাহাবা (রা)-গণ নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এ কাফিরগণ তো মরিয়া গিয়াছে ; আপনি কিরূপে তাহাদের সহিত কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন ঃ যে আল্লাহর হাতে মুহম্মদ-এর জীবন তাঁহার শপথ, তাহারা আমার কথা তোমাদের অপেক্ষা ভালরূপে শুনিতেছে ; কিন্তু উত্তর দিতে অক্ষম। কুরআন শরীফের যে সকল আয়াত ও যে সকল হাদীস মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে এবং সে-স্থলে উক্ত হইয়াছে যে মৃতগণ শোকাতুর ও কবর যিয়ারতকারীকে দেখিতে পায়, এমনকি ইহজগতে যাহা কিছু হইতেছে, সবই জানিতে পারে সেই সমুদয় চিন্তা করিলে আপনা-আপনিই জানা যায় এবং বিশ্বাস হয় যে, মৃত ব্যক্তির বিনাশ শরীয়তের কোথাও নাই। বরং ইহাই আছে যে, মৃত্যুতে মানুষের ভাব ও বাসস্থান-মাত্র বদলিয়া থাকে ; আর কবর কাহারও পক্ষে দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্তে পরিণত হয়, আবার কাহারও পক্ষে বেহেশতের মনোরম উদ্যান-সমূহের অন্যতম উদ্যান হইয়া পড়ে। সুতরাং নিশ্চয় বিশ্বাস কর, মৃত্যুতে তোমার নিজস্ব সত্তার বা তোমার আত্মিক ভাবের কোনই পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সে সকল ইন্দ্রিয়, চলন-শক্তি ও চিন্তা-শক্তির সম্বন্ধ উহা লোপ পাইবে এবং তুমি ইহজগত হইতে যেমন যাইবে পরলোকে তেমনিই থাকিবে।

এ কথাটিও বুঝিয়া লও যে, বাহনের অশ্ব মরিয়া গেলে আরোহীর স্বীয় স্বাভাবিক গুণের তারতম্য ঘটে না, অর্থাৎ আরোহী অজ্ঞান থাকিলে বাহনের মৃত্যুর পর সে জ্ঞানী হইয়া উঠে না এবং অন্ধ থাকিলে চক্ষুস্মান হয় না। তবে অশ্বের অভাবে আরোহী নিশ্চয়ই পদাতিক হইয়া পড়ে। শরীর অশ্বতুল্য বাহন এবং তুমি আরোহী।

দুনিয়াতে পরলোকের অবস্থা দর্শন ঃ উল্লিখিত কারণে যে ব্যক্তি নিজকে ও বাহ্য জড়জগতকে ভুলিয়া কেবল নিজের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং তাসাওউফের প্রারম্ভ মুরাকাবায় অর্থাৎ আল্লাহর চিন্তায় একেবারে ডুবিয়া থাকিতে পারেন, তিনি পরকালের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পান। কারণ, তদ্রূপ অবস্থায় জীবাত্মা যদিও শীত-গ্রীষ্মের সমভাব হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না তথাপি নিতান্ত দুর্বহ হইয়া পড়ে। অতএব তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও পরকালের ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় জীবাত্মা মানুষের আসল সত্তাকে নিজের দিকে লিপ্ত করিয়া রাখে না। এই সময় তাঁহার অবস্থা মৃত ব্যক্তির অবস্থার প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই মৃত্যুর পর লোকে যাহা জানিতে পারে তাহা এ দুনিয়াতেই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া

পড়ে। তৎপর ঐ অবস্থা হইতে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আবার জড়জগতে প্রবেশ করিলে যাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার কিছুই অনেকের মনে থাকে না। ইহার সামান্য প্রভাব মাত্র বিদ্যমান থাকে। তাঁহাকে ঐ সময়ে বেহেশতের অবস্থা দেখানো হইয়া থাকিলে তাঁহার মনে ইহার আনন্দ ও আরামটুকু থাকিয়া যায়। আর তাঁহাকে দোযখের অবস্থা দেখানো হইয়া থাকিলে ইহার ভীতি ও শাস্তি তাঁহার মনে রহিয়া যায়। দৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোন কিছু মনে থাকিলে ইহার সংবাদ অপরকে দিতে পারেন। স্মরণশক্তি দৃষ্টবস্তুকে কোন পরিচিত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া লইতে পারিলে উহা খুব স্মরণ থাকে এবং পরে ইহার সংবাদ অপরকে দেওয়া চলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একবার রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায পড়িবার সময় হস্ত বিচার করত বলিলেন ঃ "বেহেশতের আঙ্গুর-গুচ্ছ আমাকে দেখানো হইয়াছিল। আমি উহা এই জগতে আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।" ইহাতে মনে করিও না যে, যে পদার্থের সহিত আঙ্গুর-গুচ্ছের তুলনা করা হইয়াছিল তাহা এই জগতে আনিবার বস্তু। বরং উহা এই জগতে আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব ছিল। অসম্ভব না হইলে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লইয়া আসিতেন। অসম্ভব হওয়ার কারণ বুঝা দুষ্কর এবং ইহার অনুসন্ধান তোমার কোন প্রয়োজন নাই। এ ঘটনা বুঝিবার তারতম্যে আলিমগণের মর্তবায় শ্রেণীভেদ হইয়াছে ; যেমন কেহ এইমাত্র ভাবিয়াছে যে, বেহেশতের আঙ্গুরগুচ্ছ কি? ইহা কিরূপ ছিল যে, হযরত (সা)-এর নামাযে থাকিয়া হস্ত সঞ্চালন ঘটানকে অবলম্বন করিয়া শুধু এই কথা বলিল যে, হযরত (সা) হস্ত সঞ্চালন করিলেন। অতএব, নামাযে রতকালীন অল্প কাজ নামায নষ্ট করে না। তাহারা ঐ ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করত ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, পূর্ববর্তী সকল আলিম ঐ ঘটনা হইতে তাহাদের ন্যায় শুধু ইলমে জাহিরীই লাভ করিয়াছে। যাহারা এইরূপ বুঝিয়া পরিতুষ্ট রহিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে নাই তাহাদের জীবন বৃথা ও তাহারা শরীয়তে অবিশ্বাসী।

মি'রাজ ঃ এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে কেবল হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামের নিকট শুনিয়া বেহেশতের সংবাদ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; বরং তিনি স্বয়ং বেহেশতের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই সংবাদ দুনিয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন। দুনিয়াতে থাকিয়া কেহ বেহেশতের অবস্থা জানিতে পারে না সত্য ; কিন্তু রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি এ দুনিয়া অতিক্রমপূর্বক পরলোক পর্যন্ত পৌছিয়া ছিল। এই জন্যই তিনি উহা দেখিতে

পাইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থাকেও এক প্রকার মি'রাজ বলা চলে। এই শ্রেণীর মি'রাজ ঐ প্রকারে হইয়া থাকে। ১. জীবাত্মার মৃত্যু হইলে ও ২. জীবাত্মা একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িলে।

পরলোক দর্শনের ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র ঃ এ দুনিয়াতে কেহই বেহেশত দেখিতে পাইবে না। সাত আসমান ও যমীনকে যেমন একটি প্রস্তর ছিলকার ভিতরে পুরা অসম্ভব; তদ্রূপ বেহেশতের এক রেণুও সমস্ত দুনিয়াতে সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। আকাশ ও পৃথিবীর ছবি চক্ষে পড়িলে দর্শন-জ্ঞান জন্মিতে পারে বটে ; কিন্তু কান দ্বারা উহা দর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপ এ জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয় বেহেশতের একটি রেণু সম্বন্ধেও অবগত হইতে একবারে অক্ষম। পরকাল-দর্শনের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কবর-আযাব ঃ এখন কবর-আযাব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সময়। কবর আযাব দুই প্রকার–১. আত্মিক ও ২. শারীরিক। শারীরিক আযাব সকলেই বুঝে ; কিন্তু আত্মার আযাব সকলে বুঝে না। যিনি নিজকে চিনিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আত্মার স্থিতি শরীরের স্থিতির সাপেক্ষ নহে, তিনিই আত্মার আযাব বুঝিতে পারেন। মৃত্যু ঘটিলে মানুষ ধ্বংস পায় না, বরং বিদ্যমান থাকে। তখন তাহার নিকট হইতে হস্ত, পদ , চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় ফিরাইয়া লওয়া হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ ফিরাইয়া লইলে তদসঙ্গে স্ত্রী-পুত্র, ভূ-সম্পত্তি, দাস-দাসী, গো-মহিষ, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন এমনকি আসমান– যমীন এবং যাহা কিছু পার্থিব ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে তৎসমুদয়ই কাড়িয়া লওয়া হইবে। মানুষ যদি দুনিয়াতে এই সকল পদার্থের প্রতি আসক্ত থাকে এবং এই সমস্তের মধ্যেই নিজকে ডুবাইয়া রাখে তবে মৃত্যুর পর উহাদের বিচ্ছেদজনিত কষ্ট সে স্বভাবতই ভোগ করিবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত এবং এ জগতের কোন কিছুর প্রতিই আসক্ত নহে, তদুপরি সর্বদা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাকে সে মৃত্যুর পর সুখে শান্তিতে থাকিবে। আবার এই ব্যক্তি যদি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার স্মরণে অনুরক্ত হইতে পারেন, তাঁহার নিকট নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হইতে বীতশ্রদ্ধ ও পরান্মুখ হইতে পারেন তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবেন। কারণ তাঁহার সহিত মিলনের পথে দুনিয়ার যে–সকল বস্তু প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় মৃত্যুতে উহা বিদূরিত হয় এবং মানুষ চরম সৌভাগ্য লাভ করে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, লোকে যদি বুঝে যে, মৃত্যুর পরেও সে থাকিবে এবং ভালবাসার সকল বস্তু দুনিয়াতে পড়িয়া থাকিবে তবে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, মৃত্যুর পর প্রিয় পদার্থের বিচ্ছেদজনিত যাতনা ও শাস্তি তাহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই উপলক্ষেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

أَحْبِبْ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ -

অর্থাৎ "যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তুমি ভালবাস, কিন্তু তাহা হইতে তুমি নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইবে।"

যদি কেহ একমাত্র আল্লাহকে প্রিয়পাত্র জানিয়া সংসার হইতে কেবল পরিমিত পাথেয় সংগ্রহ করত অবশিষ্টগুলিকে শত্রুজ্ঞানে বর্জন করেন তবে অবশ্যই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, ইহলোক পরিত্যাগের পর সকল যাতনা হইতে মুক্তি পাইবে এবং পরম শান্তি লাভ করিবে।

উপরের কথাগুলি বুঝিলে কবর– আযাব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, উহা সত্য, কিন্তু পরহেজগারদের জন্য নহে, বরং দুনিয়াদারদের জন্য, যাহারা নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াতে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ কথাগুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে–

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ -

["দুনিয়া মু'মিনের কারাগার এবং কাফিরের বেহেশত"] এই হাদীসের মর্মও বুঝা যাইবে।

কবর-আযাবের তারতম্য ঃ দুনিয়ার মহব্বত যে কবর-আযাবের মূল ইহা জানিয়াছ। এখন জানিয়া রাখ যে, কবর–আযাবের তারতম্য হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে ইহা কাহারও উপর অধিক, আবার কাহারও উপর অল্প হইয়া থাকে। দুনিয়ার মহব্বত যাহার যত অধিক তাহার উপর আযাবও তত অধিক হইয়া থাকে। দুনিয়াতে যাহার ভূ-সম্পত্তি, দাস-দাসী, হস্তী, অশ্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং যে এই সকল বস্তুর প্রতি আসক্ত তাহার প্রতি যত কঠিন আযাব হইবে, যাহার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে মাত্র একটি বস্তু আছে এবং যে এইমাত্র ইহার প্রতিই আসক্ত তাহার তত কঠিন আযাব হইবে না। কোন ব্যক্তির একটি অশ্ব চোরে লইয়া গেলে তাহার যেরূপ দুঃখ হইবে, দশটি অশ্ব লইয়া গেলে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হইবে। কাহারও অর্ধেক ধন লোকে ছিনাইয়া লইলে তাহার যে পরিমাণে কষ্ট হয়, সমস্ত ধন লইয়া গেলে ইহার দ্বিগুণ কষ্ট হইয়া থাকে। আবার সেই ধনের সহিত যদি তাহার স্ত্রী -পুত্র কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করে, তাহার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় একাকী ছাড়িয়া যায় তবে তাহার দুঃখের কোন সীমা থাকে না। জীবনাবসানে মৃত্যুর কার্যও এইরূপ। মানুষ যে পরিমাণে দুনিয়াকে বর্জন বা মহব্বত করিবে এই সেই তাহার আরাম বা কষ্ট হইবে। যাহার প্রতি দুনিয়া যত প্রসন্ন হয় এবং সেও নিজেকে যে

পরিমাণে দুনিয়াতে ডুবাইয়া রাখে সেই পরিমাণেই সে দুনিয়াকে ভালবাসে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ "উহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে পরকাল অপেক্ষা অধিক "ভালবাসিয়াছিল।" আর তাহার প্রতি তত কঠিন শাস্তিই হইয়া থাকে। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার জন্য অধিক কষ্টময় জীবিকা রহিয়াছে।"

এই আয়াত নাযিল হইলে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা (রা)-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কোন অর্থে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে তোমরা জান কি?" তখন নিবেদন করিলেন ঃ "ইহার অর্থ আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল ভাল জানেন।" তখন তিনি বলিলেন ঃ "কবরে কাফিরকে শাস্তি দিবার জন্য নিরানব্বইটি অজগর নিযুক্ত করা হইবে। প্রত্যেকটি সর্পের নয়টি করিয়া মস্তক হইবে। ইহারা কাফিরকে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াইবে ও চাটিবে এবং তাহার উপর ফোঁসফোঁস করিতে থাকিবে।" চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ এই সর্পগুলিকে অন্তরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তদ্রূপ দর্শন-শক্তি হীন নির্বোধরা বলে ঃ "আমরা কাফিরের কবর দেখিয়া থাকি ; কিন্তু তথায় কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের তো বেশ দৃষ্টিশক্তি আছে ; সাপ থাকিলে আমরাও দেখিতে পাইতাম।" এই নির্বোধদের জানা উচিত, ঐ সাপ মৃত ব্যক্তির আত্মাতে আছে, বাহিরে নহে যে অপর লোকে দেখিতে পাইবে। বরং সেই সাপ মৃত্যুর পূর্ব হইতেই তাহার ভিতরে ছিল ; অথচ এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানিত না। ঐ নির্বোধদের আরও জানা উচিত যে, সেই সাপ কাফিরের স্বীয় কু-স্বভাব হইয়া জন্মে ; আর সেই সাপের মাথার সংখ্যা তাহার কুস্বভাবের শাখার সংখ্যার সমান হইয়া থাকে। দুনিয়ার মহব্বত হইতে সাপের উৎপত্তি এবং দুনিয়ার মহব্বত হইতে কাফিরের মধ্যে যতগুলি কুস্বভাব জন্মে সাপের ততগুলি মাথাই হইয়া থাকে। কু-স্বভাব অনেক, যেমন-হিংসা, শত্রুতা, রিয়া, অহংকার, লোভ, প্রবঞ্চনা, সম্মান ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা। ঐ সাপের উৎপত্তির কারণ এবং ইহার মস্তকের বহুলতা দর্শন- শক্তির জ্যোতিতে দেখা যায়। নবুয়তের জ্যোতিতে ইহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। সর্পের ফণার সংখ্যা কুস্বভাবের সংখ্যার সমান। কাহার মধ্যে কতগুলি কুস্বভাব

আছে, তাহা আমরা জানি না। সুতরাং ঐ সর্প কাফিরের হৃদয়ে গুপ্তভাবে বাস করে, আল্লাহ ও রাসূলকে চিনে না বলিয়া যে তাহাদের হৃদয়ে সাপের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নহে, বরং তাহারা নিজদিগকে দুনিয়াতে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ "উহা এইজন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে পরকাল অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিল।" আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ এবং দুনিয়াতে উহা ভোগ করিয়াছ।"

কাফিরদের হৃদয়ে সর্প না থাকিয়া দংশন যন্ত্রণা অবশ্য কিছু সহজ হইত। কারণ বাহিরে থাকিলে কোন সময় অন্তত এক মুহূর্তের জন্য সর্প দংশন হইতে বিরত থাকিত।

আত্মাতে ভাবরূপে সর্প মিশ্রিত থাকায় কাফির উহার দংশন-যন্ত্রণা হইতে কিরূপে পালাইয়া বাঁচিতে পারে? মনে কর কাহারও একটি সুন্দরী দাসী ছিল। কিছু দিন পর দাসীকে বিক্রয় করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, ঐ দাসীর প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল এবং তখন এই ভালবাসা প্রবল হইয়া উঠিল। বিক্রয়ের পর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাহাকে সর্পবৎ দংশন করিতে লাগিল। ভালবাসা পূর্ব হইতেই তাহার হৃদয়ে সর্পবৎ গুপ্তভাবে ছিল। একত্র থাকাকালে সেই ভালবাসার বিন্দু-বিসর্গ সে অনুভব করিতে পারে নাই। বিচ্ছেদের পর সেই গুপ্ত ভালবাসা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়া তাহার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। এই প্রকার নিরানব্বইটি সর্প ঐ কাফিরের হৃদয়ে মৃত্যুর পূর্ব হইতেই গুপ্তভাবে ছিল। অথচ ইহার বিন্দু-বিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। প্রেয়সীর সহিত অবস্থানকালে ঐ ভালবাসা যে পরিমাণে সুখকর থাকে, বিচ্ছেদের পর ইহা সেই পরিমাণে যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আসক্তি ও ভালবাসা না থাকিলে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইত না। এইরূপ দুনিয়ার মায়া ও আসক্তি দুনিয়াতে সুখের কারণ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর উহার আবার যন্ত্রণার মূল কারণ হইয়া থাকে। ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি অজগর সর্প তুল্য। ধনাসক্তি সর্প সদৃশ। ঘর-বাড়ির প্রতি আসক্তি বিচ্ছুর ন্যায়। পার্থিব অন্য বিষয়াদির অবস্থাও এইরূপ বুঝিয়া লইবে। রূপবতী রমণীর প্রতি প্রেমাসক্তি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যেমন পানিতে ডুবিয়া আগুনে পুড়িয়া অথবা সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুবরণ করত সেই তীব্র

বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছে করে, সেইরূপ যাহার উপর কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা করে ; বাহিরের সাপ শরীরের বাহিরে থাকিয়া বাহ্য অঙ্গে দংশন করে ; কিন্তু ঐ অজগর আত্মার ভিতরে থাকিয়া মর্মস্থল ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে। অথচ এ অজগরকে প্রকাশ্য চক্ষে কেহই দেখিতে পায় না।

উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেকেই কবর-আযাবের উপাদান দুনিয়া হইতে সঙ্গে লইয়া যায় এবং উহা তাহার হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকে এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ -

অর্থাৎ "একমাত্র তোমাদের কৃতকর্মসমূহই তোমাদের প্রতি ফিরাইয়া আনা হইবে।" আর এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلاَّ لَوْ تَعْمَلُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ - ثُمَّ - لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ -

অর্থাৎ "তোমাদের যদি বিশ্বস্ত জ্ঞানে জানিতে তবে তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখিতে পাইতে। অনন্তর তোমরা এমন দেখাই দেখিবে যে, তোমাদের চক্ষুর বিশ্বাস জন্মিবে।" আল্লাহ্ এ সম্বন্ধে বলেন ঃ

اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ -

অর্থাৎ "দোযখ কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং উহা তাহাদের সঙ্গেই আছে।" 'দোযখ কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া লইবে' এই কথা আল্লাহ্ বলেন নাই।

কবরে সর্প দংশনের অর্থ ঃ তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার, শরীয়তের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, ঐ সকল অজগরকে এই চর্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু যে সকল অজগর আত্মা দংশন করে, তাহা দেখা যায় না। ইহার উত্তর শুন, ঐ অজগরদিগকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব ; কিন্তু মৃতগণই দেখিতে পায় ; দুনিয়াতে চক্ষু দ্বারা কেহই দেখিতে পারে না। মৃতব্যক্তি জীবিতাকারে সর্পকে যে আকারে দেখিয়াছিল, মৃত্যুর পর সর্পগুলি তাহার নিকট ঐ আকারেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তোমরা উহা দেখিতে পাইবে না ; যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি অনেক সময় স্বপ্নে দেখে যে তাহাকে সাপে দংশন করিতেছে, অথচ তাহার নিকট উপবিষ্ট জাগ্রত ব্যক্তি সেই সাপ দেখিতে পায় না। স্বপ্ন দর্শকের নিকট সাপ বর্তমান এবং ইহার দংশনজনিত যন্ত্রণাও সে ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তি সাপের কিছুই দেখিতে পায় না।

আর জাগ্রত ব্যক্তি দেখিতে পায় না বলিয়া স্বপ্নদর্শকের দংশন-যন্ত্রণা কম হয় না। কোন ব্যক্তি নিজকে স্বপ্নে সর্পদষ্ট দেখিলে ইহার অর্থ এই যে, কোন শত্রু তাহার উপর জয়ী হইবে শত্রুর আঘাতই সাপের দংশন। স্বপ্নাবস্থায় সাপের দংশন–যন্ত্রণা আত্মিক ; কারণ ইহা আত্মাতে প্রকাশ পায়। যদি সেই স্বপ্নদর্শকের উপর তাহার শত্রু প্রবল হইয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে তবে সে ব্যক্তি আপন স্বপ্নের অর্থ সফল দেখিয়া বলে ঃ "এরূপ যন্ত্রণা অপেক্ষা সর্প-দংশন যন্ত্রণা আমার পক্ষে ভাল ছিল। আহা! এই শত্রু যদি আমার উপর জয়ী না হইত।" কারণ, সর্পদংশনের যন্ত্রণা শরীরের উপর, আর শত্রুর দৌরাত্ম্যের যন্ত্রণা মনের উপর। এই জন্যই শত্রুর যন্ত্রণা দুঃসহ।

এখন যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট সর্পের অস্তিত্ব নাই ; স্বপ্নদর্শকের উপর যে অবস্থা ঘটে তাহা অলীক খেয়াল মাত্র তবে জানিয়া রাখ, তুমি বড় ভ্রমে পড়িয়াছ। ঐ সাপ আছে, কেননা যাহা আছে তাহাই পাওয়া যায় এবং যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা পাওয়া যায় না। যাহা তুমি স্বপ্নে পাইয়াছ ও দেখিয়াছ তাহা অপর কেহই দেখিতে না পাইলেও উহা তোমার জন্য নিশ্চয়ই আছে। যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না তাহা দুনিয়ার সমস্ত লোকে দেখিতে পাইলেও উহা তোমার পক্ষে নাই। মৃত ও নিদ্রিত ব্যক্তি যখন শাস্তি এবং শাস্তির উপকরণ উভয়ই পাইতেছে তখন লোকে না দেখিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

স্বপ্নদর্শক ও মৃত ব্যক্তির প্রভেদ ঃ মৃত ব্যক্তি ও নিদ্রিত ব্যক্তির শাস্তির প্রভেদ এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠে এবং শাস্তি হইতে মুক্তি পায়। সুতরাং লোকে বলে, উহা অলীক খেয়াল মাত্র ছিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তির শাস্তির ও যন্ত্রণার বিরাম নাই, সে উহাতে সর্বদা নিপতিত থাকে। কারণ, নিদ্রার সীমা আছে ; কিন্তু মৃত্যুর সীমা নাই। এইজন্য যন্ত্রণা মৃত ব্যক্তির সঙ্গেই থাকে। জড়জগতের পদার্থ যেমন জীবিত লোকের নিকট সুস্পষ্ট, মৃত ব্যক্তির নিকট শাস্তির উপকরণও তদ্রূপ সুস্পষ্ট। কবরের সাপ, বিচ্ছু ও অজগর সাধারণ লোকে এই দুনিয়াতে থাকিয়া চর্মচক্ষে দেখিতে পাইবে, এমন কথা শরীয়তে নাই। কিন্তু কেহ যদি এই দুনিয়া হইতে কিছু দূরবর্তী হয় অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত হয় এবং সেই সময় তাহাকে মৃতদের অবস্থা দেখানো হয় তবে সে তাহাদিগকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করিতেছে দেখিতে পাইবে। আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ জাগ্রত অবস্থায় উহা দেখিতে পান। কারণ, অপর লোকে স্বপ্নে যাহা দেখে তাঁহারা জাগ্রতাবস্থায় তাহা দেখিতে পান। কেননা জড়জগতের পদার্থ পরকালের অবস্থাদর্শনে তাঁহাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধক নহে। এই বিস্তৃত আলোচনার কারণ এই যে, দুনিয়াতে একদল নির্বোধ লোক আছে তাহারা কবরে সর্পাদি কিছুই দেখিতে না পাইয়া কবর-আযাবকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসে। পরকালের অবস্থা জানে না বলিয়াই তাহারা কবর– আযাব অস্বীকার করিয়া থাকে।

দুই শ্রেণীর লোক কবর-আযাব হইতে মুক্ত ঃ এখন তুমি হয়ত বলিতে পার, সংসারাসক্তি যখন কবর-আযাবের কারণ তখন ইহা হইতে কেই মুক্তি পাইবে না। কেননা দুনিয়াতে সকলেই স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও ধনৈশ্বর্যকে ভালবাসে। সুতরাং সকলকেই কবর-আযাব ভোগ করিতে হইবে, কেহই তাহা হইতে রক্ষা পাইবে না। ইহার উত্তর এই যে, তোমার কথা ঠিক নহে। কারণ, দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা পার্থিব বস্তু উপভোগ করত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং দুনিয়ার কোন বস্তুই এখন তাহাদিগকে আনন্দ ও শান্তি দান করিতে পারে না। তাঁহারা সর্বদা মৃত্যুর প্রতিক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক এই কারণে সংসার বিরাগী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কবর-আযাব হইবে না।

ধনবানগণের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা দুনিয়ার ভোগ বস্তুকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু তদসঙ্গে আল্লাহকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এই শ্রেণীর লোকেরও কবর–আযাব হইবে না। দৃষ্টান্ত এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তির শহরে একটি বাড়ি আছে এবং তিনি ইহাকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু তিনি প্রভুত্ব, রাজত্ব এবং উপবন– সুশোভিত রাজপ্রাসাদ তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই দেশের রাজধানীতে সুশোভিত রাজপ্রাসাদে বাস করিবার সুযোগ লাভ করেন তবে পূর্বের গৃহ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার কিছুই কষ্ট হয় না। কারণ রাজত্ব ও রাজ-প্রাসাদের প্রবল আসক্তির প্রভাবে তাঁহার পূর্ব শহর ও গৃহের আসক্তি অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে পূর্ব গৃহের আসক্তি একেবারে বিলীন হইয়া যায়। আম্বিয়া, আওলিয়া, আল্লাহভীরু মুসলমানগণের মন স্ত্রী-পুত্র, বাসস্থান ইত্যাদির প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট থাকিলে আল্লাহর প্রতি তাঁহাদের মনে যে স্বাভাবিক প্রবল মহব্বত থাকে এবং ইহার আনন্দ যখন তাঁহারা অনুভব করন তখন অন্য সকল আসক্তি ইহার সম্মুখে একেবারে বিলীন হইয়া যায়। আর মৃত্যুতে তাঁহারা এই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহাদের কবর-আযাব হয় না।

কবর-আযাবের উপযোগী ব্যক্তি ঃ ধনবানগণের অপর শ্রেণীর লোকে দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুকে অত্যধিক ভালবাসে। তাহারা কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। দুনিয়াতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক। এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ـ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ـ

অর্থাৎ “তোমাদের প্রত্যেককেই দোযখের উপর দিয়া গমন করিতে হইবে। ইহা তোমাদের প্রভুর অবশ্য করণীয় বলিয়া তিনি নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন। তিনি

নিশ্চয়ই ইহা আদায় করিবেন।” অনন্তর যাহারা পরহিযগারী করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি মুক্তি দিবেন। এই শ্রেণীর লোক দুনিয়ার মহব্বতের তারতম্যানুসারে মৃত্যুর পর কিছু কম বা বেশি শাস্তি ভোগ করিবে। তৎপর দীর্ঘকাল গত হইলে দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুর আস্বাদের আনন্দ ক্রমশ ভুলিয়া গেলে আল্লাহ্‌র মহব্বত যাহা তাহাদের হৃদয় পূর্ব হইতেই গুপ্তভাবে ছিল প্রবল হইয়া উঠিবে। তখন তাহারাও শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি একটি বাড়িকে অপর বাড়ি অপেক্ষা অধিক ভালবাসে অথবা এক শহরকে অন্য শহর অপেক্ষা বা এক রমণীকে অপর রমণী অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। যে বাড়ি, শহর বা রমণীকে সে অধিক ভালবাসে তাহা হইতে দূরে সরাইয়া যাহাকে সে কম ভালবাসে তাহার নিকট তাহাকে রাখিয়া দিলে উক্ত প্রিয়তম বস্তুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাহাকে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয়। পরিশেষে যখন সে ঐ প্রেমাস্পদকে একেবারে ভুলিয়া যায় তখন শেষোক্ত অল্প প্রিয়ের প্রতি তাহার ভালবাসা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে।

অবিরাম শাস্তির উপযোগী ব্যক্তি ঃ যাহাদের হৃদয়ে লেশমাত্রও আল্লাহ্‌র মহব্বত নাই তাহারা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে। কারণ, তাহাদের হৃদয় কেবল দুনিয়ার মহব্বতেই পরিপূর্ণ। মৃত্যুতে সেই প্রিয়তম দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে সে কিরূপে অব্যাহতি পাইবে? কাফিরগণ যে সর্বদা অবিরাম শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের পরীক্ষা ঃ দুনিয়ার সকল লোকের মুখে এ দাবি শুনা যায়– 'আমি একমাত্র আল্লাহ্‌কে দুনিয়া অপেক্ষা অধিক ভালবাসি।' তাহাদের এই দাবির পরীক্ষার জন্য একটি কষ্টিপাথর আছে। তাহা এই–কাহারও প্রবৃত্তি যখন তাঁহাকে কোন কাজের আদেশ করে কিন্তু এই আদেশ আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে হয় তখন তাঁহার মন যদি আল্লাহ্‌র আদেশের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হয় তবে বুঝা যাইবে যে, সে আল্লাহ্‌কে অধিক ভালবাসে। মনে কর, এক ব্যক্তি দুইজনকে ভালবাসে ; একজনকে বেশি, আর একজনকে কম। এই দুইজনের মধ্যে বিবাদ বাধিলে কাহাকে সে বেশি ভালবাসে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে যাহার পক্ষ অবলম্বন কর তাহাকে বেশি ভালবাসে। পক্ষ অবলম্বন না করিয়া কেবল মুখে ভালবাসি বলিলে কি লাভ? বস্তুত এইরূপ দাবি মিথ্যা। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “যাহারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমা পাঠ করে তাহারা যদি দুনিয়ার কার্য অপেক্ষা ধর্মের কার্যকে অধিক ভালবাসে তবে তাহারা আল্লাহ্‌র আযাব হইতে নিজদিগকে রক্ষা করে। কিন্তু যাহারা ইহার বিপরীত করে অর্থাৎ দুনিয়ার কাজকে দীনের কাজ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ “তোমাদের মিথ্যা বলিতেছ।” কারণ, দুনিয়াকে অধিক ভালবাসিয়া ইহার সহিত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা মিথ্যা।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছ যে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহা প্রকৃত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি জানিতে পারেন। তাঁহারা আরও জানেন যে, বহু লোক এই আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। কিন্তু সংসারাসক্তির যেমন তারতম্য আছে–কাহারও অধিক, আবার কাহারও অল্প–তদ্রূপ এ আযাবের কাঠিন্য এবং সময়ের পরিমাণের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে।

সংসারাসক্তির পরীক্ষা ঃ তুমি হয়ত বলিবে, কোন কোন নির্বোধ লোকে বলে, ইহাই যদি কবর-আযাব হয় তবে এজন্য আমরা মোটেও ভয় করি না। কারণ, সংসারের সহিত আমাদের কোনো সম্বন্ধই নাই। সংসার থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। নিজেদের পরীক্ষা না করিয়া এরূপ কথা বলা নিতান্ত অবাস্তব ও মূর্খতার পরিচায়ক বটে। যদি কাহারও যথাসর্বস্ব অপহৃত হয়, মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয় ও ইহা তাহার প্রতিবেশী লাভ করে এবং মুরিদগণ তাহাকে পরিত্যাগ করত তাহার মনে কিছুমাত্র বিকার ও দুঃখ না জন্মে ; আর সে এমন নির্বিকার থাকে যেমন অপর কাহারও মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার কোন ক্ষতিই হয় নাই তবে তাহার উক্তরূপ দাবি সত্য। 'দুনিয়া থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই' এ কথা বলা কেবল তখনই তাহার পক্ষে শোভা পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সমস্ত ধন অপহৃত না হয় এবং তাহার মুরিদগণ তাহাকে বর্জন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত প্রকার দাবি করার গুণ তাহার মধ্যে আছে কিনা, এ-বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই পরীক্ষার্থী প্রথম নিজ ধন– সম্পত্তি দূর করিয়া ও সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যদি দেখিতে পায় যে, তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দুঃখ জন্মে নাই তখন তাহার ঐ গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিবে। কারণ, অনেক বলিয়া থাকে স্ত্রী ও দাস-দাসীর সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই, কিন্তু যখন সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বা দাসীকে বিক্রয় করিয়া ফেলে তখন তাহার মনের গুপ্ত ভালবাসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় সে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে।

কবর-আযাব হইতে অব্যাহতির উপায় ঃ যে ব্যক্তি কবর-আযাব হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছা করে তাহার কর্তব্য, সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু আবশ্যক পরিমাণে ব্যবহারে রাখিয়া অতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থ পরিত্যাগ করা। পায়খানায় যাওয়া আবশ্যক হইলেও তথায় বসিয়া থাকা কেহই পছন্দ করে না ; বরং কাজ সারিয়া শীঘ্র তথা হইতে বাহির হইয়া যাইতে ইচ্ছে করে। লোকে যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল পেট খালি করিবার জন্য পায়খানায় যায় তদ্রূপ নির্লোভ হইয়া কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আহার গ্রহণ করা উচিত। কারণ, এ দুইটি কাজই শুধু প্রয়োজনের তাগিদে করিতে হয়। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ এইরূপ প্রয়োজনের তাগিদে করা আবশ্যক। মানুষ যদি স্বীয় মনকে দুনিয়ার সম্বন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত করিতে না

পারে তবে অন্তত হৃদয়ে আল্লাহর ইবাদত ও যিকিরের প্রতি প্রবল আসক্তি উৎপাদন করা কর্তব্য এবং সর্বদা ইহাতেই লিপ্ত থাকা আবশ্যক। হৃদয় আল্লাহর ধ্যান-ধারণা এমন প্রবল করিয়া তোলা উচিত যাহাতে তাঁহার প্রতি মহব্বত দুনিয়ার সকল মহব্বতকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। ঐরূপ করিতে পারিলেও অহরহ স্বীয় প্রবৃত্তির গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং সর্বদা নিজের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা মানুষের কর্তব্য। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কার্যে সে ব্যক্তি শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী চলে এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনার উপর আল্লাহর আদেশ প্রবল করিয়া মানিতে সক্ষম তবে কবর–আযাব হইতে অব্যাহতি লাভের আশা থাকবে। পরীক্ষায় নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহর আদেশের বশীভূত না পাইলে কবর- আযাব অবধারিত জানিবে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ ক্ষমা করিলে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

আত্মিক দোযখ ঃ এখন আত্মিক দোযখের ব্যাখ্যা করিব। যে দোযখ-যন্ত্রণা আত্মার জন্যই নির্ধারিত, যাহা শরীর মোটেই ভোগ করিবে না ; তাহাকেই আমরা আত্মিক দোযখ বলিলাম। এই সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ যাহা প্রজ্বলিত করা হইয়াছে ; যাহা অন্তরসমূহ পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিবে ইহাই আত্মার দোযখ ; ইহাই আত্মাকে বেষ্টন করিয়া লইবে। আর যে অগ্নি শরীর দগ্ধ করে তাহাকে শারীরিক দোযখ বলা হয়। এখন জানিয়া রাখ, আত্মিক দোযখে তিন প্রকার অগ্নি থাকে। প্রথম, দুনিয়ার লোভনীয় বস্তু হইতে বিচ্ছেদজনিত অগ্নি। দ্বিতীয়, অপমান প্রসূত লজ্জাজনিত অগ্নি। তৃতীয়, আল্লাহর চিরস্থায়ী অনুপম সৌন্দর্য দর্শনে বর্শিত ও নিরাশ হওয়ার ক্ষোভাগ্নি। এই ত্রিবিধ অগ্নি মানবের প্রাণের প্রাণ আত্মাকে দগ্ধ করে– দেহের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই তিন প্রকার অগ্নির মূল কারণ দুনিয়া হইতেই লোকে সঙ্গে লইয়া যায়। ইহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এ জগত হইতে একটি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিলে ইহার অর্থ ভালরূপে বুঝা যাইবে।

পার্থিব বস্তুর বিচ্ছেদজনিত অগ্নি ঃ ইহার মূল কারণ কবর আযাবের বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে। মানুষ যতক্ষণ আপন প্রিয়তমের সহিত অবস্থান করে এবং তাহার প্রেমে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে ততক্ষণ ইহাই তাহার পক্ষে আত্মিক বেহেশত আর বিচ্ছেদই দোযখ। এইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যতকাল সংসারে থাকে ততকাল ইহাই তাহার বেহেশত। এই জন্যই হাদীসে আছে ঃ "দুনিয়া কাফিরদের বেহেশত।" দুনিয়া ছাড়িয়া পরকালে যাওয়া তাহাদের পক্ষে দোযখ। কারণ, তখন তাহাদের প্রিয়তম দুনিয়াকে ছিনাইয়া লওয়া হইবে। সুতরাং একই বস্তু অবস্থার পার্থক্যে কখনও সুখের কারণ হয়, আবার কখনও যন্ত্রণার মূল হইয়া থাকে।

দুনিয়াতে এই অগ্নির দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এমন এক বাদশাহ আছেন যাহার আজ্ঞাধীনে সমস্ত বিশ্ব পরিচালিত হয়। পরম রূপবতী রমণীগণের সহবাসে তিনি সর্বদা পরিতৃপ্ত আছেন, অগণিত দাস-দাসী তাঁহার সেবা করিয়া থাকে এবং যাবতীয় পার্থিব ভোগ-সুখে তিনি সর্বদা লিপ্ত থাকেন, আর পরম রমণীয় কানন– সুশোভিত রাজপ্রাসাদে তিনি অবস্থান করেন। অকস্মাৎ যদি কোন শত্রু আসিয়া বাদশাহকে বন্দী করত গোলাম বানায়, তাঁহার প্রজাদের সম্মুখে তাঁহাকে কুকুরের সেবায় বা অন্য নীচ কার্যে নিযুক্ত করে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার রমণীদিগকে নিজের উপভোগে নিযুক্ত করে এবং তাঁহার দাসদিগের কামনায় সমর্পণ করে এবং তাঁহার ধনাগারের মূল্যবান ধনরাশি তাঁহার শত্রুদের মধ্যে বিতরণ করে, তবে অনুধাবন কর, সেই বাদশাহের হৃদয় কেমন ভীষণ দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে। রাজত্ব, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী ইত্যাদির বিচ্ছেদাগ্নি কিরূপ ভীষণভাবে তাঁহার মন–প্রাণকে দগ্ধ করিতে থাকিবে! এই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি বলিতে থাকিবেন, আহা! লোকে যদি হঠাৎ এক আঘাতে আমাকে মারিয়া ফেলিত অথবা আমার শরীরে এমন কঠিন শাস্তি প্রদান করিত যাহাতে আমি এরূপ ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা, এক প্রকার অগ্নি।

পার্থিব ধন-সম্পদ যত অধিক হইবে এবং রাজত্ব যত হইবে, বিচ্ছেদানলও ততই কঠিন ও তীব্র হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে পরিমাণে সুখভোগ করিবে ও যে পরিমাণে সফলকাম হইবে, দুনিয়ার প্রতি তাহার আসক্তি সেই পরিমাণে প্রবল হইয়া উঠিবে এবং তাহার বিচ্ছেদানলও সেই পরিমাণে কঠিন ও তীব্র হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অগ্নির তীব্রতা বুঝাইয়া দেওয়া এ সংসারে অসম্ভব ; কারণ, দুনিয়াতে মানসিক যন্ত্রণা পূর্ণভাবে স্থায়ী থাকে না ; এই জন্যই পীড়িত ব্যক্তি যখন স্বীয় চক্ষুকর্ণ কোন বিষয়ে ব্যাপৃত রাখে তখন তাহার পীড়ার যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যায়। তৎপর সেই ব্যাপৃতি ছুটিয়া গেলে পীড়ার যন্ত্রণা আবার প্রবল হইয়া উঠে। এই একই কারণে বিপদগ্রস্ত লোক নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে তাহার হৃদয়ে যন্ত্রণা পূর্ব হইতে অত্যধিক হইয়া থাকে। ইহা এইজন্যই হয় যে, নিদ্রা মানব-হৃদয়কে পার্থিব কার্য-ব্যাপৃতির পঙ্কিলতা ও ইন্দ্রিয়ের পূর্বসঞ্চিত খেয়াল হইতে পরিষ্কার করে। পুনর্বার জড়-জগতের দিকে মন ব্যাপৃত হইবার পূর্বে ঐ পরিষ্কার মনে যাহা পড়ে তাহার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ামাত্র খোশ আওয়াজ শুনিলে খুব সুন্দর লাগে। জড়-জগতের প্রভাব হইতে মন মুক্ত হওয়ার কারণেই মনের উপর উক্ত প্রভাবের তীব্রতা ঘটিয়া থাকে। এ জগতে জড়বস্তুর প্রভাব হইতে মন একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। মৃত্যু ঘটিলে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তখন হৃদয়ে অপরিসীম শান্তি বা যন্ত্রণা স্থায়ী হয়। দোযখের অগ্নিকে দুনিয়ার অগ্নিতুল্য মনে করিও না। বরং দোযখের অগ্নিকে সত্তর বার পানিতে ধৌত করিয়া দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে।

অপমানপ্রসূত লজ্জাজনিত অগ্নি ঃ ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এক বাদশাহ এক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান দান করত স্বীয় রাজ্যে আপন প্রতিনিধি বানাইলেন– শাহী অন্তঃপুরেও তাহাকে যাতায়াতের অনুমতি দিলেন যেন কেহই তাহার নিকট পর্দার অন্তরালে না থাকে, ধনাগারের সমস্ত ক্ষমতা তাহার উপর ছাড়িয়া দিলেন এবং সকল কার্যের ভার দিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। এরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়া সে ব্যক্তি প্রকাশ্যে বাদশাহের আনুগত্য দেখাইতে লাগিল বটে, কিন্তু মনেপ্রাণে তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিল। ধনাগারের ধন আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল, শাহী অন্তঃপুরেও অসদাচরণ ও গোলযোগ করিতে লাগিল ; অথচ প্রকাশ্যে বাদশাহের নিকট আপন সততা ও বিশ্বস্ততা দেখাইতেছিল। অন্তঃপুরে অপকর্ম করিবার কালে সে একদিন দেখিল যে, বাদশাহ কোন ছিদ্র দিয়া তাহাকে দেখিতেছেন এবং ভাবিল যে, তাহার ঐরূপ দুষ্কর্ম বাদশাহ সর্বদাই দেখিতেছেন ; কিন্তু তাহার দুষ্কর্ম আরও বৃদ্ধি পাইলে একদিন হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া কঠিন দণ্ড দানে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন, এইজন্যই তিনি উহা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। এখন ভাবিয়া দেখ, সেই সময় তাহার মনে কেমন অপমান ও লজ্জার অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তখন সে কি দৈহিক শান্তি পাবে? বরং সেই সময় ভয় ও লজ্জার ভীষণ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সে ভূগর্ভে লুকাইবার ইচ্ছা করিবে।

তুমিও দুনিয়াতে অভ্যাসবশত সেইরূপ কত কার্য করিতেছ যাহা ভাল বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু ইহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা নিতান্ত কদর্য ও ঘৃণিত। কিয়ামত-দিবস যখন এই সকল কার্যের প্রকৃত রূপ তোমার নিকট প্রকাশ পাইবে তখন তুমি লজ্জা ও অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকিবে। মনে কর, তুমি অদ্য অগোচরে পরনিন্দা (গীবত) করিলে। পরকালে তুমি দেখিতে পাইবে যেন তুমি সুপক্ক মোরগ-গোশত ভ্রমে স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করিতেছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিবে যে, তুমি তোমার মৃত ভ্রাতার পঁচা গোশত ভক্ষণ করিতেছ, ভাবিয়া দেখ, তখন তুমি কিরূপ লজ্জিত হইবে এবং কিরূপ তীব্র দাবানল তোমার হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিবে। ইহাই গীবতের প্রকৃত অবস্থা। এখন গীবতের প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট গুপ্ত আছে বটে, কিন্তু পরকালে ইহা স্বীয় আকারে প্রকাশ পাইবে। এজন্য স্বপ্নে কেহ মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করিলে ইহার অর্থ এই যে, সে গীবত করে। তুমি যদি প্রাচীরে প্রস্তর নিক্ষেপ কর, আর কেহ সংবাদ দেয় যে, সেই প্রস্তরে তোমার গৃহে পড়িয়া তোমার সন্তানদের চক্ষু নষ্ট করিতেছে এবং তুমিও গৃহে গিয়া দেখিলে যে তোমার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড তোমার প্রাণাধিক সন্তানদিগের চক্ষু নষ্ট করিয়াছে তবে একমাত্র তুমিই জান, তোমার হৃদয়ে কেমন প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে এবং তুমি কিরূপ অনুতপ্ত হইবে।

এ জগতে কেহ কাহাকে হিংসা করিলে পরকালে হিংসুক ইহার প্রকৃত রূপ নিজের মধ্যে দেখিতে পাইবে। হিংসার অর্থ অনিষ্ট কামনা করা। কিন্তু যাহাকে হিংসা করা হয় তাহার কোন ক্ষতি হয় না ; বরং সে-ক্ষতি হিংসুকের দিকেই ফিরিয়া আসে ও তাহার ধর্ম নষ্ট হয় এবং পরকালে যে ইবাদত তাহার চক্ষের জ্যোতি হইত তাহা ফেরেশতাগণ তাহার আমলনামা হইতে উঠাইয়া যাহাকে হিংসা করা হয় তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। এইরূপে হিংসুক পুণ্যহীন হইয়া পড়ে। সংসারে তোমার সন্তানের চক্ষু তোমার যেরূপ উপকারে আসিবে পরকালে তোমার পুণ্য ততোধিক উপকারে লাগিবে। কারণ, পুণ্য তোমার সৌভাগ্যের উপকালে তোমার পুণ্য ততোধিক উপকারে লাগিবে। কারণ, পুণ্য তোমার সৌভাগ্যের উপকরণ নহে। পরকালে প্রত্যেক বস্তুর আকার প্রকৃতি অনুযায়ী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি তখন তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী দেখা যাইবে। আর তখন কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী অপমান ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। নিদ্রা পরকালের কিছুটা নিকটবর্তী বলিয়া প্রত্যেক কার্যের আসল রূপ নিদ্রিতাবস্থায় স্বীয় আকারে দেখা যায়। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সিরীন (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হাতের আংটি দ্বারা পুরুষগণের মুখে স্ত্রীলোকগণের লজ্জাস্থানে মোহর করিতেছি।" দিয়া থাক। সে ব্যক্তি বলিল ঃ 'বাস্তবিক তাহাই বটে।" ভাবিয়া দেখ, স্বপ্নদর্শকের কার্যের প্রকৃত অবস্থা স্বপ্নে কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। রমযান মাসের আযান সেহরীর সময় অবসানের সতর্কবাণী ও আল্লাহর যিকিরস্বরূপ। ইহার প্রকৃত অবস্থা আহার ও স্ত্রী-সহবাসে নিষেধ জ্ঞাপক। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পারলৌকিক অবস্থার নমুনা তোমাকে স্বপ্নে দেখানো হইতেছে ; অথচ তুমি এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ; এই মর্মেই হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, কিয়ামত দিবসে দুনিয়াকে একটা কদাকার বুড়ির আকারে উপস্থিত করা হইবে। লোকে তাহাকে দেখিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা কর।" ফেরেশতাগণ বলিবেন ঃ "ইহাই দুনিয়া যাহার পিছনে তোমরা জান-প্রাণ দিতে।" সেই সময় মানুষ এমন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবে যে, উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে।

এই অনুতাপ ও লজ্জা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলা যাইতেছে। এক বাদশাহ তাহার পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। বাদশাহ তনয় যে রজনীতে আপন প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইবেন সেই দিনি অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্বে অপরিমিত মদ্য পান করিলেন। উন্মত্তাবস্থায় নববধুর অন্বেষণে বাহির হইয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। কিন্তু পথ ভুলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। চলিতে চলিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তিনি ইহাকেই

নববধুর শয়নগৃহ বলিয়া মনে করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া কতক লোককে শায়িত দেখিতে পাইলেন, অনেকবার তাহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। মনে করিলেন সকলেই নিদ্রিত আছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে নূতন চাদরে আবৃত দেখিয়া তাহাকে নববধূ বলিয়া মনে করিলেন। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। তাহার উপর হইতে চাদর সরাইয়া দিলেন ; তখন এক প্রকার সুগন্ধি তাঁহার নাসিকায় পৌঁছিল। ভাবিলেন, অবশ্যই এ নববধূ সুগন্ধি ব্যবহার করত শয়ন করিয়াছেন। তাহার সহিত সহবাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইহাতে এক প্রকার রস বাহির হইলে তিনি মনে করিলেন নববধূ তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করত গোলাপ ছিটাইতেছেন। এইরূপে প্রভাত হইল এবং বাদশাহ-তনয়ের নেশা ছুটিল। তখন দেখিতে পাইলেন যে, ঐ গৃহ অগ্নি উপাসকদের সমাধিস্থল। পূর্বে যাহাদিগকে নিদ্রিত মনে করিয়াছিলেন তাহারা মৃতদেহ। যাহাকে নূতন চাদরে আবৃত দেখিয়া নববধু মনে করিয়াছিলেন সে একটি বীভৎস আকৃতির কদাকার বৃদ্ধা–দুই চারি দিন হইল মরিয়াছে। কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য মৃতার দেহে মর্দন করা হইয়াছিল, তাহা হইতেই বাদশাহ-তনয় সেই গন্ধ পাইয়াছিলেন। সেই রস বা আর্দ্রতা ঐ বৃদ্ধার মলমূত্র ও পঁচা গলিত পদার্থ ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার সমস্ত দেহ বৃদ্ধার মলমূত্র, গলিত রক্ত-পূঁজে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধার মুখের গলিত পুঁজে তাঁহার মুখ কটু বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ঘৃণা ও অনুতাপে তাঁহার মন একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার এই দুরবস্থা কেহ দেখিতে না পায়, বিশেষত বাদশাহ অর্থাৎ তাঁহার পিতা ও সৈন্য-সামন্ত তাঁহার দুর্গতি জানিতে না পারে এইজন্য তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। বাদশাহ-তনয় এমন ভয় ও অনুশোচনায় আচ্ছন্ন ছিলেন, এমন সময় বাদশাহ সভাসদ ও সৈন্যসামন্তসহ পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্রের দুর্গতি দেখিতে পাইলেন। তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং সেই দুর্গতি ও লজ্জার হাত এড়াইবার জন্য ভূগর্ত বিদীর্ণ হইলে প্রোথিত হইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। পার্থিব আনন্দ ও লোভনীয় বস্তু লইয়া যে সকল দুনিয়াদার এ জগতে মত্ত থাকে পরকালে তাহাদেরও এরূপ দুর্গতিই হইবে। সংসারের লোভনীয় বস্তুতে নিমজ্জিত থাকার দরুন তাহাদের মনের উপর যে প্রভাব থাকিবে তাহা বাদশাহ্ তনয়ের দেহে মিশ্রিত মল-মূত্র, পুঁজ ও তাঁহার মুখের বিস্বাদেয় ন্যায় হইবে। বরং তাহাদিগকে বাদশাহ-তনয় অপেক্ষা অধিক অপমানিত হইবে হইবে এবং তাহারা সহস্র গুণে অধিক যাতনায় নিপতিত হইবে। কারণ, পরকালের শাস্তি ও কষ্টের সহিত দুনিয়ার শাস্তি ও কষ্টের কোন তুলনাই হইতে পারে না। উক্ত গল্পে যে অগ্নির কথা বর্ণিত হইল শরীরের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই ইহা কেবল আত্মাকে দগ্ধ করে। ইহাকে লজ্জা ও অনুতাপের অগ্নি বলে।

আল্লাহর সৌন্দর্য-দর্শনে বঞ্চিত থাকার ক্ষোভাগ্নি ঃ এ দুনিয়া হইতে লোকে যে দর্শনহীনতা ও অজ্ঞানতা লইয়া যাইবে তাহাই এই অগ্নির কারণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ জগতে আল্লাহর মারিফাত লাভ করে নাই এবং শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিষ্কার করে নাই, অধিকন্তু পাপের মলিনতা ও সংসারাসক্তির মরিচা দ্বারা ইহাকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার হৃদয়ে পরকালে আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য প্রতিফলিত হইবে না। তাই আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনে বঞ্চিত থাকার দরুণ তাহারা ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে। এই অনলের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ মনে কর, অন্ধকার রজনীতে তুমি একদল লোকের সহিত কোন স্থানে উপস্থিত হইলে ; তথায় অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তুমি ইহাদের বর্ণ দেখিতেছ না। তোমার সঙ্গী তোমাকে বলিল, "যত পার, প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া লও। আমি শুনিয়াছি এই সকল প্রস্তরে অনেক উপকার হয়।" সঙ্গের লোক যে যত পারিল লইতে লাগিল। কিন্তু তুমি একটিও লইলে না। তুমি বলিলে, শুধু প্রস্তরের বোঝা বহন করা নিরেট মূর্খের কাজ। একমাত্র আল্লাহ্ জানেন, এ সকল কোন কার্যে আসিবে কিনা। তোমার সঙ্গিগণ কিন্তু সকলেই বোঝা বাঁধিয়া লইয়া চলিল। তুমি খালি হাতে তাহাদের সঙ্গে চলিলে এবং তাহারা বোঝা বহন করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকে উপহাসও করিতে লাগিলে। আর তাহাদিগকে বোকা মনে করত আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলে, যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, সে আমার ন্যায় শূন্যহস্তে আরামে গমন করে, যে নির্বোধ সেই গাধার মত অসার লোভে বোঝা বহিয়া মরে। পরে তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইল, ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডের প্রত্যেকটি লাবণ্যময় মহারত্ন ; এক একটি রত্নের মূল্য লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল তাহারা আরও অধিক আনে নাই বলিয়া দুঃখ করিতে থাকিবে। ধোঁকায় পড়িয়া তুমি আনয়ন কর নাই বলিয়া মর্মান্তিক যাতনায় তিলে তিলে ধ্বংস হইবে এবং ক্ষোভের প্রচণ্ড অগ্নি তোমার প্রাণ দগ্ধ করিতে থাকিবে। তোমার সঙ্গিগণ উক্ত রত্নের বিনিময়ে দুনিয়ার রাজত্ব লাভ করিবে, ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিবে এবং মনোরম প্রাসাদে বাস করিতে থাকিবে। অপরদিকে তাহারা তোমাকে উলঙ্গ ও অনাহারে রাখিবে এবং গোলাম বানাইয়া তাহাদের কার্যে নিযুক্ত করিবে। তাহাদের নিকট তুমি কিছু চাহিলে তাহারা অগ্রাহ্য করিবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ

اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ - قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ "(দোযখবাসিগণ বেহেশতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে,) আমাদের দিকে কিছু পানি বহাইয়া দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদিগকে কিছু দান কর। বেহেশতবাসিগণ বলিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

এই দুই বস্তু তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন।" বেহেশতবাসিগণ আরও বলিবে, "দুনিয়াতে তোমরা আমাদিগকে নির্বোধ জ্ঞানে উপহাস করিতে ; এখন আমরা তোমাদিগকে উপহাস করিতেছি।" এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ -

অর্থাৎ "যদি তোমরা আমদিগকে উপহাস কর তবে নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ।" তোমার সেই মহারত্ন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখ বেহেশতের অসীম নিয়ামত ও আল্লাহ্র অনুপম সৌন্দর্য-দর্শনে বঞ্চিত হইবার দুঃখের অনুরূপ। যাহারা দুনিয়া হইতে পুণ্যরূপ মহারত্ন সঞ্চয়ের কষ্ট স্বীকার করে না এবং বলে, "ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য বর্তমানের উপস্থিত সুখ ত্যাগ করিয়া কেন কষ্ট ভোগ করিব?' তাহারাই পরকালে চীৎকার করিয়া বলিবে, "আমাদের দিকে কিছু পানি বহাইয়া দাও।" তাহাদের মনস্তাপ হইবে না কেন? কারণ, পরকালে আরিফ ও আবিদগণ যে-সকল উপাদেয় বস্তু উপভোগ করিতে পাইবেন এবং যেরূপ সৌভাগ্য লাভ করিবেন, দুনিয়ার দীর্ঘ জীবন-ব্যাপী সুখ-সৌভাগ্য ইহার এক মুহূর্তের সুখ-সৌভাগ্যের তুল্যও হইবে না। এমনকি, যে ব্যক্তি দোযখ হইতে সর্বশেষে অব্যাহতি পাইবে তাহাকে দুনিয়ার সুখ-সৌভাগ্যের দশগুণ দেওয়া হইবে। সুখ-সৌভাগ্যের এই তুলনা দুনিয়ার পরিমাণ ও ওজনের সহিত নহে ; বরং সুখাস্বাদজনিত আনন্দের মাত্রার সহিতই এই তুলনা করা হইয়া থাকে। ইহা এইরূপ, যেমন মনে কর, বলা হইল–একটি মুক্তা দশটি স্বর্ণমুদ্রার তুল্য। ইহাতে এ কথা বুঝা যায় না যে, একটি মুক্তার পরিমাণ বা ওজন দশটি স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বা ওজনের সমান ; বরং ইহাই বুঝায় যে, একটি মুক্তার মূল্য দশটি স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের সমান।

শারীরিক অগ্নি হইতে মানসিক অগ্নি তীব্রতর ঃ উপরে তিন প্রকার মানসিক অগ্নির বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে জানা গেল যে, মানসিক অগ্নি শারীরিক অগ্নি হইতে বহুগুণে তীব্রতর। কারণ, কষ্ট যন্ত্রণা প্রাণ পর্যন্ত প্রবেশ না করিলে শরীরে তাহা অনুভূতই হয় না। সুতরাং বুঝা যায়, শারীরিক কষ্ট প্রাণে প্রবেশ করিয়া তীব্রতর হইয়া উঠে। কাজেই যে অগ্নি প্রাণের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া বাহিরে আসে তাহা যে অগ্নি শরীরে লাগে তাহা হইতে স্বভাবতই তীব্রতর হইয়া থাকে। উক্ত তিন প্রকার অগ্নি প্রাণের ভিতরে প্রজ্বলিত হয়– বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে না।

প্রকৃতির বিপরীত কোন কিছু যদি কাহারও উপর প্রবল হইয়া উঠে তবে ইহাও তাহার কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। শারীরিক গঠন প্রণালী যাহাতে অক্ষত থাকে এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাতে স্বাভাবিকমত পরস্পর সংলগ্ন থাকে, তাহাই শরীরের

প্রকৃতি চায়। কোন আঘাতে এক অঙ্গকে অন্য অঙ্গ হইতে পৃথক করিলে শারীরিক প্রকৃতির বিপরীত ঘটনা ঘটে এবং শরীরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আঘাত যেমন এক অঙ্গকে অপর অঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া দেয় তদ্রূপ অগ্নিও সমস্ত অঙ্গকে পরস্পর পৃথক করিয়া দিয়া থাকে ; সুতরাং সকল অঙ্গেই যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এইজন্যই অগ্নির যন্ত্রণা অতীব কঠিন। এইরূপ হৃদয়ে যখন ইহার বিপরীত পদার্থ আসিয়া চাপে তখন প্রাণে মহা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আল্লাহর দীদার ও তাঁহার পরিচয় লাভ করাই মানবাত্মার স্বাভাবিক প্রকৃতি। আল্লাহর দীদার লাভে বঞ্চিত থাকা ইহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিলে হৃদয়ে অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মানবাত্মা পীড়িত না হইলে এ জগতেই আল্লাহর দীদারে বঞ্চিত থাকার দরুন তাহাকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। দেহ, হস্ত-পদ পীড়িত হইয়া অবশ হইয়া পড়িলে উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেও যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। আবার পীড়া দূর হইলে শরীরে আগুনের স্পর্শ লাগামাত্রই ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা দুনিয়ার মোহ-পীড়ায় অসাড় থাকে। মৃত্যু হইলে সেই অসাড়তা দূরীভূত হয় এবং তখন অকস্মাৎ অন্তর্নিহিত অগ্নি পূর্ণভাবে হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অগ্নি বাহিরের কোথাও হইতে আসে না। কারণ এ-জগত হইতেই লোকে ইহা সঙ্গে লইয়া যায় এবং ইহা আত্মার সহিতই থাকে। নিশ্চিত জ্ঞান না থাকার কারণে এই অগ্নি এ জগতে বুঝা যায় না। এখন প্রত্যক্ষ দর্শনে নিশ্চিত-জ্ঞান হইলে ইহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইল। এই মর্মেই আল্লাহ বলেন ঃ

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ -

অর্থাৎ “তোমাদের যদি নিশ্চিত জ্ঞান থাকিত তবে তোমরা দোযখের প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতে পাইতে।”

শরীয়তে শারীরিক বেহেশত-দোযখের অধিক বর্ণনার কারণ ঃ শরীয়তে শারীরিক বেহেশত-দোযখের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। কারণ, উহা সকলেই জানিতে পারে ও বুঝে। কিন্তু আত্মিক বেহেশত ও দোযখের শ্রেষ্ঠত্ব ও কষ্ট সকলে বুঝিতে না পারিয়া তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিবে বলিয়া স্পষ্টভাবে উহার বর্ণনা করা হয় নাই। যদি তুমি কোন বালককে বল, “লেখাপড়া কর ; না করিলে প্রভুত্ব ও তোমার পিতার ঐশ্বর্য পাইবে না ; সুতরাং মহা সৌভাগ্য হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে।” তবে বালক এ-কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং ইহার বিশেষ কোন প্রভাব তাহার হৃদয়ে পড়িবে না। কিন্তু বালককে যদি বল, “না পড়িলে তোমার শিক্ষক তোমাকে কানমলা দিবেন”, তবে সে ভয় করিব ; কারণ ইহা সে বুঝিতে পারিবে। যে–বালক লেখাপড়া করে না তাহার সম্বন্ধ শিক্ষকের শাস্তি সত্য এবং পিতার ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হওয়াও সত্য। এইরূপ শারীরিক দোযখও সত্য এবং আল্লাহর দীদার হইতে

বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভাগ্নিও সত্য। পিতার অতুল ঐশ্বর্য ও প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার তুলনায় শিক্ষকের প্রহার যেমন নিতান্ত তুচ্ছ তদ্রূপ আত্মিক দোযখের তুলনায় শারীরিক দোযখ কিছুই নহে।

তুমি হয়ত বলিবে, বেহেশত-দোযখ সম্বন্ধে এ গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইল তাহা শরীয়তের আলিমগণ যাহা বলিয়াছেন এবং কিতাবাদিতে লিখিয়াছেন তাহার বিপরীত। কারণ তাঁহারা বলেন, "কেবল অনুবর্তী বিশ্বাস (তকলীদ) ও অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বেহেশত-দোযখ সম্বন্ধে জানা যাইতে পারে ; উহা বুঝিতে বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক দর্শন ক্ষমতার কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহার উত্তর শোন, শরীয়তের অলিমগণের মত যে আমাদের মতের বিপরীত নহে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কারণ, আখিরাত সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি জড়জগতেই সীমাবদ্ধ ; আধ্যাত্মিক জগতের পরিচয় তাঁহারা লাভ করেন নাই ; অথবা পরিচয় পাইয়া থাকিলেও বর্ণনা করেন নাই। কারণ, অধিকাংশ লোকে তাহা বুঝিবে না।

আধ্যাত্মিক জগত ঃ যাহা শরীর ও জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা শরীয়তের আলিমগণের নিকট না শুনিলে এবং তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলে বুঝা যায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আত্মার স্বরূপ দর্শনের একটি শাখা। ইহা জানিবার অপর একটি স্বতন্ত্র পথও রহিয়াছে ; এ পথে গুপ্ত বিষয় জানা ও দেখা যায়। যে ব্যক্তি আপনার বাসস্থান পরিত্যাগপূর্বক ধর্মপথের পথিক হইয়াছেন এবং কখনও স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করেন না, কেবল তিনিই এই পথ পাইয়াছেন। এখানে বাসস্থানের অর্থ কোন কোন নগর বা গৃহ নহে। কারণ, নগর বা গৃহ শরীরের বাসস্থান এবং এক্ষেত্রে শারীরিক ভ্রমণের কোন মূল্য নাই। কিন্তু মানুষের মূল আত্মারও একটি বাসস্থান আছে ; অর্থাৎ আত্মা যেখান হইতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই তাহার বাসস্থান। তথা হইতে সে মুসাফিরের ন্যায় এখানে আসিয়াছে। তাহার পথে বহু মঞ্জিল রহিয়াছে। প্রত্যেকটি মঞ্জিল এক একটি স্বতন্ত্র জগত। প্রথম মঞ্জিল জড় জগত, দ্বিতীয় মঞ্জিল চিন্তা-জগত, তৃতীয় মঞ্জিল কল্পনা জগত এবং চতুর্থ মঞ্জিল বুদ্ধি-জগত। চতুর্থ মঞ্জিলে উপস্থিত হইলে মানুষ স্বীয় আত্মার পরিচয় লাভ করে। ইহার পূর্বে সে এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত সেই চারি জগতের বিষয় বুঝা যাইবে। মানুষ যতদিন জড়-জগতে আবদ্ধ থাকে ততদিন তাহাদিগকে পতঙ্গের সহিত তুলনা করা চলে। প্রদীপ দেখামাত্র পতঙ্গ ইহাতে পতিত হয়। কারণ, ইহার দর্শন-শক্তি আছে, কিন্তু চিন্তা ও স্মরণশক্তি নাই। অন্ধকার হইতে পলায়ন করিবার জন্য পতঙ্গ ছিদ্রপথ তালাশ করে। প্রদীপকে পালাইবার পথ মনে করিয়া ইহাতে পতিত হয়। একবার প্রক্রিয়া অগ্নির উত্তাপ ও কষ্ট পাইলেও উহা তাহার মনে থাকে না। কারণ, পতঙ্গের স্মরণশক্তি ও চিন্তা করিবার

ক্ষমতা মোটেই নাই এবং ইহারা স্মরণ ও চিন্তাশক্তি লাভের উপযুক্তই নহে। এই জন্যই বারবার আপনাকে প্রদীপে ফেলিয়া স্বীয় জীবন বিনাশ করে । পতঙ্গের স্মরণ ও চিন্তাশক্তি থাকিলে একবার অগ্নির উত্তাপ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আবার কখনও প্রদীপের ত্রিসীমায় যাইত। কারণ, পশু একবার প্রহার ভোগ করিলে ইহা তাহার স্মরণ থাকে এবং পুনরায় লাঠি দেখামাত্রই পলায়ন করে। মানুষও যতদিন প্রথম মঞ্জিল জড়জগতে আবদ্ধ থাকে ততদিন পতঙ্গ সদৃশ থাকে। দ্বিতীয় মঞ্জিল চিন্তা-জগতে উপনীত হইলে মানুষকে পশুর সহিত তুলনা করা যায়। কারণ, অজ্ঞতার দরুণ পশু প্রথমে কষ্টদায়ক বস্তু হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না বটে কিন্তু একবার যাহা হইতে কষ্ট প্রাপ্ত হয় দ্বিতীয়বার তাহা দেখিলেই পলায়ন করে ; তৃতীয় মঞ্জিল, কল্পনা-জগতে উপস্থিত হইলে মানুষ ছাগল ও ঘোড়ার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শত্রু দ্বারা কষ্ট পাইবার পূর্বেই ইহারা শত্রুর স্বাভাবিক জ্ঞানে চিনিয়া তাহা হইতে পলায়ন করে। এইজন্যই যে ছাগল পূর্বে কখনও নেকড়ে বাঘ দেখে নাই সে ও তাহা হইতে পলায়ন করে ; তদ্রূপ যে অশ্ব পূর্বে কোন দিনই ব্যাঘ্র দেখে নাই সেও শত্রুজ্ঞানে তাহা হইতে পলায়ন করে। অথচ বলদ, উট, হাতী আকারে নেকড়ে বাঘ ও ব্যাঘ্র অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও ইহাদিগকে দেখিয়া ছাগল ও অশ্ব পলায়ন করে না। এইরূপ বুদ্ধি আল্লাহ ছাগল ও অশ্বকে দান করিয়াছেন কিন্তু আগামীকল্য কি ঘটিবে ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। চতুর্থ মঞ্জিলে উপনীত হইলে এই জ্ঞান লাভ হয়। চতুর্থ মঞ্জিল হইল বুদ্ধি-জগত। ইহাতে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ পশুর পর্যায়ে থাকে। এই মঞ্জিলে উপস্থিত হইলে মানুষ পশুর সীমা অতিক্রম করে। বাস্তবপক্ষে সে তখন মনুষ্যত্বের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে এমন বিষয় জানা যায় যাহার উপর স্পর্শ চিন্তা ও কল্পনার কোন অধিকার নাই। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা এ অবস্থায় জানিতে পারিয়া ভয়ে পরিত্যাগ করা চলে। কোন বস্তু যাহা আকৃতিতে যেরূপ দেখায় তাহা হইতে ইহার বাস্তব রূপ পৃথক করা যায় এবং প্রত্যেক বস্তুর বাহ্য আকৃতি দর্শনে ইহার হাকীকত বুঝা যায়। এ জগতে যত পদার্থ দেখা যায় উহা অসীম নহে। কারণ, জড় জগতের পদার্থের অবয়ব ও আকার আছে এবং যাহার অবয়ব আছে তাহার সীমাও আছে। স্থলপথে চলাচল করা যেমন সহজ জড় জগতের বিষয় চিন্তা করাও তদ্রূপ সহজ ; সুতরাং সকলেই ইহা করিতে পারে। কিন্তু চতুর্থ মঞ্জিল অর্থাৎ বুদ্ধির জগত যাহা শুধু আত্মা ও কর্মের প্রকৃত অবস্থা লইয়া ঘটে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ পানির উপর দিয়া গমনাগমনতুল্য কঠিন। তৃতীয় মঞ্জিল অর্থাৎ কল্পনা-জগতে পরিভ্রমণ করা নৌকাপথে ভ্রমণতুল্য– পানি ও স্থলের মধ্যবর্তী। চতুর্থ মঞ্জিলের শেষভাগে অর্থাৎ বুদ্ধি–জগতের পরপারে এমন এক উন্নত সোপান আছে যাহাতে একমাত্র আম্বিয়া আওলিয়া ও সূফীগণ অবস্থান করেন। এই উন্নত সোপানে

বিচরণ বায়ুর উপর গমনাগমনতুল্য। কতক লোকে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হ্যাঁ, তাঁহার বিশ্বাস তদপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলে তিনি নিশ্চয়ই বাতাসের উপর দিয়া চলিতেন।"

মানুষের পক্ষে সর্বোন্নত পদ-প্রাপ্তির আশা ও নিম্নতম স্থানে পতনের ভয় ঃ মানুষের গন্তব্যপথের মঞ্জিলসমূহ জ্ঞান-পথের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ ইহার শেষ মঞ্জিলে উন্নীত হইলে ফেরেশতার মরতবা লাভ করে। সুতরাং ইতর প্রাণীর নিম্নতম পর্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ফেরেশতাগণের সর্বোন্নত পর্যায় পর্যন্ত মানুষের গন্তব্যপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ ও অবনতির নিম্নতম কূপে পতন তাহার কর্মের উপর নির্ভর করে। তাই তাহার পক্ষে সর্বোন্নত পদ-প্রাপ্তির আশা ও নিম্নতম কূপে পতনের ভয় রহিয়াছে। এই আশঙ্কাজনক অবস্থার বিষয় পবিত্র কুরআন শরীফে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ (الى قوله) كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমানত (গুরুতর কর্তব্যভার) আসমান, যমীন ও পর্বতসমূহের সম্মুখে পেশ করিলাম ; অনন্তর সকলেই উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহা দেখিয়া ভীত হইল এবং কেবল মানব-জাতি উহা বহনের জন্য উঠাইয়া লইল। নিশ্চয়ই মানুষ নিজের উপর অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিতান্ত মূর্খ।" (সূরা– আহযাব, রুকু ৯, পারা ২২) মানুষের এই গুরু-দায়িত্বভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রস্তরাদির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, কেননা ইহারা অচেতন। এইজন্যই প্রস্তরাদির কোন ভয়ও নাই। অপর পক্ষে ফেরেশতাগণ যে উচ্চমর্যাদায় উপনীত রহিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাদের পতন সম্ভব নহে। তাঁহাদের মর্যাদা অপরিবর্তনশীল ; যেমন আল্লাহ্ ফেরেশতাগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করেন ঃ وَمَامِنَّا اِلاَّ لَه مَقَام مَّعْلُوْم অর্থাৎ "আমাদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে এমন নাই যে স্বীয় অবস্থা ভালরূপে অবগত না আছে।" আবার পশু নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। ইহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নহে। মানব ফেরেশতা ও পশু এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত এবং সে মহা সঙ্কটজনক স্থানে উপস্থাপিত। কারণ, সাধনা দ্বারা সে উন্নত হইয়া ফেরেশতার সমকক্ষ হইতে পারে, আবার অবনতির দিকে গড়াইয়া পড়িলে ইতর জন্তুর অবস্থায় পতিত হয়। আমানত বহনের জন্য উঠাইয়া লওয়ার অর্থ এই যে মানুষ ভয়মুক্ত সন্দেহজনক অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে এই আমানতের বোঝা বহন করা সম্ভব নহে।

তুমি প্রতিবাদে বলিয়াছিলে, বেহেশত–দোযখ সম্বন্ধে এ-গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইল তাহা শরীয়তের আলিমগণের অধিকাংশের মতের বিপরীত। আর উত্তর দিতে যাইয়া

এতগুলির কথা বলা হইল। তাঁহাদের কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিও না। কারণ, পথিকের অবস্থা স্থিতিশীল ব্যক্তির বিপরীত হইয়া থাকে। স্থিতিশীল বহু সংখ্যক, কিন্তু পথিক নিতান্ত কম। মানবের প্রথম মঞ্জিল জড়-জগতকেই যে ব্যক্তি স্বীয় বাসস্থান বানাইয়া লয় এবং ইহাতে চিরদিন স্থিতিশীল থাকে, সে কখনও কার্যাবলীর মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। এরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

পরকাল-পরিচয়ের বিবরণ এ-পর্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। ইহা অতিরিক্ত বলিলে লোকে বুঝিবে না ; বরং যাহা বর্ণিত হইল তাহাই অধিকাংশ লোকে বুঝিতে সক্ষম হইবে না।

পরকাল-অবিশ্বাসীদের ভ্রম দূরীকরণে দুইটি সাধারণ যুক্তি ঃ দুনিয়াতে এমন মূর্খ বহু আছে যাহারা কার্য-কারণের প্রকৃত অবস্থা নিজে বুঝিতে পারে না ; অথচ শরীয়তের আদেশও তাহারা মানিয়া লয় না। পরকালের ব্যাপারে তাহারা আশ্চর্য বোধ করে এবং পরকাল- বিষয়ে সন্দেহ তাহাদের মনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দুনিয়ার বাসনা কামনা তাহাদের মনে প্রবল হইয়া পড়িলে পরকালকে অস্বীকার করাই তাহাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। এইরূপে পরকালের প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। শয়তান এই অবিশ্বসাককে আরও বাড়াইয়া দেয়। তখন তাহারা মনে করে, দোযখ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রতারণা মাত্র এজন্যই লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া লোকে শরীয়ত অস্বীকার করে এবং শরীয়ত অবলম্বীদিগকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে। আর এই মূর্খগণ শরীয়ত-বিশ্বাসীদিগকে উপহাস করিয়া বলে ঃ "ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ব্যতীত তাহাদের ভাগ্যে আর কিছুই নাই।" পরকাল অবিশ্বাসী মূর্খদের তেমন ক্ষমতা কোথায় যে, ঐ প্রকার তত্ত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিতে পারে?

প্রথম ঃ পরকালে অবিশ্বাসীদিগকে একটি স্পষ্ট কথা বুঝিতে আহ্বান করা হইতেছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, "তোমাদের যদি এই ধারণা প্রবল হইয়া থাকে যে, একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এবং জগতের সমস্ত আলিম ও ওলী সকলেই ভ্রমে পতিত ছিলেন ও প্রতারিত হইয়াছিলেন ; আর তোমাদের মূর্খতা ও ভ্রম সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে পরকালের বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়াছে, তবে জানিয়া রাখ, তোমরাই মহা ভুলে নিমগ্ন রহিয়াছ এবং তোমরাই ধোঁকায় পড়িয়াছ। পরকালের অবস্থা ও আত্মিক শাস্তি তোমরা বুঝিতে পার নাই। আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝাইবার জন্য জড়-জগতের যে সকল উপমা লওয়া হইয়াছে উহা তোমরা বুঝিতে পার নাই।" ইহাতেও মূর্খ নিজ ভ্রম বুঝিতে না পারে এবং বলে ঃ "এক অপেক্ষা দুই অধিক, ইহা যেমন ধ্রুব সত্য জানি তদ্রূপ ইহাও জানি যে, আত্মার কোন মুল্য নাই, আত্মা চিরস্থায়ী

নহে এবং আত্মিক ও দৈহিক শাস্তিও শান্তি হইতে পারে না" তবে তাহার স্বভাব একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধারের কোন আশা নাই। এই প্রকার লোক সম্বন্ধেই আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ـ

অর্থাৎ "আপনি তাহাদিগকে সৎপথের দিকে আহ্বান করিলে তাহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।"

দ্বিতীয় ঃ আবার পরকাল-অবিশ্বাসীদের কেহ যদি বলে ঃ "পরকালের সুখ-দুঃখ অসম্ভব নহে, হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহা বুদ্ধির সীমার বহির্ভূত। পরকালের সুখ-দুঃখের কথা ঠিকভাবে আমার জানা নাই, এমন কি উহা সত্য বলিয়া আমার মনে প্রবল ধারণাও জন্মে নাই, এমতাবস্থায় সন্দেহমূলক কথার উপর নির্ভর করত কিরূপে চিরজীবন নিজেকে পরহিযগারীর কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিব? আর দুনিয়ার সুখ-ভোগে কেনই বা বিরত থাকিব?"–তবে তাহার উত্তরে আমরা বলিব-তুমি দুর্বল বিশ্বাসে যখন এতটুকু স্বীকার করিলে যে, পরকালে সুখ-দুঃখ ঘটা অসম্ভব নহে, তখন বুদ্ধিমানের ন্যায় পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করতে শরীয়তের পথে তোমার চলা আবশ্যক। কারণ, বড় বিপদের অতি দুর্বল ধারণা জন্মিলেও লোকে ইহার ত্রিসীমায় যায় না। তুমি আহারে বসিয়াছ এমন সময় যদি কেহ বলে এ খাদ্যে সাপে মুখ দিয়াছিল, তবে তুমি নিশ্চয়ই আহারে বিরত থাকিবে। এস্থলে এমন ধারণাও হইতে পারে যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে। তুমি না খাইলে সে খাইবে, এই উদ্দেশ্যে হয়ত মিথ্যা বলিয়াছে। কিন্তু তাহার কথা সত্যও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় তুমি চিন্তা করিবে ঐ সন্দেহজনক খাদ্য আহার করা অপেক্ষা কিছুক্ষণ ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করা সহজ ; আর যদি আহার করি এবং তাহার কথা সত্য হয় তবে আমার মৃত্যু অনিবার্য। এইরূপ মনে কর, তুমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত এবং ইহাতে তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে ; এমন সময় যদি কোন তাবীজ লেখক বলেন ঃ "তুমি একটি রৌপ্যমুদ্রা দাও। তোমার রোগমুক্তির জন্য কাগজে একটি তাবীজ লিখিয়া দিব এবং একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া দিব। ইহা ধারণ করিলে পীড়া হইতে মুক্তি পাইবে।" যদিও তোমার প্রবল ধারণা আছে যে, ঐ প্রকার চিত্রের সহিত স্বাস্থ্যের কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি তোমার মনে হইবে, হয়ত তাহার কথা সত্য হইতে পারে। তখন একটি রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইবে। যদি কোন গণক বলেন, "আসমানের অমুক স্থানে চন্দ্র উপস্থিত হইলে অমুক তিক্ত ঔষধ সেবন করিও, তাহাতে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।" তবে গণকের কথায় সেই তিক্ত ঔষধ সেবনের কষ্ট সহ্য করিবে এবং মনে মনে বলিবে, হয়ত গণক সত্যই বলিতেছে, আর অসত্য বলিলেও ঔষধ সেবনের কষ্ট অতি সামান্য।

অতএব ভাবিয়া দেখ, যে-বিষয়ে একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর, জগতের সমস্ত বুযর্গ আলিম ও আওলিয়া এক মতাবলম্বী, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট একজন গণক, একজন তাবীজ লেখক বা একজন বিধর্মী চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। ইহাদের কথায় তো তুমি দুনিয়ার বড় কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় তদপেক্ষা সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া লও এবং সামান্য কষ্ট ও ক্ষতি অধিক কষ্ট ও ক্ষতির তুলনায় তোমার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। পরকালে অনন্ত জীবনের সহিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী পরমায়ুর তুলনা করিলে বুঝা যাইবে দুনিয়াতে শরীয়তের অধীনে চলিবার কষ্ট পরকালের ভীষণ বিপদের তুলনায় কত সামান্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি মনে মনে বলিতে পার, "যদি পয়গম্বর ও বুযুর্গগণের কথা সত্য হয় এবং তাঁহাদের কথা অনুযায়ী পরকালে কঠিন শাস্তিতে অনন্ত কালের জন্য নিপতিত হই, তবে কি করিব? দুনিয়ার কয়েক দিনের আরামে আমার কি উপকার হইবে? আবার বুযর্গগণ যাহা বলিতেছেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর।" এইরূপ ভাবিয়াও তো তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিতে পার।

পরকালের অসীমতা বুঝাইবার জন্য একটা উপমা দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, সমস্ত বিশ্বজগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চনার দানায় পূর্ণ করত একটি পক্ষীকে হাজার হাজার বৎসর পরে একটি দানা করিয়া তুলিয়া লইতে নিযুক্ত করিলে দানাগুলি সমস্ত নিঃশেষ হইবে, কিন্তু পরকালের অসীমতার কিছুই কমিবে না। এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যদি শাস্তি হয়, আর সেই শাস্তি আত্মিক হউক, শারীরিক হউক বা কাল্পনিক হউক তবে কিরূপে তাহা সহ্য করিবে? দুনিয়ার পরমায়ু পরকালের সেই অনন্তরকালের পরমায়ুর তুলনায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এই সকল বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে এমন কোন বুদ্ধিমান নাই যে, পরকালের ঐ ভীষণ শাস্তি কাল্পনিক হইলেও ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য দুনিয়ার সামান্য নিশ্চিত কষ্ট স্বীকার করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে না। লোকে বাণিজ্য উপলক্ষে জাহাজে আরোহণপূর্বক বহু দূরদেশে যাতায়াত করে এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে। ইহা কেবল ভবিষ্যতের কাল্পনিক লাভের আশায়ই করিয়া থাকে। ফলকথা, পরকালের আযাবের প্রতি ঐ সকল মূর্খের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলেও সন্দেহপূর্ণ দুর্বল বিশ্বাস তো আছে। সুতরাং শরীয়তের বোঝাটুকু বহন করিলেই তাহাদের নিজেদের উপর কিঞ্চিৎ দয়া করা হইবে।

উপরোক্ত মর্মেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা এক কাফিরের সহিত তর্ক করিতে করিতে অবশেষে বলিলেন ঃ "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলে তুমিও বাঁচিবে, আমিও বাঁচিব ঃ আর আমি যাহা বলিতেছি বাস্তবিকই তাহা সত্য হইলে

কেবল অমিই বাঁচিব, আর তুমি অনন্ত আযাবে পতিত থাকিবে।" তিনি এই কথা ঐ কাফিরের অল্পবুদ্ধি অনুযায়ী বলিয়াছিলেন। ইহাতে মনে করিও না যে, পরকাল সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে, দৃঢ় বিশ্বাসের পন্থা উপলব্ধি করিবার শক্তি ঐ কাফিরের ছিল না।

উপসংহার ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরকালের পথের ব্যতীত অন্য বস্তু অর্জনে লিপ্ত হয়, সে বড় নির্বোধ। সংসারের মোহ ও পরকালের প্রতি উদাসীনতা এই নির্বুদ্ধিতার কারণ। কেননা, দুনিয়ার বাসনা-কামনা তাহাকে পরকালের বিষয় চিন্তা করিবারই অবকাশ দেয় না। অন্যথায় পরকালের আযাব সম্বন্ধে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাহার হৃদয়ে পরকালের শাস্তির প্রবল ধারণা আছে এবং ইহার প্রতি যাহার দুর্বল বিশ্বাস আছে, তাহাদের সকলকেই বুদ্ধিমানের মত ঐ ভীষণ সঙ্কট হইতে সভয়ে পলায়ন করা আবশ্যক এবং পূর্ব হইতে সতর্কতার পথ অবলম্বন করা কর্তব্য।

যাঁহারা উপদেশ মত চলেন

তাঁহাদের প্রতি সালাম।

দর্শন– পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

ইবাদত

প্রিয় পাঠক, ইতঃপূর্বে দর্শন-পরিচ্ছেদে তুমি মুসলমানদের প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে অবগত হইয়াছ। আত্ম-পরিচয় এবং আল্লাহ, দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞানও লাভ করিয়াছ। এখন মুসলমানী আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। দর্শন-পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ-পরিচয় ও ইবাদতের মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। দর্শন-পরিচ্ছেদের চারিটি অধ্যায় হইতে আল্লাহর পরিচয়- জ্ঞান লাভ হইয়াছে। পরবর্তী চারিটি খণ্ডে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন সম্বন্ধে জানা যাইবে। প্রথম খণ্ডের জাহেরী ইবাদত দ্বারা নিজকে সুশোভিত করিবার উপায় বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে মুআমালাত অর্থাৎ জীবন গতিবিধি, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যাবতীয় কাজ কারবার অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিবার বিধি প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় বিনাশন খণ্ডে আত্মাকে মন্দ স্বভাব হইতে পবিত্র রাখিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইবে। চতুর্থ পরিত্রাণ খণ্ডে মানব-হৃদয়কে সদগুণরাজি দ্বারা সুশোভিত করিবার বিষয় বর্ণিত হইবে।

ইবাদত

প্রথম অধ্যায়

সুন্নী মতানুসারে ধর্ম–বিশ্বাস দৃঢ়করণ

মুসলমানের প্রথম কর্তব্য ঃ মুসলমানের প্রথম কর্তব্য হইল তাহার মৌখিক স্বীকারোক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল) কলেমার মর্ম হৃদয়ে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা এবং এই বিশ্বাসকে এইরূপ দৃঢ় করা যেন ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এই কলেমার মর্ম সুষ্ঠুভাবে অন্তরস্থ করিলে এবং তৎপ্রতি একেবারে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস বদ্ধমূল করিলেই ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মুসলমান হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট। যুক্তিতর্ক সহকারে ইহার কর্ম উপলব্ধি করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয নহে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরববাসীকে প্রমাণাদির অন্বেষণে, তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সন্দেহ তালাশ করত ইহার উত্তর প্রদানের আদেশ দান করেন নাই ; বরং উক্ত কলেমার মর্মার্থকে সত্য জানা ও তৎপ্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত সাধারণ মুসলমানের জন্য নহে। কিন্তু সরল বিশ্বাসী সাধারণ মুসলমানকে যাহাতে কোন বিধর্মী লোকে পথভ্রষ্ট করিতে না পারে এইজন্য তর্কবিদ্যায় পটু এবং যুক্তি সহকারে ধর্ম-বিশ্বাস ঠিক করিয়া দিতে ও সন্দেহ নিরসনপূর্বক বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতে সক্ষম হয়, মুসলমান সমাজে এরূপ কিছু সংখ্যক লোকের একান্ত আবশ্যক। যে বিদ্যা দ্বারা ইহা করা যায় তাহাকে ইলমে কালাম (তর্কশাস্ত্র) বলে। এই বিদ্যা অর্জন করা ফরযে কেফায়া। (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে এরূপ কয়েকজন আলিম স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকিলেই সারা বিশ্বের মুসলমান এ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। প্রত্যেক বস্তিতে এইরূপ দুই একজন লোক থাকিলেই যথেষ্ট। সাধারণ লোক ধর্মের প্রতি সরল বিশ্বাসী হইয়া থাকে। তর্কশাস্ত্রে পটু ব্যক্তি তাহাদের ধর্ম–বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

মারিফাতের সহিত সরল বিশ্বাস ও তর্কশাস্ত্রের তুলনা ঃ মারিফাতের পথ সাধারণ মুসলমানের সরল বিশ্বাস ও তর্কশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা মারিফাত-পথের আরম্ভ হয়। এই পথে বিচরণ না করিয়া কেহই মারিফাতের দরজায় উপনীত হইতে পারে না। এই পথে না চলিয়া মারিফাতের দাবি কর শোভা পায় না। এরূপ দাবিতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-মনে কর, কোন রোগী কুপথ্য পরিত্যাগ না করিয়া কেবল ঔষধই সেবন করিলে তাহার বিনাশ প্রাপ্তির আশঙ্কা প্রবল থাকে। কারণ, কুপথ্যসহ ঔষধ সেবন করিলে উদারস্থ বিকৃত ধাতু ও দূষিত রসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রোগ বৃদ্ধির কারণ হইয়া পড়ে। এই ঔষধে স্বাস্থ্য লাভ হয় না। দর্শন-খণ্ডে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা মারিফাতের নমুনাস্বরূপ। যাহার মধ্যে মারিফাত লাভের যোগ্যতা আছে শুধু তাহারই মারিফাত লাভের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দুনিয়ার সহিত একেবারে সম্পর্কহীন এবং সারাজীবন একমাত্র আল্লাহর অন্বেষণে মশগুল, শুধু এমন ব্যক্তিই আল্লাহর মারিফাত লাভের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইহা নিতান্ত কঠিন। তাই যাহা সমস্ত জগতের জীবিকাস্বরূপ অর্থাৎ সুন্নী মতানুসারে ধর্ম-বিশ্বাস, তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে। এই ধর্ম-বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। কারণ, ইহাই মানবের সৌভাগ্যের বীজ।

ধর্ম বিশ্বাস

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঃ অবগত হও এবং বিশ্বাস কর যে, তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তুমি তাঁহারই সৃষ্ট। কেবল তোমাকেই নহে বরং সমগ্র বিশ্বজগত এবং সমস্ত যাহা কিছু আছে সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি এক, তাঁহার কোন অংশী নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। তাঁহার আরম্ভ ও শেষ নাই। তিনি অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁহার অস্তিত্বের শেষ সীমা নাই। তিনি অনাদিকাল হইতে আছেন এবং অনন্তকাল থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে অস্তিত্বহীনতার কোন প্রশ্নই উঠে না। তিনি স্বয়ং তাঁহার অস্তিত্বের কারণ ; অন্য কোন কারণ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব উদ্ভূত নহে। বিশ্বজগতের সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। আপন হইতেই তিনি স্থিতিশীল, অথচ যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহার উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহর পবিত্রতার উপর বিশ্বাস ঃ তিনি কোন মৌলিক বা গুণাধার বস্তুও নহেন অথবা কোন আনুষঙ্গিক বা গুণ-পদার্থও নহেন। তিনি কোন দ্রব্যে প্রবেশ করত একাকার হইয়া যান না। তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন এবং কোন পদার্থও তাঁহার সদৃশ নহে। তাঁহার কোন আকৃতি নাই ; তাঁহার মধ্যে পরিমাণ ও প্রকৃতির কোন অধিকার নাই। পরিমাণ ও প্রকৃতি বলিতে তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনায় যাহা কিছু উদিত

হয়, তিনি উহার সবকিছু হইতেই পবিত্র। কারণ, যাবতীয় গুণ ও অবস্থা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ বা অবস্থা তাঁহার মধ্যে নেই। বরং কল্পনা বা ধারণার যত প্রকার আকার বা অবস্থার উদয় হয়, উহার সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ; ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও পরিমাণ গুণের কোন সম্পর্কই তাঁহার সহিত নাই। এই সকল জগতের জড়বস্তুর গুণ। তিনি শরীরী নহেন। কোন শরীরী বস্তুর সহিত তাঁহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। তিনি কোন স্থানে নহেন। কোন শরীরী বস্তুর সহিত তাঁহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। তিনি কোন স্থানে নহেন এবং কোন স্থানে সীমাবদ্ধও নহেন। তাঁহার অস্তিত্ব এমন কোন জিনিসই নহে যাহা স্থান অধিকার করে। জগতে যাহা কিছু আছে সবই আরশের নিচে এবং আরশ তাঁহার ক্ষমতাধীন। আর তিনি আরশের উপর আছেন। কিন্তু আরশের উপর তাঁহার অবস্থান কোন পদার্থের উপর অপর শরীরী পদার্থের অবস্থানের মত নহে। কারণ, তিনি শরীরী নহেন। আরশ তাঁহাকে ধারণ ও বহন করিতেছেন না ; বরং তাঁহার শক্তি ও অনুগ্রহে আরশ ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ বিদ্যমান আছে। আরশ সৃষ্টি করিবার পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন এবং অনন্তকাল এইরূপই থাকিবেন। কেননা তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীতে কোন প্রকার পরিবর্তন নাই। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার গুণের পরিবর্তন ঘটিয়া কমিয়া গেলে তিনি আল্লাহ হওয়ার বিল্লাহ, তিনি অপূর্ণ ও পূর্ণতার মুখাপেক্ষী থাকিতেন। মাখলুক মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, মুখাপেক্ষী আল্লাহ হওয়ার যোগ্য নহে। তাঁহার গুণাবলী সৃষ্ট পদার্থের গুণাবলী সদৃশ না হইলেও এ-জগতে তিনি পরিচিত হওয়ার যোগ্য এবং পরকালে তিনি দর্শনের উপযোগী। এ-জগতে যেমন তাঁহাকে সাদৃশ ও প্রকৃতি ব্যতীতই চিনা যায়, পরকালেও তদ্রূপ তাঁহাকে সদৃশ ও প্রকৃতি ছাড়াই দেখা যাইবে। কারণ, পরকালের দর্শন এ–জগতের দর্শনের অনুরূপ নহে।

আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস ঃ আল্লাহ কোন পদার্থের তুল্য নহেন। তথাপি তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। তাঁহার ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতার লেশমাত্র নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন এবং করিবেন। সাত আসমান , সাত যমীন, আরশ, কুরসী এবং আরও যত কিছু আছে সবই তাঁহার ক্ষমতাধীন ও বশীভূত। এই সমস্তের উপর তাঁহার ছাড়া অপর কাহারো কোন অধিকার নাই। সৃষ্টিকার্যেও তাঁহার কোন সাথী ও সাহায্যকারী নাই।

আল্লাহর জ্ঞানে বিশ্বাস ঃ তিনি জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ এবং তাঁহার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সর্বোচ্চ আরশ হইতে নিম্নতম পাতাল পর্যন্ত কোন জিনিসই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নহে। কারণ, সকল জিনিস তাঁহার আদেশেই প্রকাশ পায়। এমনকি মরুভূমির বালুকণা, বৃক্ষাদির পত্র-পল্লব, মানব-হৃদয়ে কল্পনাসমূহ এবং বায়ু–কণিকার সংখ্যা তাঁহার জ্ঞানে আসমানের সংখ্যার ন্যায় পরিস্ফুট।

আল্লাহর অভিপ্রায়ে বিশ্বাস ঃ বিশ্বে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হইয়াছে। অল্প-বেশি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য কুফর-ঈমান, লাভ-লোকসান, ক্ষতি-বৃদ্ধি, শান্তি- অশান্তি, সুস্থতা- অসুস্থতা এই সমস্তই তাঁহার ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমস্ত জিন ও মানুষ, শয়তান ও ফেরেশতা সববেত হইয়া জগতের একটি রেণু নাড়িতে বা স্থানচ্যুত করিতে অথবা উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিলেও আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতীত কিছুই করিতে পারিবে না। কখনই করিতে পারিবে না। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না এবং তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে কেহই কোন বাধা প্রদান করিতে পারে না। যাহা কিছু ছিল, আছে ও হইবে, সমস্তই তাঁহার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন-ক্ষমতার বিশ্বাস ঃ তিনি যেমন সবই জানেন তদ্রূপ সবই দেখেন ও শুনেন। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী শব্দ তিনি সমভাবেই শ্রবণ করিয়া থাকেন। অন্ধকার রাত্রিতে তিনি পিপীলিকার পদধ্বনি শুনিতে পান এবং পাতালপুরীতে যে-কীট আছে তাহার বর্ণ ও অকৃতি দর্শন করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন না। তাঁহার বোধ-শক্তি যেমন চেষ্টা ও চিন্তালব্ধ নহে, সেইরূপ তাঁহার সৃজনও কোন প্রকার যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নহে।

আল্লাহর বাক-শক্তিতে বিশ্বাস ঃ আল্লাহর আদেশ পালন সকলের কর্তব্য। তিনি যে-সংবাদ দিয়াছেন তাহা সত্য। তিনি পুরস্কার দিবার যে ওয়াদা ও শাস্তি প্রদানের যে-ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা সবই সত্য। আদেশ, খবর, ওয়াদা, ভীতি-প্রদর্শন, সমস্তই তাঁহার বাণী। তিনি যেমন জীবিত, দর্শনকারী, জ্ঞানময়, শ্রবণকারী ও শক্তিশালী তদ্রূপ তিন বক্তাও বটে। তিনি হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সহিত সরাসরি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথা জিহ্বা, ওষ্ঠ ও মুখগহ্বরে সাহায্যে নহে। মানব- হৃদয়ে যেমন স্বর ও অক্ষর ব্যতীত কথার উদয় হয় তদ্রূপ স্বর ও অক্ষর ব্যতীত আল্লাহর কথা নিষ্পন্ন হওয়া অধিকতর শোভন ও সমীচীন। কুরআন শরীফ, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং আরও যত কিতাব নবী (আ)-গণের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে সবই আল্লাহর বাণী। কথন (কালাম) তাঁহার একটি গুণ। তাঁহার সমস্ত গুণই অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার অস্তিত্ব অনাদি, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে আমরা উপলব্ধি করি এবং রসনা দ্বারা তাঁহার নাম উচ্চারণ করি। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের লব্ধ জ্ঞান ও তাঁহার যিকির সৃষ্ট (مَخْلُوْق) কিন্তু জ্ঞাতব্য বস্তু ও উচ্চারিত বিষয় অনাদি। সেইরূপ তাঁহার কালামও অনাদি। তৎপর ইহা আমাদের অন্তরে রক্ষিত, মুখে পঠিত ও কিতাবে লিখিত হয়। আমাদের অন্তর এর রক্ষিত বিষয় সৃষ্ট নহে, লিখন- কার্যটি সৃষ্ট।

আল্লাহর কার্যাবলীতে বিশ্বাস ঃ বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার সৃষ্ট। যে বস্তুকে তিনি যে আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই ইহার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যদি তাঁহাদের সমস্ত জ্ঞান একত্র করত সমবেতভাবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করেন, যে কৌশলে তিনি উহা সৃষ্টি করিয়াছেন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন অথবা উহাতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা বর্তমান অবস্থা বা আকৃতি অপেক্ষা কোন অবস্থাকেই উৎকৃষ্ট বলিতে পারিবেন না। যদি কেহ মনে করে যে, এই অবস্থা বা আকৃতি অপেক্ষা অন্য অবস্থা উত্তম হইত তবে সে ভুল করিবে এবং আল্লাহর কৌশল ও সৃষ্টি নিয়মের মঙ্গলজনক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এমন লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এক অন্ধ এক গৃহে প্রবেশ করিল। সেই গৃহে প্রত্যেকটি বস্তু সযত্নে শৃঙ্খলার সহিত নিজ নিজ স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু সে দেখিতে পায় না বলিয়া গৃহের কোন জিনিসের সহিত ঠোকর খাইয়া পড়িয়া গেল এবং বলিতে লাগিল–"এই জিনিসটি পথের উপর কেন রাখা হইল?" অথচ সে চলিবে কিরূপে? সে তো পথ দেখিতেই পায় না। আল্লাহ সুবিবেচনা ও সুকৌশলের সহিত যথোপযুক্ত পূর্ণভাবে প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন তেমনই সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন তদপেক্ষা সুন্দর ও পূর্ণভাবে সৃষ্টি সম্ভব হইলে, কিন্তু তেমনভাবে সৃষ্টি না করিয়া থাকিলে ইহাতে সৃষ্টিকর্তার অক্ষমতা ও কৃপণতা প্রকাশ পাইত। অথচ সৃষ্টিকর্তার মধ্যে অক্ষমতা ও কৃপণতা থাকা–একেবারে অসম্ভব। সুতরাং রোগ-শোক, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, দুর্বলতা ইত্যাদি যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সবের মধ্যেই সুবিচার রহিয়াছে। তাঁহার দ্বারা অবিচার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নাম অবিচার, আর অন্যের অধিকরে হস্তক্ষেপ করা আল্লাহর পক্ষে সম্ভবই নহে। কেননা তিনি ভিন্ন অন্য মালিক থাকিতেই পারে না। যাহা কিছু অতীতে ছিল, যাহা কিছু বর্তমানে বিদ্যমান আছে এবং যাহা কিছু ভবিষ্যতে হইবে, ইহাদের সবই তাঁহার অধিকারে একমাত্র তিনিই ইহাদের মালিক। তাঁহার কোন সমকক্ষ ও শরীক নাই।

পরকালে বিশ্বাস ঃ আল্লাহ বিশ্বজগতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা ঃ জড়জগত ও আত্মিক জগত। পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য জড়জগতকে মানবাত্মার আবাসস্থল বানাইয়াছেন এবং জগতে প্রত্যেক মানুষের অবস্থানকাল নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দিষ্ট কালের শেষ সীমা মৃত্যু। এই নির্দিষ্ট কালের পরিমাণে কিছুতেই বেশি বা কম হইতে পারে না। মৃত্যু আসিয়া শরীর হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। শেষ বিচারের দিনে দেহে আবার প্রাণ সঞ্চার করা হইবে এবং সকলকে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান করা হইবে। তখন প্রত্যেকেই কৃতকর্ম

আমলনামায় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবে। সেইদিন দুনিয়াতে সে যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই তাহার স্মরণপটে উদিত হইবে। পাপ-পূণ্য ওজন করিবার উপযোগী দাঁড়িপাল্লায় পাপ-পুণ্য ওজন করিয়া উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। দুনিয়ার মাপ-যন্ত্রের সহিত এই দাঁড়ি-পাল্লার কোন সামঞ্জস্য নাই।

পুলসিরাত ঃ তৎপর পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য সকলকেই আদেশ করা হইবে। ইহা চুল অপেক্ষা সরু এবং তরবারি অপেক্ষা ধারাল। দুনিয়াতে যাহারা শরীয়তের উপর অটল রহিয়াছে তাহারা অনায়াসে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইবে। আর দুনিয়াতে যাহারা শরীয়ত অবলম্বন করে নাই তাহারা পুলসিরাত অতিক্রমে অক্ষম হইয়া দোযখে পতিত হইবে। সকলকে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করাইয়া দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ঈমানদারগণের নিকট হইতে তাহাদের ঈমানের যথার্থতা তলব করা হইবে। মুনাফিক ও রিয়াকারিদিগকে তীব্র লাঞ্ছনা প্রদান করা হইবে। এক শ্রেণীর লোককে বিনা হিসাবে বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইবে। কোন শ্রেণীর লোকের হিসাব-নিকাশ সদয় ও সহজভাবে করা হইবে। আবার কোন শ্রেণীর লোকের হিসাব-নিকাশ কঠিনভাবে করা হইবে। কাফিরদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহারা কখনই মুক্তি পাইবে না। ফরমাবরদার মুসলমানদিগকে সরাসরি বেহেশতে প্রেরণ করা হইবে। পাপী মুসলমানদিগকে দোযখে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হইবে। কিন্তু আম্বিয়া (আ) ও বুযর্গগণ তন্মধ্য হইতে যাহাদের জন্য শাফা'আত করিবেন, পরম করুণাময় আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যাহাদের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিবেন না, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। তাহাদের পাপের পরিমাণে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইবে। তৎপর তাহাদিগকে বেহেশতে আনয়ন করা হইবে।

পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস ঃ আল্লাহ মানুষের কতগুলি কার্যকে তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণ এবং কতগুলিকে তাহাদের সৌভাগ্যের উপকরণরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ বুঝিতে পারে না, কোন কার্যে তাহাদের দুর্ভাগ্য এবং কোন কার্যে সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং তিনি পয়গম্বর (আ)-গণকে পয়দা করত সৃষ্টির আদিতে যাঁহাদের ভাগ্যে পূর্ণ সৌভাগ্যের বিধান হইয়াছে তাঁহাদের নিকট এই রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং লোকের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পথ বাতাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সমস্ত বিশ্বমানবের নিকট প্রেরণ করিলেন। জগতবাসী যেন আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করিতে না পারে তজ্জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন। পরিশেষে নবীকুল শিরোমণি বিশ্বের অবিসংবাদিত সরদার সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির হিদায়েতের জন্য

প্রেরিত হন। তাঁহার নবুয়তকে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণতা গুণে বিভূষিত করত এত উচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়া দিয়াছেন যে, তদপেক্ষা উন্নতি কোন নবীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তিনি এইরূপ গুণে গুণান্বিত হইয়া সর্বশেষ নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার ফলে তাঁহার পরে কিয়ামত পর্যন্ত অপর কোন নবী আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বের সমস্ত জ্বিন ও মানবকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে আম্বিয়া শ্রেষ্ঠ, সকল নবীর সরদার করা হইয়াছে। তাঁহার সাহাবাগণকে অন্যান্য নবীর সহচর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইল্‌ম অন্বেষণ

যে ইল্‌ম অন্বেষণ ফরয ঃ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ -

অর্থাৎ "ইল্‌ম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি ফরয।" কোন্ ইল্‌ম অন্বেষণ করা ফরয সে-সম্বন্ধে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, উক্ত হাদীসের মর্মে ইল্‌মে কালাম শিক্ষা করাই ফরয; কেননা এই শাস্ত্রের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা যায়। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, উক্ত হাদীছে ইল্‌মে ফিকাহ্‌র কথাই বলা হইয়াছে। কারণ ফিকাহ্-শাস্ত্র দ্বারাই হালাল-হারামে পার্থক্য করা যায়। মুহাদ্দিসগণ বলেন, কুরআন ও হাদীসের ইল্‌ম শিক্ষার কথাই ঐ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে; কেননা উহাই শরীয়তের ইল্‌মের মূল। সূফিগণ বলেন, ঐ ইল্‌মের উদ্দেশ্য হইল ইল্‌মে তাসাওওফ। কারণ, একমাত্র আত্মসংশোধন দ্বারাই মানুষ আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হইতে পারে। মোটকথা, প্রত্যেক শ্রেণীর আলিম নিজ নিজ ইল্‌মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উক্ত হাদীসে কোন বিশেষ ইল্‌মের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই অথবা সর্বপ্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয করিয়া দেওয়া হয় নাই। বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক যাহাতে সব মতভেদ দূরীভূত হয়।

মনে কর, প্রাতঃকালে কোন কাফির মুসলমান হইল অথবা কোন নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তৎক্ষণাৎ সব ইল্‌ম শিক্ষা করা তাহাদের উপর ফরয হইয়া পড়ে না। সেই সময় শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার মর্ম অবগত হওয়াই তাহাদের উপর ফরয। এই কলেমার মর্ম এবং ইহার আনুষঙ্গিক যে-সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন আবশ্যক, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বাসসমূহের সপক্ষের প্রমাণাদি অবগত হওয়া আবশ্যক নহে; প্রমাণাদি অবগত হওয়া তাহাদের জন্য ওয়াজিব নহে। তবে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের যাবতীয় গুণাবলী, পরকাল, বেহেশ্‌ত, দোযখের প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তাহাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ এই গুণে বিভূষিত এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই এই

সকল খবর ও নির্দেশাবলী লইয়া রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তশ্‌রীফ আনিয়াছেন। সুতরাং যে-ব্যক্তি তাঁহার আদেশ নিষেধ মানিয়া চলিবে সে-ব্যক্তি মৃত্যুর পর পরম সৌভাগ্য লাভ করিবে এবং যে-ব্যক্তি অমান্য করত পাপকার্য করিবে সে দুর্ভাগ্যে নিপতিত হইবে।

উক্ত প্রকার লোকদের ক্রমশিক্ষণীয় বিষয় ঃ উক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর দুই প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করা নও-মুসলিম ও সদ্য বয়ঃপ্রাপ্তদের উপর ওয়াজিব হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে এক প্রকার আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং অপর প্রকার বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট ইল্‌ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত-(১) করণীয় কার্য সম্বন্ধীয় ইল্‌ম ও (২) বর্জনীয় কার্য সম্বন্ধীয় ইল্‌ম। করণীয় কার্য সম্বন্ধীয় ইল্‌ম এইরূপ—যেমন প্রাতঃকালে কোন কাফির মুসলমান হইল। জোহরের নামাযের সময় হইলে কেবল ফরয পরিমাণ ওযূ-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতা লাভের নিয়ম এবং ফরয নামায আদায় করিবার প্রণালী শিক্ষা করা তাহার উপর ফরয হইবে। যাহা সুন্নত তাহা শিক্ষা করাও সুন্নত, ফরয নহে। মাগরিবের নামাযের সময় হইলে তিন রাকআত ফরয নামায জানা তাহার উপর ফরয হইবে। ইহার অতিরিক্ত জানা ফরয নহে। রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা সম্বন্ধে এতটুকু জানা ফরয হইবে যে, রোযার নিয়ত করা ওয়াজিব এবং সুবেহ্ সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হারাম। বিশটি দীনার হস্তগত হওয়া মাত্রই যাকাত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা ফরয হয় না। কিন্তু এই মুদ্রাগুলি এক বৎসর কাল কাহারও অধিকারে থাকিলে যাকাতের পরিমাণ, যাকাত দিবার উপযুক্ত পাত্র ও ইহার শর্তাবলী অবগত হওয়া তাহার উপর ফরয হইবে। হজ্জে যাওয়ার সময় হজ্জ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা ফরয হয়। কারণ, হজ্জের সময় মৃত্যু পর্যন্ত। এরূপ যখন যে বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই সে-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ফরয হয়; যেমন বিবাহের সময় বিবাহ-সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করা ফরয হইয়া পড়ে—স্বামীর নিকট স্ত্রীর কি কি প্রাপ্য, হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস দুরস্ত নহে, হায়েযের পর গোসলের পূর্বে সহবাস অনুচিত; এতদ্ব্যতীত আরও যে সকল কর্তব্য বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট তৎসমুদয়ের জ্ঞান লাভ করা ফরয হয়। যে ব্যক্তি যে পেশা অবলম্বন করে সে-পেশা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা তাহার উপর ফরয হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবসায়ীদের সুদের মাস্‌'আলা ও ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানসমূহ জানিয়া লওয়া ফরয। কারণ, এইগুলি জানা থাকিলে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ব্যাপারে হারাম কার্য হইতে বাঁচা যায়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু প্রয়োজন হইলে চাবুক মারিয়া দোকানদারগণকে ইল্‌ম শিক্ষা করিতে পাঠাইতেন এবং বলিতেন ঃ "যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-নিষেধ না জানে তাহার ব্যবসায় করা উচিত নহে। ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান জানা না থাকিলে অজ্ঞাতসারে সুদ খাইবে, অথচ এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানিবে না।" এইরূপ প্রত্যেক পেশারই নির্দিষ্ট

বিধান আছে। এমন কি নাপিতের জানা উচিত, মানব-শরীরের কোন্ জিনিস কাটিবার উপযোগী, দাঁতে পীড়া হইলে কিরূপে পীড়াগ্রস্ত দাঁত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয় এবং কি পরিমাণে ঔষধে ক্ষতস্থান আরোগ্য হয় এবং এবম্বিধ অন্যান্য বিষয়ও তাহার জানা আবশ্যক। (পূর্বকালে এই-সকল কাজও নাপিতেরাই করিত)। নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা করা সকল লোকের উপরই অবশ্য-কর্তব্য। নাপিতের উপর বস্ত্র-ব্যবসায়ীর বিদ্যা এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীর উপর নাপিতের বিদ্যাশিক্ষা করা ফরয নহে। করণীয় কর্মের জ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ উপরে দেওয়া হইল।

এইরূপ বর্জনীয় কর্মের জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। কিন্তু লোকের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কোন ব্যক্তিকে রেশ্‌মী কাপড় পরিধান করিতে, মদ্যপায়ী বা শূকরের মাংস ভক্ষণকারীর সহিত কিংবা বলপূর্বক অন্যের অধিকৃত স্থানে বাস করিতে অথবা হারাম মাল নিজের অধিকারে রাখিতে ও এবম্বিধ শরীয়ত বিগর্হিত কার্য করিতে কোন আলিম দেখিতে পাইলে তাহাকে উহা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কার্য যে হারাম ইহা জানাইয়া দেওয়া উক্ত আলিমের উপর ওয়াজিব হইয়া পড়ে। কোন স্থানে নারী পুরুষ একত্রে বাস করিতে হইলে কোন্ নারী মহ্‌রম, কে মহ্‌রম নহে এবং কাহাকে দেখা জায়েয ও কাহাকে দেখা জায়েয নহে জানিয়া লওয়া ফরয। এ সমস্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা লোকের অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন হইয়া থাকে। কারণ, এক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য অপর লোকের কর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা ফরয নহে; যেমন হায়েযের অবস্থায় তালাক দেওয়া অনুচিত, ইহা জানা স্ত্রীলোকের প্রতি ফরয নহে; তালাক দিতে ইচ্ছুক পুরুষের উপর তালাকের মাস্‌'আলা জানা ফরয।

আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্রমশিক্ষণীয় ইল্‌ম ঃ আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ইল্‌মও দুই ভাগে বিভক্ত (১) হৃদয়ের অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ও (২) ধর্মবিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। হিংসা-বিদ্বেষ, মন্দ ধারণা ইত্যাদি কু-স্বভাবগুলির সম্বন্ধ হৃদয়ের সহিত। এই সকল কুস্বভাব পোষণ করা হারাম। এইগুলিকে হারাম বলিয়া জানাও প্রত্যেকের উপর ফরয। কারণ, কেহই এই সকল স্বভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না। এই চরিত্রগত পীড়াগুলি ব্যাপক। সুতরাং ইহাদের প্রকৃত পরিচয় এবং এইগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা অবগত হওয়াও ফরয। কারণ, রোগের পরিচয় না জানিলে ঔষধের ব্যবস্থা করা যায় না। অপরপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, রেহেন প্রভৃতি লেনদেন সম্পর্কীয় ফিকাহ্ শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহ জানা ফরযে কিফায়াহ্; সকলের উপর ফরয নহে। যাহারা এই সকল কার্য করিতে ইচ্ছুক কেবল তাহাদের উপরই এই জ্ঞান লাভ করা ফরয। এই সকল কার্য সকল লোকের ব্যবসায় নহে; তন্মধ্য হইতে একটি, কেহ বা একাধিক অবলম্বন করিয়া থাকে।

ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রমশিক্ষণীয় ইল্‌মের দৃষ্টান্ত এই—কাহারও ধর্ম-বিশ্বাসের যদি কোনরূপ সন্দেহ জন্মে এবং ইহা কোন ওয়াজিব জাতীয় বিশ্বাসের সম্বন্ধে জাগিয়া থাকে অথবা এই সন্দেহ পোষণ করা যদি নাজায়েয হয়, তবে তাহা অন্তর হইতে দূর করা ফরয। অতএব বুঝা গেল যে, বিভিন্ন বিষয়ের ইল্‌ম বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ফরয হইলেও মোটের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। কারণ, ইল্‌মের অভাব ও প্রয়োজনীয়তা কমবেশি প্রত্যেকেরই আছে। আবার ইল্‌ম এক প্রকার নহে এবং সকলের জন্য ইল্‌মের আবশ্যকতাও সমান নহে। বরং অবস্থা ও কালভেদে এই আবশ্যকতার পরিবর্তন হইয়া থাকে। আর ইল্‌মের আবশ্যকতা নাই এইরূপ লোক কেহই নাই। এইজন্যই রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরূপ কোন মুসলমানই নাই যাহার উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয নহে; অর্থাৎ যাহার যে ইল্‌মের প্রয়োজন সে ইল্‌ম শিক্ষা করাই তাহার উপর ফরয।

অজ্ঞতার আপত্তি অগ্রাহ্য ঃ উপরের বিবরণ হইতে জানা গেল যে, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যখন যাহার যে-ব্যবসায় অবলম্বনের আবশ্যক হয় তখনই সেই সম্বন্ধীয় ইল্‌ম হাসিল করা তাহার উপর ফরয হইয়া পড়ে। আরও বুঝা গেল যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সব সময়ই রহিয়াছে। কারণ, তাহাদের সম্মুখে কোন কাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে পাপ-পুণ্যের বিচার না করিয়া অজ্ঞতাবশত তাহারা উহা নিঃসঙ্কোচে করিয়া বসে। এরূপ কার্য বিরল নহে এবং তাহাদের সম্মুখে প্রায়ই আসিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় পাপ কার্য করিয়া অজ্ঞতার আপত্তি পেশ করিলে তাহা মোটেই গ্রাহ্য হইবে না। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, হায়েযের অবস্থা বা হায়েযের পর গোসলের পূর্বে কোন ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করিয়া যদি বলে, ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া আমি জানিতাম না, তবে তাহার এই অজ্ঞতার ওযর মোটেই গ্রাহ্য হইবে না। কোন স্ত্রীলোক ফজরের পূর্বে হায়েয হইতে পাক হইয়া যদি পূর্ববর্তী মাগরিব ও ইশার নামাযের কাযা আদায় না করিয়া বলে, এই কাযা আদায় করিতে হইবে বলিয়া আমার জানা ছিল না[১] অথবা কোন ব্যক্তি হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়া যদি বলে, ইহা হারাম বলিয়া আমি জানিতাম না, তবে তাহাদের অজ্ঞতার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয, তবুও ইল্‌ম শিক্ষা না করিয়া হারামে নিপতিত হইলে কেন? কিন্তু যে কাজ অতি বিরল, কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, তাহা অজ্ঞতাবশত

(১) এমতাবস্থায় হানাফী মযহাব মতে মাগরিবের নামায কাযা আদায় কারিতে হইবে না।—অনুবাদক।

শরীয়ত খেলাপ করিয়া বসিলে এমন ক্ষেত্রে ওযর-আপত্তি গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোটকথা, অজ্ঞতাবশত নাজায়েয কার্য অবলম্বনপূর্বক পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা হইতে সাধারণ লোক কখনই নিরাপদ নহে। সুতরাং ইল্‌ম অন্বেষণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহৎ কাজ মানুষের আর নাই।

ইল্‌মের কারণে জীবিকার্জন হইলে ইহাই অন্যান্য ব্যবসা হইতে উত্তম ঃ দুনিয়ার জন্যই মানুষ পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই কারণে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইল্‌ম উত্তম পেশা; কেননা, ইল্‌ম-শিক্ষার্থীদের চারিটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণী, ওয়ারিস বা অন্য কোন সূত্রে যাহারা যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নিশ্চিন্ত মনে ইল্‌ম শিক্ষা করিতে পারে। ইল্‌মের সাহায্যে তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা পাইয়া থাকে এবং ইল্‌মই দুনিয়াতে তাহাদের সম্মান ও আখিরাতে তাহাদের সৌভাগ্যের কারণ। দ্বিতীয় শ্রেণী, যাহাদের যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা লইয়াই তাহারা পরিতুষ্ট এবং 'দরিদ্র মুসলমান ধনী মুসলমানদের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে' এই মরতবা তাহারা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়াছে। ইল্‌ম তাহাদের জন্য দুনিয়াতে সুখ ও আখিরাতে সৌভাগ্যের কারণ হইবে। তৃতীয় শ্রেণী, যাহারা মনে করে, ইল্‌ম শিক্ষা করিলে সরকারী ধনভাণ্ডার অথবা মুসলমানদের নিকট হইতে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী হালাল মাল মিলিবে এবং হারাম মাল অন্বেষণ ও জালিম বাদশাহের নিকট কিছু যাচ্‌ঞা করিতে হইবে না। এই তিন শ্রেণীর ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইল্‌ম অন্বেষণই দুনিয়ার সর্ববিধ পেশা হইতে উত্তম। চতুর্থ শ্রেণী, যাহারা দরিদ্র; কিন্তু দুনিয়া অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে। আর যমানাও এমন হয় যে, সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে আলিমকে কোন বৃত্তি দেওয়া হয় না। সুতরাং হারাম মাল গ্রহণ বা অন্যায়ভাবে জীবিকা অর্জন করিতে হয়; অথবা সমাজ দরিদ্র আলিমের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে না এবং জীবিকা অর্জনের অন্য উপায় নাই বলিয়া কপট ধার্মিক সাজিয়া কিংবা আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তবে এমন লোকের পক্ষে এবং যাহারা মান-সম্মান, ধন-সম্পত্তি লাভের জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করে ও অর্জিত ইল্‌মের সাহায্যে মান-সম্মান ও ধন-সম্পত্তিই অর্জন করিবে, তাহাদের জন্য যে পরিমাণ ইল্‌ম তাহাদের উপর ফরয তাহা শিক্ষা করত অপর কোন অর্থকরী শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদি অবলম্বন করাই শ্রেয়। অন্যথায় এই শ্রেণীর আলিম অপর লোকের জন্য মানবরূপ শয়তানে পরিণত হইবে এবং বহু লোক তাহার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত পথভ্রষ্ট হইবে। কারণ, এইরূপ আলিমকে হারাম মাল গ্রহণ করিতে ও নানা প্রকার টালবাহানা করত হারামকে জায়েয করিতে দেখিয়া মূর্খ লোকে দুনিয়ার লাভের জন্য তাহার অনুসরণ করিবে। ফলে সৎপথ প্রদর্শনের পরিবর্তে গোমরাহী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই শ্রেণীর আলিম যত কম হইবে ততই মঙ্গল;

কারণ, আবর্জনা যত কম হয় দুনিয়া ততই পরিষ্কার থাকে। সুতরাং যাহারা দুনিয়া অর্জন করিতে চায়, দুনিয়ার কার্য দ্বারাই ইহা হাসিল করা তাহাদের পক্ষে শ্রেয়; কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই আল্লাহ্‌র নাম লওয়া উচিত এবং দীনের কার্যের ভান করিয়া দুনিয়া হাসিল করা উচিত নহে; উজ্জ্বল রত্নকে নাপাকি দ্বারা পূর্ণ করা অনুচিত।

ইল্‌মই সৎপথে পরিচালিত করিবে, এ ভ্রম নিরসন ঃ কেহ হয়ত বলিবে, দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করিলেও তাহাকে দুনিয়া হইতে ফিরাইয়া লইবে। যেমন প্রাচীন কালের লোক বলিয়াছেন, "আমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করি নাই; কিন্তু স্বয়ং ইল্‌ম আমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে লইয়া গিয়াছে।" ইহার উত্তর এই—তাঁহারা যে ইল্‌মের কথা বলিয়াছেন তাহা নিছক কুরআন হাদীসের ইল্‌ম এবং আখিরাত ও শরীয়তের ইল্‌ম ছিল। এই ইল্‌মই তাঁহাদিগকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তরও আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া থাকিত এবং দুনিয়ার লোভ লালসার প্রতি তাঁহাদের মনে ঘৃণা ছিল। তদুপরি সেই যুগে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বুযর্গের সংখ্যাও কম ছিল না। সুতরাং এই সকল বুযর্গের অনুকরণ-অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহাদের মনে অনুরাগ জন্মিত। সেই কালে লোকেরা কুরআন-হাদীসের ইল্‌মই শিক্ষা করিত এবং যমানাও তাহাদের অনুকূল ছিল। এজন্যই লোকে আশা করিত যে, স্বয়ং ইল্‌মই ইল্‌ম-শিক্ষার্থীকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করিবে এবং ইল্‌ম তাহাদের মন জয় করিয়া লইবে। কিন্তু আজকাল ধর্ম-বিরোধী দর্শন, সাহিত্য তর্ক-শাস্ত্র, উপন্যাস ও চরিত্র ধ্বংসমূলক অশ্লীল প্রেম-কাহিনী অধ্যয়ন করা হইয়া থাকে। আর শিক্ষকগণও নিজ নিজ বিদ্যাকে দুনিয়া হাসিলের ফাঁদ করিয়া লইয়াছে; ভুলেও তাহাদের মন ধর্ম-কর্মের দিকে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাহাদের সঙ্গ, শিক্ষা ও আদর্শ মানুষকে কখনও দুনিয়ার মোহ হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। পূর্ব যমানার লোকদের অবস্থা শোনা গিয়াছে এবং এ-যমানার বিদ্যা ও বিদ্বানদের অবস্থা দেখা গিয়াছে। শ্রুত কখনই দৃষ্টের তুল্য হইতে পারে না। এ-যমানা আর পূর্ব যমানা সমান হইতে পারে না।

আবার ভাবিয়া দেখ, এ যমানার আলিমগণ দুনিয়াদার, না দীনদার এবং তাহাদের কার্যাবলী দেখিয়া লোকের উপকার হইতেছে, না অপকার। মোটকথা, এ যমানার অধিকাংশ আলিমই দীনদার আলিম নহে এবং তাহাদের কার্যাবলী দেখিয়া ধর্মের দিক দিয়া মানব-সমাজের অপকারই হইতেছে। কিন্তু পূর্বকালের বুযর্গগণের পদাঙ্ক অনুসরণকারী মুত্তাকী পরহেযগার আলিম যদি এমন ইল্‌ম শিক্ষা দেন যাহা দুনিয়ার মোহ ও প্রতারণা হইতে ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকে, তবে তাঁহার নিকট হইতে ইল্‌ম শিক্ষা অসীম কল্যাণকর; এমনকি এরূপ আলিমের সংসর্গও অতীব উপকারী এবং তাঁহার দর্শন-লাভও পারলৌকিক সৌভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ উপকারী ইল্‌ম শিক্ষা করা জগতের অন্যান্য যাবতীয় কাজ হইতে উত্তম।

কল্যাণকর ইল্‌ম ঃ যে ইল্‌ম শিক্ষা করিলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও আখিরাতের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, যে ইল্‌মের সাহায্যে লোকে আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়াদারদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা বুঝিতে পারে এবং অহংকার, রিয়া, হিংসা, আত্মগর্ব, লোভ ও সংসারাসক্তির আপদসমূহ অবগত হইয়া এইগুলি দূরীকরণের উপায় জানিতে পারে, তাহাই কল্যাণকর ইল্‌ম। এইরূপ ইল্‌ম তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পক্ষে ঠাণ্ডা পানি স্বরূপ এবং পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ সদৃশ। দুনিয়া-লোভী ব্যক্তি যদি এমন বিদ্যা শিক্ষা করে যাহা দুনিয়ার প্রতি মনে ঘৃণার উদ্রেক করে না, যেমন ফিকাহ্-শাস্ত্র এবং ধর্ম-বিরোধী তর্ক-শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি তবে সে এমন পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যে কুপথ্য গ্রহণ করত পীড়া আরও বাড়াইয়া দেয়। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল শাস্ত্র হিংসা, রিয়া, গর্ব, শত্রুতা, আত্ম-প্রশংসা, প্রবঞ্চনা, প্রভুত্ব-লালসা, ধনাসক্তি প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বীজ অন্তরে রোপণ করে। এই শাস্ত্রগুলি যত অধিক অধ্যয়ন করা যায় ততই উক্ত কুপ্রবৃত্তিসমূহ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। যাহারা ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া দাবি করে এবং ধর্ম-বিরোধী শাস্ত্রচর্চায় মশগুল থাকে, তাহাদের সংসর্গে থাকিলে লোকে এত হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে যে, তথা হইতে তাহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং তওবা করিয়া ঠিক পথ অবলম্বন করাও তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারিগণ ও অত্যধিক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদিগকে ভালবাসেন।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -

অর্থাৎ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" হাদীস শরীফে আরও উক্ত আছে ঃ

بُنِيَ الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ -

অর্থাৎ "পবিত্রতা ধর্মের ভিত্তি।" এই বাণীগুলির মর্ম ইহা বুঝিও না যে, শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এইরূপ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হইয়াছে।

পবিত্রতার শ্রেণীভেদ ঃ পবিত্রতা চারি প্রকার

প্রথম—আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে হৃদয় পবিত্র রাখা। এই মর্মে আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ অর্থাৎ "বল, আল্লাহ্; তৎপর অন্য সব কিছু পরিত্যাগ কর।" এই নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু অন্তরে স্থান না পাইলে লোকে আল্লাহ্‌র চিন্তায় ও প্রেমে লিপ্ত ও বিভোর থাকিতে পারে। ইহাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্,' কলেমার প্রকৃত মর্ম। সিদ্দিকগণের ঈমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে অন্তর পাক করাকেই ঈমানের অর্ধাংশ বলা হইয়াছে; অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সবকিছু হইতে পাক করাই হইল ঈমানরূপ দেহের প্রাণ। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সবকিছু হইতে হৃদয় পাক না হওয়া পর্যন্ত ইহা তাঁহার যিকির দ্বারা সুশোভিত হওয়ার যোগ্য হয় না।

দ্বিতীয়—হিংসা, অহংকার, রিয়া, লোভ, শত্রুতা, আত্মগর্ব প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি অন্তর হইতে দূর করত তদস্থলে বিনয়, অল্পে তুষ্টি, তওবা, ধৈর্য, আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁহার

রহমত লাভের আশা, আল্লাহ্‌র মহব্বত ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী অর্জন করত অন্তরকে অলংকৃত করা। মুত্তাকী লোকদের ঈমান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ-স্থলে অসৎ স্বভাব হইতে অন্তরকে পবিত্র করাই ঈমানের অর্ধাংশ।

তৃতীয়—গীবত, মিথ্যা কথন, হারাম, ভক্ষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, মহ্‌রম স্ত্রীলোক-দর্শন ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা এবং যাবতীয় পাপকর্ম হইতে হস্ত-পদ প্রভৃতি সকল বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখা যেন সকল বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত কার্যে শরীয়তের আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে। সংসার-বিরাগিগণের ঈমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ-স্থলে বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সকল হারাম কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখাই ঈমানের অর্ধাংশ।

চতুর্থ—পরিধেয় বস্ত্র ও শরীরকে সকল অপবিত্রতা হইতে পাক রাখা যেন নামায আদায় করা চলে। ইহাই মুসলমানদের পবিত্রতার সর্বনিম্ন সোপান। কারণ, সাংসারিক কর্মব্যস্ততার সময় নামায দ্বারাই মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রকার পবিত্রতাও ঈমানের অর্ধাংশ। সুতরাং দেখা গেল যে, চারি শ্রেণীর ঈমানের প্রত্যেকটিতেই পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আর পবিত্রতাই ইহার প্রথমার্ধ বলিয়াই রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'পবিত্রতা ধর্মের ভিত্তি।'

শারীরিক পবিত্রতার দিকে অধিক আগ্রহের কারণ ঃ উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতা সর্বনিম্ন শ্রেণীর পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত; অথচ সকলেই এই পবিত্রতা অর্জনে তৎপর এবং ইহার জন্যই সকল চেষ্টা তদবীর করা হয়। বাহ্য পবিত্রতার দিকে লোকে এত নিবিষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, সর্বপ্রকার পবিত্রতা হইতে ইহাই সহজতম এবং প্রবৃত্তিও ইহা লাভ করিয়া আনন্দিত হয় ও আরাম বোধ করে। আবার লোকেও বাহ্য পবিত্রতাই দেখিয়া থাকে এবং ইহা দেখিয়াই মানুষকে ধর্মপরায়ণ বলিয়া মনে করে। এই সমস্ত কারণেই বাহ্য পবিত্রতা মানুষের জন্য এত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে হিংসা, অহংকার, রিয়া, আনন্দ ও আরাম পায় না; অধিকন্তু এই আভ্যন্তরিক পবিত্রতার প্রতি অপর লোকের দৃষ্টিও পড়ে না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্‌ই ইহা দর্শন করেন, মানুষ ইহা দেখিতে পারে না। এই সমস্ত কারণেই আভ্যন্তরিক পবিত্রতা সাধনে মানুষ আগ্রহশীল হয় না।

বাহ্য পবিত্রতার ফযীলত ও শর্তাবলী ঃ বাহ্য পবিত্রতা যদিও নিম্নতম শ্রেণীর পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত তথাপি অস্‌অসার বশীভূত না হইয়া ও বাড়াবাড়ি না করিয়া যথানিয়মে সম্পন্ন করিলে ইহাতে বড় ফযীলত রহিয়াছে। বাড়াবাড়ি করিলে মকরূহ হইবে, এমন কি বাড়াবাড়িকারী পাপী হইবে। সূফীগণ বাহ্য পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পাজামা পরিধান করেন, গায়ে চাঁদর ধারণ করেন এবং পানির

পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের ব্যবহারের পানি বা পানির পাত্র অন্যকে স্পর্শ করিতে দেন না। এইগুলি উত্তম কার্য। কিন্তু ফিকাহ্ শাস্ত্রের আলিমগণ এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাই বলিয়া সূফিগণের তদ্রূপ সতর্কতার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ করা উচিত নহে। অপর পক্ষে ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী যাহারা পবিত্রতা সাধন করে তাহাদের বিরুদ্ধেও সূফীদের প্রতিবাদ করা অনুচিত। পবিত্রতা সাধনে সতর্কতা অবলম্বন উত্তম; কিন্তু তজ্জন্য ছয়টি শর্ত মানিয়া চলা আবশ্যক।

প্রথম শর্ত ঃ বাহ্য পবিত্রতা সাধনে এতটুকু বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে, যাহার কারণে অধিক সময় নষ্ট হইয়া কোন মহৎ কার্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। কেহ হয়ত ইল্ম অর্জনে মশগুল থাকিতে পারেন, কেহ বা আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু অধিক মাত্রায় উন্মিলিত হয়, আবার কেহ বা জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা রাখেন এবং ইহার করিয়া নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের অভাব মোচন করিতে পারেন, পরের গলগ্রহ ও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। পবিত্রতা সাধনে সতর্কতা অবলম্বনের দরুন অধিক সময় নষ্ট হওয়ার কারণে এই সকল কার্য হইতে যদি তাঁহাকে বঞ্চিত থাকিতে হয় তবে তাঁহার পক্ষে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত নহে। কারণ, এই সকল কার্য পবিত্রতা সাধনে সতর্কতা অবলম্বন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এইজন্যেই সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম বাহ্য পবিত্রতা সাধনের সতর্কতামূলক কার্যে লিপ্ত থাকিতেন না। কেননা, তাঁহারা জিহাদ, জীবিকা অর্জন, ইল্ম অন্বেষণ ইত্যাদি জরুরী কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। এইজন্যই তাঁহারা নগ্ন পদে চলিতেন, যমীনের উপর নামায আদায় করিতেন, মাটির উপর বসিতেন, আহারের পর পায়ের তলায় হাত মুছিয়া লইতেন, ঘোড়া, উট প্রভৃতি বাহন-পশুর ঘামে সিক্ত হইলে ধুইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। অন্তরের পবিত্রতা সাধনের জন্য তাঁহারা অত্যধিক চেষ্টা করিতেন; শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁহাদের খেয়াল ছিল না। কোন ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর গুণে গুণান্বিত হইলে তৎপ্রতি বাহ্য পবিত্রতা বিষয়ক সতর্কতা অবলম্বনের প্রশ্ন উত্থাপন করা সূফিগণের পক্ষে শোভা পায় না। আবার যে ব্যক্তি অলসতা ও শিথিলতাবশত সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাহার পক্ষে সতর্কতা অবলম্বনকারী সূফীদের প্রতি প্রতিবাদ করাও অশোভন। কারণ, সতর্কতা অবলম্বন করা সতর্কতা অবলম্বন না করা অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ নিজকে রিয়া ও আত্মগর্ব হইতে বাঁচাইয়া রাখা কর্তব্য। কারণ, সতর্কতা অবলম্বনকারীর আপাদমস্তক প্রকাশ করিতে থাকে, "আমি সূফী দরবেশ, আমি পবিত্রতা বিষয়ে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকি।" আর এইরূপ সতর্কতার কারণে তাহারা লোকের নিকট সম্মান পায়। লোক-চক্ষে তাহাদের

সম্মান-লাঘব হইবে বলিয়া তাহারা নগ্ন পদ মাটিতে স্থাপন করিতে বা অপরের লোটা ব্যবহার করিতে সংকোচ বোধ করে। এইরূপ ব্যক্তির আত্মপরীক্ষা করা উচিত। লোকের সম্মুখে নগ্ন পদে চলাফেরা করিয়া ও সতর্কতা বর্জন করত জায়েয বিধান অবলম্বনপূর্বক অন্তরে গোপনে পবিত্রতা সাধনের সতর্কতা করিলে যদি তাহার মন এই ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ করিয়া বাহ্য পবিত্রতা প্রদর্শনের জন্য লালায়িত হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহাকে রিয়া পাইয়া বসিয়াছে। এমতাবস্থায় সতর্কতা পরিত্যাগ করত খালি পায়ে চলাফেরা করা ও মাটির উপর নামায আদায় করা ওয়াজিব। কারণ রিয়া হারাম ও সতর্কতা মুস্তাহাব। সতর্কতা বর্জন না করিয়া যদি রিয়া হইতে রক্ষা না পাওয়া যায় তবে সতর্কতা বর্জন করা ওয়াজিব।

তৃতীয় শর্ত ঃ সতর্কতাকে অবশ্য-কর্তব্য করিয়া লওয়া উচিত নহে। মাঝে মধ্যে সতর্কতা বর্জন করত জায়েয পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যেমন রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক মুশরিকের বর্তন দ্বারা ওযূ করিয়াছিলেন এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক মূর্তিপূজক স্ত্রীলোকের লোটায় ওযূ করিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রায়ই মাটির উপর নামায পড়িতেন এবং যে ব্যক্তি বিছানা ব্যতিরেকে মাটির উপর শয়ন করিতেন তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। যাহারা তাঁহাদের অভ্যাস বর্জন করে তাহারা সৌভাগ্য বঞ্চিত; তাহার ঐ সকল বুযুর্গের অনুসরণ করিবে না। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সতর্কতা অবলম্বনে তাহাদের মন আনন্দ পায় এবং লোকচক্ষে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই সতর্কতা বর্জন তাহাদের জন্য দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ শর্ত ঃ যে সতর্কতা অবলম্বন করিলে অপর মুসলমানের মনে দুঃখ হয় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, মুসলমানের মনে দুঃখ দেওয়া হারাম, সতর্কতা বর্জন হারাম নহে। কোন ব্যক্তি সালামের পর মুসাফাহা বা মুআনাকাহ্ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তাহার শরীরের ঘর্ম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে সরিয়া যাওয়া হারাম। বরং শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক মুসলমানদের পরস্পর মিলন শত-সহস্র সতর্কতা হইতে উত্তম। এইরূপ একজন অপরজনের জায়নামাযে দাঁড়াইতে কিংবা লোটা দ্বারা ওযূ অথবা গ্লাসে পানি পান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দেওয়া ও ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত নহে। রাসূলে মাকবূল (সা) একবার যমযমের পানি চাইলে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), পূর্বোত্তোলিত পানিতে বহু লোকে হাত ডুবাইয়াছে ইহা ঘোলা হইয়া গিয়াছে। একটু অপেক্ষা করুন; আমি আপনার জন্য একটি পৃথক বালতি আনিয়া পানি উঠাইয়া দিতেছি।" হুযুর (সা) বলিলেন ঃ "না, আমি মুসলমানগণের হাতের বরকত লাভ করাকে পছন্দ করি।" লেখা-পড়া জানা বহু মূর্খ এই সকল বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করে না এবং যে ব্যক্তি সতর্কতা অবলম্বন করে না তাহার নিকট ঘেঁষে না ও তাহার মনে ব্যথা দেয়।

এমনকি, তাহাদের মাতাপিতা ও বন্ধুবান্ধব তাহাদের লোটা বা বস্ত্র স্পর্শ করিতে চাহিলেও তাহারা কর্কশ বাক্য বলিয়া উঠে। এই সমস্তই হারাম। সতর্কতা ওয়াজিব নহে; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাইয়া তদ্রূপ ব্যবহার করা কিরূপে জায়েয হইতে পারে? বাহ্য পবিত্রতা সাধনে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের অধিকাংশের মনেই অহংকার জাগে। তাহারা যেন গর্বিত হইয়া বলে ঃ "আমরা এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছি এবং সাধারণ লোকদিগকে আমাদের নিকট ঘেঁষিতে না দিয়া মনঃকষ্ট প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে পবিত্রতার পথে চালাইতেছি।" তাহারা তাহাদের পবিত্রতার বিষয় প্রচার করিয়া নিজেদের গৌরব ঘোষণা করে এবং তদ্‌সঙ্গে অপরের নিন্দা করিয়া বেড়ায়। সাহাবা (রা)-গণ যে সরল পথে চলিতেন এই মূর্খগণ সেই পথ অবলম্বন করে না। এই নির্বোধগণ শুধু ঢিলা-কুলূখ দ্বারা ইস্তেঞ্জা করাকে কবীরা গুনাহ বলিয়া মনে করে। এই সমস্তই তাহাদের মন্দ স্বভাব। এমন স্বভাবের লোকের হৃদয় অপবিত্রতায় পূর্ণ। হৃদয়কে এই সকল মন্দ স্বভাব হইতে পবিত্র রাখা ফরয। কারণ, এই সমস্ত ধ্বংসের উপকরণ এবং পবিত্রতা সাধনে বাড়াবাড়ি বর্জন ধ্বংসের উপকরণ নহে।

পঞ্চম শর্ত ঃ পানাহার ও কথনে সতর্কতা অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক। আবশ্যক কার্য বর্জনপূর্বক অনাবশ্যক কার্যে সতর্কতা অবলম্বন করিলে হৃদয়ের অহংকার প্রমাণিত হয় অথবা এইরূপ সতর্কতা অভ্যাসগত বলিয়াই বুঝা যায়; যেমন কেহ হয়ত অল্প ক্ষুধায়ই আহার করে, ইহাতে কোনই সতর্কতা অবলম্বন করে না। অথচ আহারের পর সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক হাত-মুখ ধৌত না করিয়া নামায পড়ে না। সে অবগত নহে যে, নাপাক দ্রব্য খাওয়া হারাম। যদি নাপাকই হয় তবে অনাবশ্যক আহার করে কেন? আর পবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া হাত-মুখ প্রক্ষালণের জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন? হাত-মুখ তো ধৌত করিল, কিন্তু সর্বসাধারণের জায়নামাযে নামায পড়ে না কেন? আবার সর্বসাধারণের গৃহে প্রস্তুত খাদ্য আগ্রহ সহকারে আহার করে কেন? এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে না কেন? অথচ খাদ্যদ্রব্যের পবিত্রতা বিষয়ে সতর্কতা নিতান্ত আবশ্যক। ঐরূপ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যাহারা করে তাহাদের অধিকাংশই বাজারে প্রস্তুত খাদ্য দোকানে বসিয়াই গলধঃকরণ করে; কিন্তু সেই দোকানদারদের বিছানায় নামায পড়ে না। এইরূপ ব্যক্তি সতর্কতা অবলম্বনে খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাইয়া কোন হারাম কার্য সংঘটিত না হয় তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেমন, সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক তিনবারের অধিক কোন অঙ্গ ধৌত করা সঙ্গত নহে; কারণ, তিন বারের অধিক ধৌত করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ ওযূ-গোসলে বিলম্ব করিয়া অধিক সময় ক্ষেপণ করাও উচিত নহে। কেননা, অপর মুসলমান তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতে পারে। অধিক পরিমাণে পানি অপচয়

করাও নিষেধ। সন্দেহের কারণে একই অঙ্গ বারবার ধৌত করত সময় নষ্ট করিয়া বিলম্বে নামায পড়াও সঙ্গত নহে। এইরূপ শূচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া মুক্তাদীদিগকে জামাআতের জন্য আটকাইয়া রাখাও ইমামের উচিত নহে। কোন মুসলমানের সহিত কোন বিষয়ে ওয়াদা করিয়া তাহা পূরণ করিতে ওযূ-গোসলের বাড়াবাড়ির জন্য বিলম্ব করিলে সময় নষ্ট হওয়ার দরুন সে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং এই কারণে তাহার পরিবার-পরিজন কষ্ট পাইতে পারে। অনাবশ্যক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এই প্রকার কাজ কখনও জায়েয হইতে পারে না। অন্যের বস্তু শরীরে লাগিবে বলিয়া নিজের জায়নামায মসজিদে খুব প্রশস্ত করিয়া বিছাইয়া লওয়াও সঙ্গত নহে। তিন কারণে ইহা নিষিদ্ধ (১) সিজদার জন্য আবশ্যক পরিমাণ স্থান প্রত্যেক মুসল্লীরই প্রাপ্য। প্রশস্ত করিয়া জায়নামায বিছাইলে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক স্থান অপর মুসল্লী হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। (২) কাতারে নামাযীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়ান সুন্নত। কিন্তু তদ্রূপ জায়নামায বিছাইলে উভয় পার্শ্বে ফাঁক থাকিয়া যায়। (৩) নিজের শরীর ঘেঁষিয়া অপর নামাযীকে দাঁড়াইতে না দিলে বুঝা যায় যে, অন্যান্য নামাযীকে কুকুর ও অপরাপর নাপাক বস্তুর ন্যায় পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করা হয়। ইহা নিতান্ত অনুচিত। আলিম-মূর্খদের এমন এক দল লোক আছে যাহারা বাহ্য পবিত্রতা বিধানে বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়া এই প্রকার বহু গর্হিত কার্য করিয়া থাকে এবং এইগুলিকে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে না।

উপরের বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, বাহ্য পবিত্রতা হইতে আভ্যন্তরিক পবিত্রতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আভ্যন্তরিক পবিত্রতা তিন প্রকার ঃ (১) শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে পাপ হইতে পবিত্র রাখা; (২) মন্দ স্বভাব হইতে হৃদয়ের প্রকাশ্য অংশ পবিত্র রাখা এবং (৩) হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগকে এক আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চিন্তা হইতে পবিত্র রাখা। এখন অবগত হও যে, বাহ্য পবিত্রতাও তিন প্রকার, (১) মলমূত্রাদি, নাপাক জিনিস হইতে শরীর পবিত্র রাখা, (২) ওযূ ভঙ্গ এবং স্ত্রী-সঙ্গম ও শুক্রপাতের কারণে শরীর অপবিত্র হইলে ওযূ-গোসল দ্বারা পবিত্রতা অবলম্বন এবং (৩) নখ, কেশ, ময়লা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় উহা দূর করত শরীর পবিত্র করা।

মলমূত্রাদি হইতে পবিত্রতা ঃ জড় পদার্থের ন্যায় যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন উহার সবগুলিই পবিত্র। কিন্তু মদ যাহা পান করিলে নেশা হয়, তাহা অল্পই হউক আর বেশিই হউক অপবিত্র। কুকুর ও শূকর ব্যতীত সমস্ত প্রাণীই পাক। সমস্ত মৃত প্রাণীই নাপাক কিন্তু মানুষ, মাছ ও টিড্ডী (একপ্রকার ফড়িং যাহা ফসল নষ্ট করে), প্রবহমান রক্তবিহীন প্রাণী যেমন মাছি, মৌমাছি, বিচ্ছু এবং খাদ্যশস্যে উৎপন্ন কীটের মৃতদেহ অপবিত্র নহে। যে বস্তু উদরে গিয়া রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হইয়া

গিয়াছে উহার সমস্তই নাপাক; কিন্তু যাহা প্রাণীদেহের মূল যেমন শুক্র, (হানাফী মযহাব মতে প্রাণীর শুক্রও অপবিত্র), পাখির ডিম ও রেশমকীট অপবিত্র নহে। যে সমস্ত বস্তু রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত না হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে তাহা, যেমন ঘাম ও চোখের পানি অপবিত্র নহে। অপবিত্র পদার্থ সঙ্গে লইয়া নামায দুরস্ত নহে। কিন্তু পাঁচ প্রকার ময়লা সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব নহে বলিয়া ক্ষমার যোগ্য—(১) পায়খানার পর তিনটি প্রস্তর-খণ্ড বা তিনটি ঢিলা দ্বারা তিনবার ভালরূপে মুছিয়া ফেলার পরও যদি মল দ্বারে সামান্য মাত্র চিহ্ন থাকিয়া যায় এবং তদতিরিক্ত স্থানে বিস্তৃত না থাকে; (২) সড়কের কর্দম—যদিও ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে মল-মূত্রাদি মিশ্রিত থাকে; কিন্তু সাধ্যানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও যতটুকু হইতে রক্ষিত থাকা যায় না কেবল ততটুকুই মার্জনীয়। ইহাতে এইরূপ মনে করিও না যে, সড়কের কর্দমের উপর আছাড় পড়িলে অথবা হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু কর্তৃক উক্ত সড়ক হইতে তোমার কাপড়ে কর্দম নিক্ষিপ্ত হইলে সে কাপড়ে নামায পড়া দুরস্ত হইবে। এইরূপ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকিলেও দুরস্ত হইবে না। (৩) চলা-ফেরার সময় রাস্তার অপবিত্রতা হইতে পায়ের মোজা সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়া রাখা যায় না। যতটুকু হইতে বাঁচানো অসম্ভব ততটুকু মোজায় লাগিয়া গেলে উহা মাটিতে ঘষিয়া তৎসহ নামায পড়িলে মার্জনীয় হইবে। (৪) চাম উকুন, চারপোকা, ডাঁশ প্রভৃতি কীটের রক্ত কাপড়ে লাগিলে ইহা লইয়া নামায দুরস্ত হইবে। উহার রস নির্গত হইলেও জায়েয হইবে। (৫) শরীরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোটা বাহির হয় তাহা হইতে সামান্য লালাভ রস বাহির হইলে তৎসহ নামায পড়িলেও মার্জনীয় হইবে। কারণ, এইরূপ গোটা হইতে মানব-শরীর মুক্ত থাকে না। এইরূপে খোস-পাঁচড়া হইতে যে পরিষ্কার রস নির্গত হয় তাহাও মার্জনীয়। কিন্তু যে গোটা বড় তাহা হইতে পুঁজ বাহির হয়। ইহাকে ফোঁড়ার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ গোটা কম হইয়া থাকে। ইহা হইতে নির্গত পুঁজ ধুইয়া ফেলা ওয়াজিব। সতর্কতার সহিত ধুইয়া ফেলার পরও যদি সামান্য চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে তবে উহা মাফ হওয়ার আশা আছে। কোন শিরা কাটিয়া শরীরের দূষিত রক্ত বাহির করিলে বা কোন যখম হইতে রক্ত নির্গত হইলে উহা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ধুইবার পরও যদি ক্ষতস্থানে কিছু রক্ত থাকিয়া যায় এবং ইহা ধুইবার জন্য বাড়াবাড়ি করিলে পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে তবে এমতাবস্থায় নামায না পড়িয়া পরে কাযা আদায় করিবে, কারণ এমন অবস্থা নিতান্ত বিরল।

যে স্থানে নাপাক জিনিস লাগিয়াছে, একবার পানি প্রবাহিত করিয়া উহা ধুইয়া ফেলিলে পাক হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই নাপাক জিনিস প্রকৃতিগত নাপাক হইলে সে স্থানটি এমনভাবে ধুইতে হইবে যাহাতে ময়লা নিঃশেষে বিদূরিত হয়। কিন্তু ধৌত ও ঘর্ষণ করিলে এবং নখ দ্বারা কয়েকবার আঁচড়াইলেও যদি উহার বর্ণ ও গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তবে সেই স্থান পাক বলিয়া গণ্য হইবে।

চারি প্রকার পানি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সমস্ত পানিই পাক এবং অপর বস্তুকে পাক করিতে পারে। (১) ওযূ-গোসলে একবার ব্যবহৃত পানি নিজে পাকই থাকে; কিন্তু ইহা অপরকে পাক করিতে পারে না। (২) যে পানি দ্বারা মলমূত্রাদি বা কোন নাপাক বস্তু ধৌত করা হইয়াছে তাহা নিজেও পাক নহে এবং অপরকেও পাক করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত ধৌত নাপাকী যদি পানির সহিত মিশ্রিত হইয়া পানির স্বাভাবিক বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন করিয়া না ফেলে তবে সে পানি নিজে পাক; (অবশ্য অপরকে পাক করিতে পারে না।) (৩) হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে আড়াইশত সের অপেক্ষা কম পানিতে মলমূত্রাদির ন্যায় কোন নাপাক বস্তু পতিত হইলে পানির বর্ণ স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন না হইলেও উহা নাপাক। কিন্তু আড়াইশত সের বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ পানির সহিত মলমূত্রাদি বা নাপাক বস্তু মিশিয়া যতক্ষণ উহার বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ উহা নাপাক হয় না। (৪) জাফরান, সাবান, আশনান-পাতা, আটা প্রভৃতি পাক বস্তু যাহা হইতে পানিকে পৃথক করা চলে, পানির সহিত মিশিয়া পানির বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হইলে পানি পাকই থাকে; কিন্তু অপরকে পাক করিতে পারে না। তবে উক্ত গুণগুলির সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলে এরূপ পানি দ্বারা অন্য বস্তুকে পাক করাও যাইতে পারে।

ওযূ-গোসল দ্বারা পবিত্রতা ঃ ওযূ ভঙ্গ এবং স্ত্রী সঙ্গম ও শুক্রপাতের কারণে শরীর অপবিত্র হইলে ওযূ-গোসল দ্বারা পবিত্রতা সাধন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পাঁচটি বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক, (১) মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম, (২) মলমূত্র-দ্বার পাক করিবার নিয়ম (৩) ওযূর নিয়ম (৪) গোসলের নিয়ম এবং (৫) তায়াম্মুম করার নিয়ম।

মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম ঃ উন্মুক্ত ময়দানে মলত্যাগের প্রয়োজন হইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু দূরে যাইয়া বসা উচিত। সম্ভব হইলে কোন কিছুর আড়ালে বসাই শ্রেয়। বসিবার পূর্বে লজ্জাস্থান অনাবৃত করা উচিত নহে। চন্দ্র বা সূর্যের দিকে মুখ করিয়া বসিবে না; কিন্তু পায়খানা হইলে এরূপ বসাতে আপত্তি নাই। কিবলা শরীফের দিকে মুখ বা পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিবে না। কাবা শরীফকে ডানে বা বামে রাখিয়া আড়াআড়ি বসাই উত্তম। যে স্থানে জনসমাগম হয় সে স্থানে পায়খানা-পেশাব করিবে না। পানিতে দণ্ডায়মান হইয়া পেশাব করিবে না। ফলবান বৃক্ষের নিচে পায়খানা-পেশাব করিবে না। শক্ত মাটির উপর ও বাতাসের গতির বিপরীতমুখী হইয়া পেশাব করিবে না। করিলে শরীরে পেশাবের ছিটা পড়িতে পারে। বিনা ওযরে দাঁড়াইয়া পেশাব করিবে না। ওযূ-গোসলের স্থানে পেশাব করিবে না। বাম পায়ে ভর দিয়া বসিবে। পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে স্থাপন করিবে এবং বাহির হইবার সময় ডান পা আগে বাহির করিবে। আল্লাহ্‌র নাম খোদিত আছে এমন কোন জিনিস সাথে লইয়া

পায়খানায় যাইবে না। খালি মাথায় পায়খানা-পেশাব করিতে যাইবে না। পায়খানায় যাইবার সময় এই দু'আ পড়িবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ, "বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি অপবিত্রতা, মলিনতা বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পায়খানা হইতে বাহির হইয়া বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي مَا يُوْذُوْنَنِي وَ اَبْقَى فِيْ جَسَدِيْ مَا يَنْفَعُنِي -

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসাই সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমা হইতে কষ্টদায়ক পদার্থ বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং আমার জন্য যাহা উপকারী তাহা আমার শরীরে রাখিয়া দিয়াছেন।"

মলমূত্র ত্যাগের পর পবিত্র হওয়ার নিয়ম ঃ পায়খানায় যাইবার সময় তিনটি প্রস্তরখণ্ড অথবা মাটির ঢিলা সঙ্গে লইবে। মলত্যাগের পর একটি ঢিলা বাম হাতে লইয়া মলদ্বারের নিকটস্থ পরিষ্কার স্থানে রাখিয়া মলযুক্ত স্থানের উপর দিয়া এমনভাবে আস্তে আস্তে টানিয়া আনিবে এবং কিছু কিছু ঘুরাইতে থাকিবে, যাহাতে মল ঢিলাতে লাগিয়া উঠিয়া যায় এবং অন্য পরিষ্কার স্থানে না লাগে। এইরূপে তিনটি ঢিলা দ্বারা তিনবার মুছিয়া ফেলিবে। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না হইলে আরও দুইটি ঢিলা উত্তমরূপে ব্যবহার করিবে। ব্যবহৃত ঢিলার সংখ্যা বেজোড় হওয়া উচিত। তৎপর বড় একখণ্ড পাথর বা মাটির ঢিলা ডান হাতে লইবে এবং বাম হাতে পুরুষাঙ্গ ধরিয়া ইহার মুখ উক্ত ঢিলার তিন স্থানে তিনবার চাপিয়া ধরিবে অথবা দেওয়ালে ঐরূপ তিনবার চাপিয়া ধরিবে। পুরুষাঙ্গ বাম হাতে ধরিয়া হেলাইবে, ডান হাতে নহে। মলমূত্র ত্যাগের পর পাক হওয়ার জন্য এতটুকু করিলেই যথেষ্ট। তবে ঢিলা ব্যবহারের পর পানি দ্বারা শৌচ করা ভাল। শৌচ করিবার সময় মলত্যাগের স্থান হইতে একটু সরিয়া বসিবে যেন পরিত্যক্ত মলের উপর পানি না পড়ে। ডান হাতে পানি ঢালিবে এবং বাম হাতের আঙ্গুলের তালু দ্বারা আস্তে আস্তে ঘষিবে যেন ময়লার চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া বুঝিলে আর পানি ঢালিবে না। আঙ্গুল দ্বারা ঘষিবার কালে মলদ্বারের ভিতরে পানি প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিবে না। কিন্তু শৌচ-কর্ম করিবার সময় মলদ্বার ঢিলা রাখিবে। ঢিলা রাখিয়া শৌচ-কর্ম করিলে যে স্থানে পানি প্রবেশ না করে তাহা শরীরের ভিতরের অঙ্গ। উহা ধুইবার জন্য আদেশ করা হয় নাই। এইরূপ পেশাবের পর পুরুষাঙ্গের নিচে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক তিনবার ঝাড়িবে, তিন কদম চলিবে এবং তিনবার গলা খাকরাইবে। সন্দেহ করিতে যাইয়া ইহার

অতিরিক্ত নিজের উপর কষ্ট চাপাইবে না। এরূপ করার পরও আর্দ্রতা অনুভূত হইলে অঙ্গের উপর পানি ঢালিয়া দিবে; তখন উহাকে পানির আর্দ্রতা বলিয়াই মনে হইবে। কারণ, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ দূর করিবার জন্য এরূপ নির্দেশই প্রদান করিয়াছেন। মলত্যাগের পর তদ্রূপ পবিত্রতা সাধন করতে প্রাচীর-গাত্রে বা মাটিতে হাত ঘর্ষণ করিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে যেন কোন প্রকার গন্ধ না থাকে। পেশাব-পায়খানা করত পরিচ্ছন্নতা লাভের পর এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَ حَصِّنْ فَرْجِىْ مِنَ الْفَوَاحِشِ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, মুনাফেকী হইতে আমার অন্তরকে পবিত্র রাখ এবং আমার লজ্জাস্থানকে কুকর্ম হইতে রক্ষা কর।"

ওযূর নিয়ম ঃ উক্ত নিয়মে ইস্তেঞ্জার পর মিস্ওয়াক করিবে। ডানদিক হইতে মিসওয়াক আরম্ভ করিবে। প্রথমে উপরের মাড়ির এবং তৎপর নিচের মাড়ির দাঁতগুলি মাজিবে। ইহার পর বাম পার্শ্বে ঐরূপ মিসওয়াক করিবে। দাঁতের বাহিরের দিকে মিসওয়াক করা হইয়া গেলে ঐরূপে দাঁতের ভিতরের দিকেও মিসওয়াক করিবে। তৎপর জিহ্বা এবং তালুকে মিসওয়াক দ্বারা ঘষিয়া ফেলিবে। মিসওয়াক করাকে নিতান্ত জরুরী বলিয়া মনে করিবে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মিসওয়াক করিয়া যে নামায পড়া হয় তাহার এক রাকআত বিনা মিসওয়াকের সত্তর রাকআত অপেক্ষা উত্তম। মিসওয়াক করিবার সময় নিয়ত করিবে, আল্লাহ্র যিকির করিবার উপকরণ পরিষ্কার করিতেছি। ওযূ ভঙ্গ হওয়া মাত্রই আবার ওযূ করিয়া লইবে। কেননা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এইরূপই করিতেন। ওযূ করিবার সময় মিসওয়াকও করিবে। কিছু পানাহারের পর কুলি না করিয়া নিদ্রা গেলে, দীর্ঘ সময় মুখ বন্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে অথবা গন্ধযুক্ত কোন দ্রব্য আহার করিলে যদি মুখের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তবে ওযূ না করিলেও মিসওয়াক করা সুন্নত।

মিসওয়াক করার পর ওযূর উদ্দেশ্যে কিবলার দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে বসিয়া বলিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

অর্থাৎ, "পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। হে প্রভো, শয়তানের সর্বপ্রকার ধোঁকা হইতে বাঁচিবার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং হে

প্রভো, শয়তান যেন আমার নিকট ঘেঁষিতে না পারে তজ্জন্য আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" ইহার পর উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধুইবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ والبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট শান্তি ও মঙ্গল চাহিতেছি এবং কর্তব্যে শিথিলতাজনিত দুর্ভাগ্য ও বিনাশ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" পবিত্রতা লাভ করত নামায পড়িবার যোগ্যতা অর্জনের নিয়ত করিবে এবং মুখ ধোয়া পর্যন্ত এই নিয়তের খেয়াল রাখিবে। তৎপর গর্গরার সহিত তিনবার কুলি করিবে; কিন্তু রোযাদার হইলে গর্গরা করিবে না। এই সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার যিকির, তোমার শোক্‌র ও তোমার কিতাব তিলাওয়াত করিতে আমাকে সাহায্য কর।" অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিবে এবং বাম হাতে নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে ও বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِی رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّی رَاضٍ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকা অবস্থায় আমাকে বেহেশতের সুঘ্রাণ লইতে দাও।" ইহার পর সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধুইবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِی بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَائِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন তোমার বন্ধুগণের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে সেদিন তোমার নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিও।" মুখমণ্ডলে যে সমস্ত চুল থাকে উহার গোড়ায় পানি পৌঁছাইবে। দাঁড়ি খুব ঘন ও মলিন হইলে উহার উপর পানি ঢালিবে এবং আঙ্গুল ঢুকাইয়া খিলাল করিবে। ইহাকে তাখলীল বলে। কপালের উপরিভাগে চুলের উৎপত্তিস্থান হইতে নিচের দিকে থুতি (গলনালী) পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখমণ্ডলের সীমা। চক্ষুকোটর আঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করিবে যেন পিচুটি, সুরমা ইত্যাদির চিহ্ন দূর হইয়া যায়।

অতঃপর ডান হাত কনুই পর্যন্তই তিনবার ধুইবে। উপরে কনুইর শেষ সীমা পর্যন্ত ধৌত করা উত্তম। এই সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِی كِتَابِی بِيَمِيْنِیْ وَحَاسِبْنِیْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার আমলনামা আমার ডান হাতে প্রদান করিও এবং আমার হিসাব-নিকাশ সহজভাবে করিও। তৎপর বাম হাতও তদ্রূপ ধুইবে এবং

আঙ্গুলে আঙটি থাকিলে নাড়িয়া ইহার নিচে পানি পৌঁছাইবে। বাম হাত ধুইবার সময় বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اعُوْذُبِكَ اَنْ تُعْطِيْنِى كِتَابِىْ بِشِمَالِى اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার আমলনামা আমার বাম হাতে বা আমার পশ্চাদ্দিক হইতে দিও না। আমি এ বিষয়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি।" তৎপর হাত পুনরায় ভিজাইয়া আঙ্গুলগুলি মাথায় মাথায় মিলাইয়া কপালের উপর হইতে চুলের উপর দিয়া পশ্চাদ্দিকে গ্রীবা পর্যন্ত টানিয়া নিবে। অতঃপর তথা হইতে সম্মুখের দিকে পূর্বস্থানে আবার টানিয়া আনিবে। ইহাতে চুলের উভয় পার্শ্বই মোছা হইবে। এতটুকু করিলে একবার মসেহ হইল। এইরূপে তিনবার করিবে যেন প্রত্যেক বারই সম্পূর্ণ মাথা মোছা হয়।[১] মুছিবার সময় এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার অনুগ্রহে আমাকে ঢাকিয়া লও এবং তোমার বরকতসমূহ আমার প্রতি অবতীর্ণ কর। আর যেদিন তোমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকিবে না সেদিন তোমার আরশের নিচে আমাকে ছায়া প্রদান করিও।" অতঃপর উভয় কান মসেহ করিবে। তর্জনীর অগ্রভাগ কানের ছিদ্রে তিন বার ঢুকাইয়া দিবে ও কানের পেঁচে পেঁচে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঘুরাইবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা উভয় কানের পৃষ্ঠদেশ পিছন হইতে সামনের দিকে মুছিয়া আনিবে। কান মসেহ করিবার সময় এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যাহারা উপদেশবাণী শ্রবণ এবং তন্মধ্যে সদুপদেশসমূহ মানিয়া চলে আমাকে তাহাদের দলভুক্ত কর।" তৎপর উভয় হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা গ্রীবা মুছিবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ السَّلاَسِلِ وَ الْاَغْلاَلِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, দোযখের আগুন হইতে আমার গ্রীবাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং শিকল ও বেড়ি পরানো হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।" তৎপর ডান

(১) হানাফী মাযহাব মতে বৃদ্ধা ও তর্জনী ব্যতীত অন্য আঙ্গুলগুলি মাথায় মিলাইয়া উক্ত নিয়মে মাথার উপরিভাগ মসেহ করিতে হয়। তৎপর দুই হাতের তালু দ্বারা মাথার উভয় পার্শ্ব পশ্চাদ্দিক হইতে মুছিয়া সম্মুখের দিকে আনিতে হয়। এইরূপে মাথা একবারই মসেহ করিতে হয়; তিনবার নহে।

পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে নিচের দিক হইতে চালাইয়া খিলাল করিবে এবং ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হইতে খিলাল শুরু করিয়া বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে যাইয়া শেষ করিবে। ডান পা ধুইবার সময় এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন গুনাহ্গারদের পাসমূহ পুলসিরাতের উপর হইতে পিছলাইয়া দোযখে পতিত হইবে, সেদিন পুলসিরাতের উপর আমার পা স্থির রাখিও।" তৎপর উক্ত নিয়মে বাম পা ধুইবে এবং বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تَذِلَّ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَومُ تَذِلُّ اقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন মুনাফিকদের পাসমূহ পুলসিরাত হইতে পিছলাইয়া পড়িবে সেদিন পুলসিরাতের উপর হইতে আমার পা যেন স্খলিত না হয় তজ্জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। ওযূ শেষ হইলে বলিবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্, আমাকে তওবাকারীদের শ্রেণীভুক্ত কর, আমাকে পবিত্র লোকদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে তোমার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।"

যাহারা আরবী বুঝে না ঐ দু'আগুলির অর্থ তাহাদের জানিয়া লওয়া উচিত যেন তাহাদের উক্তির মর্ম তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে, "যে ব্যক্তি ওযূ করিবার সময় আল্লাহ্র যিকির করে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল গুনাহ্ ধুইয়া মুছিয়া যায়।" ওযূর সময় দু'আ না পড়িলে কেবল ধৌত অঙ্গগুলিই পবিত্র হয়। ওযূ ভঙ্গ না হইলেও প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন ওযূ করিয়া লইবে। কারণ হাদীসে উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাজা ওযূ করে আল্লাহ্ তাহার ঈমান তাজা করিয়া দেন। ওযূ যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া মনে করিবে, হাত মুখ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ পবিত্র করা হইল সেগুলি মানুষে দেখিবার বস্তু। কিন্তু আল্লাহ্র খাস লক্ষ্যস্থল হইল অন্তঃকরণ।

বাহ্য পবিত্রতা সাধনের পরও যে ব্যক্তি তওবা করত অন্তঃকরণ পবিত্র করে না তাহাকে এমন লোকের সহিত তুলনা করা যায়, যে বাদশাহ্কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার বসিবার স্থান অর্থাৎ ঘরের মেঝের আবর্জনা পরিষ্কার না করিয়া কেবল বাহিরের দ্বার পরিষ্কার করিয়া রাখে।

ওযূর মাকরূহসমূহ ঃ ওযূর মধ্যে ছয়টি কাজ মাকরূহ—(১) দুনিয়ার কথা বলা, (২) মুখের উপর থপ্থপ্ করিয়া পানি নিক্ষেপ করা, (৩) হাত খুব জোরে ঝাড়া দেওয়া, (৪) রৌদ্রে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওযূ করা, (৫) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা ও (৬) কোন অঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা। ওযূর পর ভিজা মুখমণ্ডলে যেন ধূলাবালি না আটকায় এই উদ্দেশ্যে মুখ মুছিয়া ফেলা অথবা ইবাদতের প্রভাব যেন অনেকক্ষণ অবশিষ্ট থাকে এই নিয়তে মুখ না মোছা, উভয়ই দুরস্ত আছে। আবার নিয়ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ফযীলতও আছে। ধাতুনির্মিত লোটা-বদনা অপেক্ষা মাটির লোটা-বদনা ওযূর জন্য উত্তম। কারণ, তাহাতে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ পায়।

গোসলের বিবরণ

স্ত্রীসঙ্গম করিলে অথবা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় শুক্রপাত হইলে গোসল ওয়াজিব হয়।

গোসলের ফরয ঃ (১) সমস্ত শরীর ধৌত করা, (২) লোমকূপ পর্যন্ত পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া ও (৩) নাপাকী হইতে পাক হওয়ার নিয়ত করা।

গোসলের সুন্নত ঃ প্রথমে বিস্মিল্লাহ্ পড়া; উভয় হাত তিনবার ধৌত করা; দেহের যে যে স্থানে নাপাকী লাগিয়াছে তাহা ধুইয়া ফেলা; উপরে বর্ণিত প্রণালীতে ওযূ করা; কিন্তু গোসলের পর পা ধুইবে। গোসলের সময় তিনবার ডান দিকে, তিনবার বাম দিকে এবং তিনবার মাথার উপর পানি ঢালিবে। যে পর্যন্ত হাতে নাগাল পাওয়া যায় সে পর্যন্ত শরীর মলিবে। শরীরের যে স্থান বন্ধ বা গুপ্ত আছে তথায় পানি পৌঁছাইবার জন্য যথাযথ চেষ্টা করিবে; কারণ ইহা ফরয। লজ্জাস্থানে হাত দিয়া তোয়ালিয়াদির সাহায্যে মলিয়া দিবে।

তায়াম্মুমের বিবরণ

তায়াম্মুম দুরস্ত হওয়ার কারণ ঃ পানি একেবারে না মিলিলে, অথবা যে পানি পাওয়া যায় তাহা বন্ধুবর্গসহ পানের আবশ্যক হইলে, কিংবা পানি পর্যন্ত যাওয়ার পথে হিংস্রজন্তু বা শত্রুর ভয় থাকিলে অথবা অন্যের অধিকারের পানি বিক্রয় না করিলে বা অতিরিক্ত মূল্য চাহিলে কিংবা পানি ব্যবহার করিলে শরীরে কোন ক্ষত বা পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ার বা প্রাণনাশের আশংকা থাকিলে—এই সকল অবস্থায় নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তায়াম্মুম করিতে হয়।

তায়াম্মুমের নিয়ম ঃ তায়াম্মুমের প্রয়োজন হইলে উভয় হস্তের আঙ্গুলগুলি ফাঁক রাখিয়া পাক মাটিতে এইরূপ চাপড় মারিবে যাহাতে ধূলা উড়িয়া আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করে। তায়াম্মুমের সময় নামাযের জন্য পবিত্রতা লাভের নিয়ত করিবে। তৎপর উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিবে। চুল ও লোমকূপের মধ্যে ধূলি পৌঁছাইবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করিবে না। আঙ্গুলে আংটি থাকিলে খুলিয়া রাখিবে। অতঃপর আঙ্গুল ফাঁক রাখিয়া পুনরায় মাটির উপর চাপড় মারিবে। এবার হাত উঠাইয়া বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্যান্য আঙ্গুল উপর ডান হাতের আঙ্গুলের পৃষ্ঠ স্থাপন করত বাম হাতের আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের আঙ্গুলগুলির পৃষ্ঠদেশের অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মুছিয়া কনুইর উপর পর্যন্ত আনিবে। ইহার পর তথা হইতে বাম হাতের তালু ডান হাতের ভিতর ভাগে কনুইর উপর হইতে আঙ্গুলের দিকে মুছিয়া অবশেষে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পৃষ্ঠ মুছিয়া ফেলিবে। এ নিয়মে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মুছিবে। তৎপর উভয় হাতের তালু পরস্পর ঘর্ষণ করিবে এক হাতের আঙ্গুলের অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া ঘর্ষণ করিবে। এই পর্যন্ত হাত সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য একবারের চাপড়েই চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতে না কুলাইলে একাধিক চাপড় মারা যাইতে পারে। কারণ, কনুই পর্যন্ত হাতের সমস্ত স্থানে ধূলি লাগান আবশ্যক। এইরূপে একবার তায়াম্মুম করিয়া এক ওয়াক্তের ফরয নামায এবং সুন্নত ও নফল নামায যত ইচ্ছা পড়া যাইতে পারে। কিন্তু অন্য ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্য যত ইচ্ছা তায়াম্মুম করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রকারের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ঃ শরীরের অতিরিক্ত পদার্থ হইতে শরীর পবিত্র রাখা। ইহা দুই প্রকার—(ক) মাথার চুল ও দাড়িতে সঞ্চিত ময়লা দূর করা। চিরুণী, পানি, মাটি ও গরম পানি দ্বারা এরূপ ময়লা দূর করা চলে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ গৃহে অবস্থানকালে ও প্রবাসে সকল সময়ই চিরুণী সঙ্গে রাখিতেন। নিজ দেহ ময়লা ও মলিনতা হইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সুন্নত। (খ) চক্ষু-কোণের পিচুটি, কর্ণকুহরের ময়লা, নাসারন্ধ্রদ্বয়ের শ্লেষ্মা প্রভৃতি পরিষ্কার করা উচিত। নাসিকায় যে ময়লা জমাট বাঁধিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা পানি দ্বারা পরিষ্কার করা আবশ্যক। দাঁতের ময়লা মিসওয়াক দ্বারা ঘষিয়া কুলি করিয়া দূর করিবে। হাত-পায়ের নখের ভিতরে ও বাহিরে, গুম্ফ, কবরী ও সমস্ত দেহে যে ময়লা সঞ্চিত হয় তাহাও পরিষ্কার করা উচিত। শরীরের কোন স্থানে জমিয়া চর্ম পর্যন্ত পানি পৌঁছিতে বাধা না জন্মাইলে তৎসহ ওযূ-গোসল অবশ্য অশুদ্ধ হইবে না। কিন্তু নখের নিচে অস্বাভাবিকরূপে ময়লা জমা হইলে তথায় পানি প্রবেশে বাধা জন্মায়। এইরূপ ময়লা দূর করা আবশ্যক। (অন্যথায় ওযূ-গোসল অশুদ্ধ হওয়ার আশংকা রহিয়াছে)।

হাম্মামে গোসলকারীর ওয়াজিবসমূহ ঃ হাম্মামে গোসলকারীর প্রতি চারটি কার্য ওয়াজিব এবং দশটি সুন্নত। ইহার মধ্যে দুইটি ওয়াজিব তাহার লজ্জাস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ওয়াজিবসমূহ এই—(১) নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত অপরের দৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া রাখা। (২) হাম্মামের গোসল প্রদানকারীদের হাত যেন নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত কোন স্থানে না লাগে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা; কেননা দেখা অপেক্ষা এই স্থান স্পর্শ করা অধিকতর মন্দ। (৩) নিজে অপরের উক্ত স্থানের দিকে দৃষ্টি না করা। (৪) অপর কেহ হাম্মামের ভিতর সতর উন্মুক্ত করিলে ভয়ের কারণ না থাকিলে তাহাকে নিষেধ করা। ভয়ের কারণ গোসলখানা হইতে পাপী হইয়া বাহির হইতে হইবে। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাম্মামে (গোসলখানায়) গেলে প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত চক্ষুর উপর পর্দা বাঁধিয়া বসিতেন। এই ওয়াজিবগুলি স্ত্রীলোকদের পক্ষেও অবশ্য পালনীয়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে হাম্মামে যাতায়াত তাহাদের জন্য শরীয়তে নিষিদ্ধ। সাধারণত তাহাদিগকে হাম্মামে যাইতে দিবে না।

হাম্মামের গোসলকারীর সুন্নতসমূহ ঃ (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া নামায পড়িবার উদ্দেশ্যে গোসল করিবার নিয়ত করা; লোকের নিকট সুন্দর দেখাইবার উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে। (২) গোসলের পূর্বেই হাম্মামের ভৃত্যদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করা; ইহাতে তাহারা কত পাইল জানিতে পারিয়া তোমাকে আনন্দের সহিত গোসল করাইবে। (৩) হাম্মামে প্রবেশকালে প্রথমে বাম পা ভিতরে দিবে এবং এই দু'আ পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِجسِ النَّجَسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ "পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। অপরিচ্ছন্নতাময় ও অপরিছন্নকারী বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"; হাম্মাম শয়তানের স্থান, এই জন্যই এই দু'আ পড়িতে হয়। (৪) হাম্মাম নির্জনে পাইবার চেষ্টা করিবে অথবা এমন সময় হাম্মামে যাইবে যখন ইহা একেবারে খালি থাঁকে। (৫) হাম্মামের গরম প্রকোষ্ঠে অকস্মাৎ প্রবেশ করিবে না। করিলে অতিরিক্ত ঘাম বাহির হইবে। (৬) প্রবেশ করামাত্রই ওযূ করিবে। (৭) তৎপর তাড়াতাড়ি সমস্ত শরীর ধুইয়া ফেলিবে। এই পরিমাণ পানি ব্যবহার করিবে যাহাতে হাম্মামী দেখিয়া দুঃখিত না হয়। (৮) হাম্মামে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও সালাম করিবে না; তবে মুসাফাহা করা যাইতে পারে। কেহ সালাম করিয়া বসিলে উত্তরে বলিবে ঃ عَافَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।" (৯) হাম্মামে অধিক কথাবার্তা বলিবে না। কুরআন শরীফ পড়িলে নীরবে পড়িবে। তবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। উচ্চস্বরে পড়া দুরস্ত আছে। (১০) সূর্যাস্তের সময় এবং মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে হাম্মামে যাইবে না। কারণ, উহা শয়তানের চলাফেরার সময়।

গরম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে দোযখের আগুনের কথা স্মরণ করিবে। এবং তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। অধিকক্ষণ তথায় থাকিবে না। দোযখের কয়েদখানায় কি বেশিক্ষণ থাকা যায়? যে কোন অবস্থা দেখিয়া পরকালের কথা স্মরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্ধকার দেখিলে কবরের অন্ধকার অবস্থা মনে করিবে। সাপ দেখিলে দোযখের সাপ স্মরণ করিবে। ভয়ঙ্কর কোন মূর্তি দেখিলে মুনকার-নাকীর ও দোযখের ফেরেশ্তার কথা ভাবিবে। বিকট শব্দ শুনিলে হযরত ইস্রাফীল (আ)-সিঙ্গার শব্দ স্মরণ করিবে। অপমানে পরকালের অপমান ও সম্মানে পরকালের সম্মানের কথা মনে করিবে। এই কাজগুলি শরীয়ত মতে সুন্নত। গোসল শেষে হাম্মাম হইতে বাহির হওয়ার সময় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পা ধুইবে। ইহা করিলে পায়ে নেক্রাস রোগ ও মাথা-বেদনার ভয় থাকে না। এ-সময় ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালিবে না। গ্রীষ্মকালে গোসলের পর কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ঃ আরও কতকগুলি অতিরিক্ত পদার্থ হইতেও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করিতে হয়। উহা সাত প্রকার—(১) মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলাই উত্তম এবং ইহা পবিত্রতার অধিকতর নিকটবর্তী। কিন্তু সৌখিন লোকদের পক্ষে চুল রাখাও দুরস্ত আছে। মাথার কতকাংশের চুল ফেলিয়া দেওয়া কিংবা সৈন্যদের ন্যায় বাবরী রাখা মকরূহ এবং উহা নিষিদ্ধ। (২) গোঁফ ওষ্ঠের সমান করিয়া কাটিয়া ফেলা সুন্নত, গোঁফ লম্বা করা নিষিদ্ধ। (৩) বগলের চুল প্রতি চল্লিশ দিনে একবার উপড়াইয়া ফেলা সুন্নত। ইহা না পারিলে মুড়াইয়া ফেলা উত্তম। কারণ, তাহাতে কোন কষ্ট হয় না। (৪) লজ্জাস্থানের চুল ক্ষুর দ্বারা বা অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহারে পরিষ্কার করা সুন্নত। অন্তত চল্লিশ দিনে একবার পরিষ্কার করা আবশ্যক; ইহার অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে। (৫) হাত-পায়ের নখ বৃদ্ধি পাইলে কাটিয়া ফেলা, যেন উহাতে ময়লা জমিতে না পারে। নখে ময়লা জমিলে ওযূ-গোসল অশুদ্ধ হয় না। কারণ, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদল লোকের নখে ময়লা জমিতে দেখিয়া উহা কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন, কিন্তু নামায পুনরায় পড়িতে আদেশ দেন নাই। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, নখ বৃদ্ধি পাইলে শয়তানের বসিবার স্থান হয়। যে আঙ্গুলের মর্যাদা বেশি সে আঙ্গুল হইতে নখ কাটা আরম্ভ করিবে। পায়ের চেয়ে হাত উত্তম এবং বাম অপেক্ষা ডান উত্তম। ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল সমস্ত আঙ্গুলের মধ্যে উত্তম। অতএব এই আঙ্গুল হইতে নখ কাটা আরম্ভ করা উচিত। তৎপর ক্রমান্বয়ে ডান দিকের নখ কাটিয়া বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হইতে আরম্ভ

করত সমস্ত নখ কর্তন করিয়া পুনরায় ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নিকট আসিয়া শেষ করিবে। নখ কাটিবার একটি সুন্দর প্রণালী এই উভয় হাতের তালু মুখা-মুখি করিয়া গোল আকারে ধর। তৎপর ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল হইতে নখ কাটা আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ডান দিকের নখ কাটিতে কাটিতে উভয় হস্তের নখ কর্তন করত পুনরায় ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নিকট আসিয়া শেষ করিবে (৬) নাভীর নাড়ী কর্তন করা; ইহা জন্মকালে কাটিতে হয়। (৭) খত্না করা।

দাড়ি ঃ দাড়ি লম্বা হইলে একমুষ্টি পরিমাণ রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ কাটিয়া ফেলা দুরস্ত আছে। লম্বা দাঁড়ি রাখিতে যাইয়া যেন কেহ বাড়াবাড়ি না করে এইজন্যই এই বিধান করা হইয়াছে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ও তাবেঈনগণের একদল একমুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখিতেন। অপর দল বলেন, দাঁড়ি মোটেই ছাঁটা উচিত নহে।

দাড়ি সম্বন্ধে দশটি বিষয় মকরূহ—(১) পাকা দাড়িতে কালো খেযাব লাগান। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, কালো খেযাব লাগান দোযখী ও কাফিরদের রীতি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ শেষ যমানায় কতিপয় লোক এমন হইবে যাহারা কালো খেযাব ব্যবহার করিবে, তাহারা বেহেশ্তের গন্ধও পাইবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে বৃদ্ধ নিজকে যুবকের ন্যায় সাজায় সে বৃদ্ধদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। আর যে যুবক নিজেকে বৃদ্ধের মত সাজায় সে যুবকদের মধ্যে উত্তম। কালো খেযাব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, ইহা মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে; ইহা কৃত্রিম ও প্রবঞ্চনামূলক। (২) লাল জর্দা রঙের খেযাব লাগানও মাক্রূহ। কিন্তু ধর্ম-যোদ্ধাগণ কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার বা নিজেদের বার্ধক্য গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিলে উহা সুন্নত বলিয়া গণ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে কালো খেযাবও কোন কোন আলিম ব্যবহার করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত সকল খেযাবই প্রবঞ্চনামূলক ও নাজায়েয। (৩) লোকের নিকট বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করত সম্মান লাভের আশায় গন্ধকের ধুম্র দ্বারা কালো দাড়ি সাদা করাও মাকরূহ। এই উপায়ে সম্মান লাভ করা যায় মনে করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য। কারণ, ইল্‌ম ও বুদ্ধির কারণেই সম্মান লাভ হয়; বার্ধক্য বা যৌবনের কারণে সম্মান লাভ হয় না। হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাঁহার মাত্র বিশটি চুল সাদা ছিল। (৪) বার্ধক্যকে লজ্জাজনক মনে করত সাদা দাড়ি তুলিয়া ফেলা মাক্রূহ। ইহাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত নূরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। অজ্ঞতার কারণেই ইহা হইয়া থাকে। (৫) যৌবনের প্রারম্ভে বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এবং দাড়িবিহীন বালকের ন্যায় সুশ্রী দেখাইবার অভিপ্রায়ে দাড়ি উপড়াইয়া ফেলা ও দাড়ি মুড়ান মাক্রূহ। ইহাও অজ্ঞতার কারণেই হইয়া থাকে। কেননা কতিপয় ফেরেশতা এই তসবীহ পাঠ করেন ঃ

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحٰى وَ النِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ -

অর্থাৎ "সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা এবং স্ত্রীলোককে লম্বা কেশ দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন।" (৬) স্ত্রীলোকদের দৃষ্টিতে সুশ্রী দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দাড়িকে কবুতরের লেজের ন্যায় সুবিন্যস্ত করাও মাক্‌রূহ্‌। (৭) মাথার কিয়দংশের চুল লম্বা করিয়া দাড়ির সহিত মিলাইয়া দেওয়া এবং পরহেযগারদের বিপরীত জোল্‌ফের চুল কানের লতির নিচে লম্বিত করিয়া দেওয়া মাক্‌রূহ্‌। (৮) নিজের দাড়ির কৃষ্ণতা বা শুভ্রতা দেখিয়া গৌরববোধ করা মাক্‌রূহ্‌। কারণ, যে ব্যক্তি নিজেকে গৌরবের চক্ষে দেখে আল্লাহ্‌ তাহাকে ভালবাসেন না। (৯) সুন্নত পালনের নিয়তে চিরুণী দ্বারা দাড়ি না আঁচড়াইয়া লোকচক্ষে সুন্দর দেখাইবার উদ্দেশ্যে চিরুণী ব্যবহার করা মাক্‌রূহ্‌। (১০) লোকচক্ষে সংসারবিরাগী দরবেশরূপে গণ্য হওয়ার জন্য দাড়ি আলুথালু করিয়া রাখা মাক্‌রূহ্‌। এইরূপ আকৃতি দেখিয়া লোকে মনে করিবে যে, এই দরবেশ চুলগুলি পর্যন্ত আঁচড়াইবার অবসর পান নাই।

পবিত্রতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

নামায

নামাযের ফযীলত ঃ নামায ইসলামের স্তম্ভ ও ধর্মের ভিত্তি। ইহা সকল ইবাদতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। যে ব্যক্তি আনুষঙ্গিক সকল শর্ত পালন-পূর্বক নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তাহাকে স্বীয় আশ্রয় ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকিয়া অসাবধানতা বশত সগীরা গুনাহ করিয়া ফেলিলে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে উহা খণ্ডণ হইয়া যাইবে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাহারও দ্বারদেশ দিয়া প্রবাহিত স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী সদৃশ যাহাতে গৃহস্বামী প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করিয়া থাকে।" এতটুকু বলিয়া তিনি সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তাহার শরীরে কিছু ময়লা থাকিতে পারে কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন—"না।" তৎপর তিনি বলিলেন—"পানি যেরূপ ময়লা দূর করে এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায তদ্রূপ গুনাহ বিদূরিত করে।" রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"নামায ধর্মের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি ইহা বর্জন করিয়াছে সে ধর্মকে বিনাশ করিয়াছে।" সাহাবা (রা)-গণ নিবেদন করিলেন॥"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি?" তিনি বলিলেন—"ঠিক সময়ে নামায পড়া।" তিনি আরও বলেন—"নামায বেহেশতের কুঞ্জী।" তিনি অন্যত্র বলেন, "তওহীদের পর নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন জিনিস আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণের উপর ফরয করেন নাই।" অপর কোন ইবাদত নামায অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলে ফেরেশতাগণকে তিনি তাহাতেই নিযুক্ত রাখিতেন। অথচ ফেরেশতাগণ সর্বদা নামাযেই রত রহিয়াছেন। কতক ফেরেশতা সিজদায়, কতক ফেরেশতা নামাযে দণ্ডায়মান, কতক ফেরেশতা নামাযে উপবিষ্ট আছেন। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায বর্জন করিল সে কুফরী কাজ করিল।" অর্থাৎ সে এমন কাজের নিকটবর্তী হইল যাহাতে তাহার আসল ঈমানই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। যেমন লোকে বলিয়া থাকে—মরুপ্রান্তরে কাহারও পানি নিঃশেষ হইয়া গেলে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই যে, এরূপ স্থানে পানি নিঃশেষ হইয়া গেলে ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"কিয়ামত দিবস সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যাবতীয় শর্তসহ যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকিলে আল্লাহ্ উহা কবূল করিবেন। অন্যান্য ইবাদত উহার অধীন থাকিবে। এইগুলি যেমনই হউক (নামাযের সহিত) কবূল হইয়া যাইবে। কিন্তু নামাযই অপূর্ণ হইলে অন্যান্য ইবাদত সহ উহা নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইবে।" রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনপূর্বক নামায আদায় করে, রুকূ-সিজদা পুরাপুরি সম্পন্ন করে এবং হৃদয়ে যথেষ্ট নম্রতা ও দীনতাকে স্থান দেয়, তাহার নামায উজ্জ্বল হইয়া আরশ পর্যন্ত পৌঁছে এবং নামাযীদের লক্ষ্য করিয়া বলে, যেরূপ যত্নের সহিত তুমি আমাকে সম্পন্ন করিয়াছ, আল্লাহ্ তদ্রূপ যত্নে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আর যে ব্যক্তি ঠিক সময়ে নামায পড়ে না, যথারীতি ওযূ করে না এবং রুকূ-সিজদায় পূর্ণ নম্রতা অবলম্বন করে না, তাহার নামায কৃষ্ণবর্ণ ধারণ-পূর্বক আসমান পর্যন্ত উত্থিত হয় এবং নামাযীকে সম্বোধন করিয়া বলে, তুমি যেমন আমাকে নষ্ট করিলে আল্লাহ্ তদ্রূপ তোমাকে বিনষ্ট করুন। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা ততক্ষণ নামায এইরূপ অভিসম্পাত দিতে থাকে। তৎপর পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় পুটুলি বাঁধিয়া উক্ত নামাযকে সেই নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি নামাযে চুরি করে (অর্থাৎ যথারীতি নামায আদায় করে না) সে-ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর।"

নামাযের জাহেরী আমল ঃ নামাযের জাহেরী আমলসমূহ ইহার দেহ-স্বরূপ। ইহা ছাড়া নামাযের একটি বাতেনী অবস্থা আছে; উহাকে নামাযের রূহ বলা হয়। এখন নামাযের জাহেরী আমলগুলি বর্ণিত হইবে।

প্রথমে পাক শরীরে পাক কাপড় পড়িবে এবং সতর ঢাকিবে। তৎপর পাক জায়গায় কিব্লামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। দণ্ডায়মান অবস্থায় দুই পায়ের মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখিবে। পিঠ ঠিক সোজা করিয়া রাখিবে, মাথা সম্মুখ-দিকে কিঞ্চিত ঝুঁকাইয়া দিবে। সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে। সোজা দাঁড়াইয়া শয়তানকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সমস্ত 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' সূরা পাঠ করিবে। অপর কেহ নামাযে শামিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলে নামায আরম্ভ করিবার পূর্বেই উচ্চ স্বরে আযান দিবে। অন্যথায় কেবল ইকামত বলিলেই চলিবে। তৎপর মনে মনে নামাযের নিয়ত করিবে; যেমন জোহরের ফরয পড়িবার সময় মনে মনে বলিবে—আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জোহরের ফরয নামায আদায় করিতেছি। নিয়তের মর্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে উভয় হাত এমনভাবে উঠাইবে যাহাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ কানের লতি পর্যন্ত এবং হাতের কব্জা স্কন্ধ পর্যন্ত উত্থিত হয়। তৎপর 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণপূর্বক দুই হাত বক্ষস্থলের নিচে (হানাফী মযহাব মতে নাভীর নিচে) বাঁধিবে।

ডান হাত উপরে রাখিবে। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী বাম হাতের উপর সোজাভাবে স্থাপন করিবে। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এক পার্শ্বে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা অপর পার্শ্বে স্থাপনপূর্বক বাম হাতের কব্জা বেড়িয়া ধরিবে (হানাফী মযহাব মতে ডান হাতের মাঝের তিন অঙ্গুলি বাম হাতের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করত বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠার সাহায্যে বাম হাতের কব্জা আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়।) কানের লতির নিকট হইতে হাত নামাইবার সময় উহা নিচে ছাড়িয়া দিবে না; বরং হাত নামাইবার সময়ই বক্ষস্থলে স্থাপন করিবে। ইহাই অধিকতর সহীহ নিয়ম। এই সময় হাত ঝাড়া দিবে না বা এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করিবে না। তকবীর বলার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাক্যের শেষ অক্ষর ر এর পেশকে টানিয়া পড়িবে না যাহাতে و এর উৎপত্তি হয় কিংবা اَكْبَرُ শব্দের ب অক্ষরটিকে টানিয়া এতটুকু লম্বা করিবে না যাহাতে ب এর উপরস্থ যবরটি দীর্ঘ হইয়া الف এ পরিণত হইয়া পড়ে। সন্দেহ বায়ুগ্রস্ত ও নির্বোধ লোকেরাই এইরূপ করিয়া তাকে। কথাবার্তার সময় লোকে যেমন স্বাচ্ছন্দে কথা বলে এবং কোন অক্ষরকে অযথা লম্বা করে না, নামাযেও তদ্রূপ উচ্চারণ করা উচিত। হাত বাঁধার সময় বলিবে—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা বার বার একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। ভোরে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।"

এই সময় পড়িবে—

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ হইতে বিমুখ হইয়া আল্লাহ্র দিকে রুজু হইলাম যিনি আস্মানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন! আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।" তৎপর পড়িবে—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

(হানাফী মযহাব মতে انى وجهت الخ তাহরীমা বাঁধার পূর্বে পড়া মুস্তাহাব। তাহ্রীমার পর ক্রমান্বয়ে سبحانك اعوذ بالله এবং بسم الله পড়িতে হয়)।

তৎপর সূরা ফাতিহা পড়িবে। যুক্ত হরফগুলি খুব পরিষ্কার করিয়া পড়িবে। হরফ উচ্চারণের সময় এত বাড়াবাড়ি করিবে না যাহাতে শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়। ض ও ظ এর উচ্চারণে পার্থক্য করিবে। চেষ্টা করিয়া অগত্যা অক্ষম হইলেও নামায দুরস্ত হইবে। সূরা ফাতিহা শেষ করত সামান্য পরিমাণ থামিয়া 'আমীন' বলিবে। সূরা ফাতিহার শেষে একেবারে মিলাইয়া বলিবে না। তৎপর কুরআন শরীফের যে সূরা ইচ্ছা হয় পড়িবে। মুক্তাদী না হইলে ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়িবে। তৎপর রুকূর তক্বীর এইরূপে বলিবে যেন সূরার শেষ শব্দের সহিত ইহা মিলিয়া না যায়। এই তক্বীর বলিবার সময় তক্বীরে তাহ্‌রীমার ন্যায় উভয় হস্ত কান পর্যন্ত উঠাইবে। (হানাফী-মযহাব মতে এস্থলে হাত উঠাইতে হইবে না।) ইহার পর রুকূ করিবে। রুকূতে গিয়া দুই হাতে তালু দুই জানুর উপর স্থাপন করত আঙ্গুল খোলাভাবে সোজা পশ্চিম দিকে রাখিবে। (হানাফী মতে তালু হাঁটুর উপর স্থাপনপূর্বক আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিকভাবে ফাঁক রাখিয়া দুই হাঁটু শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিতে হয়।) উভয় হাঁটু সোজা রাখিবে, এক হাঁটু অপর হাঁটুর সহিত মিলাইবে না। মাথা ও পিঠ বরাবর সমান উঁচু রাখিবে। বাহুদ্বয় পাঁজরের সহিত না চাপাইয়া দূরে রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক বাহু পাঁজরের সহিত চাপাইয়া রাখিবে। রুকূতে থাকিয়া তিন বার বলিবে— سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ "আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি।" ইমাম না হইলে এই তসবীহ সাত হইতে দশবার বলা উত্তম। তৎপর রুকূ হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইবে (হানাফী মতে এস্থলেও হাত উঠাইতে হইবে না) ও বলিবে— سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রশংসাকারীদের প্রশংসা শ্রবণ করেন।" তৎপর দণ্ডায়মান অবস্থায় বলিবে—

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَاَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلَاَمَا شِئْتَ مِنْ شَئٍ بَعْدَهٗ -

অর্থাৎ "হে প্রভো, তোমার জন্য সমস্ত আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ প্রশংসা এবং এতদ্ব্যতীত যত বস্তু তোমার ইচ্ছা সে সমস্ত পরিপূর্ণ তোমার প্রশংসা।" ফজরের ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে দো'আ কুনূত পড়িবে। (হানাফী মতে পড়িতে হয় না।) ইহার পর তকবীর বলিয়া সিজদায় যাইবে এবং শরীরের যে অঙ্গ যমীনের নিকটবর্তী সেই অঙ্গ প্রথমে যমীনের উপর স্থাপন করিবে; অর্থাৎ প্রথমে হাঁটু, তৎপর ক্রমান্বয়ে হাত, কপাল ও নাক যমীনের উপর রাখিবে। দুই হাত যমীনের উপর স্কন্ধের বরাবর রাখিবে। হাতের অঙ্গুলিগুলি খোলা রাখিবে এবং কব্জী মাটির সহিত মিলাইবে না। বাহু, পাঁজর, উরু ও পেট পরস্পর ফাঁক রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক এই সকল অঙ্গ পরস্পর মিলাইয়া রাখিবে। তৎপর তিনবার বলিবে—

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَ بِحَمْدِهٖ -

ইমাম না হইলে ততধিক বার বলাই উত্তম। তাহার পর 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া সিজদা হইতে উঠিবে এবং বাম পায়ের উপর বসিবে, দুই হাত জানুর উপর রাখিয়া বলিবে—

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَ ارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَاَجْرِنِىْ وَاعْفُ عَنِّىْ وَعَافِنِىْ -

অর্থাৎ "হে প্রভো, আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার উপর দয়া কর, আমাকে জীবিকা দান কর, আমাকে সৎপথ দেখাও, আমাকে আশ্রয় দাও, আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাকে শান্তিতে রাখ।" অতঃপর পূর্ববৎ দ্বিতীয় সিজদা করত বসিয়া তকবীর বলিয়া দাঁড়াইবে। (হানাফী মযহাব মতে দ্বিতীয় সিজদা করিয়া না বসিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিতে হইব।)

অনন্তর প্রথম রাকআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআত পড়িবে। সূরা ফাতিহার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়িবে। (হানাফী মযহাব মতে কেবল প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' পড়িতে হয়। অন্যান্য রাকআতে কেবল 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়িতে হয়।) দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর বাম পা বিছাইয়া তদুপরি বসিয়া 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িবে। এই সময় দুই হাত দুই জানুর উপর রাখিবে। কিন্তু ডান হাতের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ রাখিবে, কেবল তর্জনী অঙ্গুলি সোজাভাবে খোলা রাখিবে (হানাফী মযহাব মতে অঙ্গুলি প্রথমেই মুষ্টিবদ্ধ না করিয়া 'আশহাদু' বলিবার কালে মুষ্টিবদ্ধ করিতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলিবার সময় তর্জনী খাড়া করিয়া এক আল্লাহ্‌র দিকে ইশারা করত ইহা সোজাভাবে ছাড়িয়া দিতে হয়)। কলেমা শাহাদাত পড়িবার সময় যখন 'ইল্লাল্লাহ' বলিবে তখন তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিবে। 'লা-ইলাহা' বলিবার সময় ইশারা করিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলি খোলা রাখা দুরস্ত আছে। শেষ বৈঠকেও এইরূপ করিবে। কিন্তু উভয় পা নিচ হইতে ডান পার্শ্বে বাহির করিয়া দিবে এবং বাম নিতম্বের উপর বসিবে। (হানাফী মতে উভয় বৈঠকেই স্ত্রীলোকের জন্য এইরূপ বসিবার বিধান। পুরুষের জন্য উভয় বৈঠকের ন্যায় ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া উহার উপর বসিতে হয়।) প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িয়া দরূদ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ পর্যন্ত দাঁড়াইবে। (হানাফী মতে প্রথম বৈঠকে দরূদ পড়িতে হয় না।) কিন্তু শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর পূর্ণ দরূদ শরীফ ও মশ্‌হুর দু'আয়ে মাছুরা পড়িবে। তৎপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলিবে এবং ডান দিকে মুখ এমনভাবে ফিরাইবে যেন এই পার্শ্বস্থ পশ্চাতের

লোক মুখমণ্ডলের অর্ধাংশ দেখিতে পায়। অতঃপর এইরূপে বাম দিকেও সালাম ফিরাইবে। সালামের সময় নামায হইতে অবসর লাভের এবং মুসল্লী ও ফেরেশ্‌তাগণকে সালাম করিতেছ বলিয়া নিয়ত করিবে।

নামাযের মাক্‌রূহসমূহ ঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ সংবরণ, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ মনের একাগ্রতা নষ্ট করে এবং হৃদয়ের ভয় ও বিনয় বিনাশ করে তদ্রূপ অবস্থায় নামায পড়া মাক্‌রূহ। দুই পা পরস্পর মিলাইয়া দণ্ডায়মান হওয়া, এক পা উঁচু করা, সিজদার সময় পায়ের অগ্রভাগে বসা, দুই নিতম্বের উপর বসা, দুই জানু বুক পর্যন্ত আনয়ন করা, হাত কাপড়ের নিচে ও আস্তিনের ভিতরে রাখা, সিজদার সময় অগ্র-পশ্চাৎ দিক হইতে কাপড় টানিয়া এদিক-ওদিক করিয়া লওয়া, কাপড়ের উপর কোমরবন্ধ বাঁধা, হাত ছাড়িয়া দেওয়া ও এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা, আঙ্গুল মটকান, শরীর চুলকান, হাই তোলা, দাঁড়ি লইয়া খেলা করা, সিজদার স্থান হইতে কঙ্কর সরান, সিজদার স্থানে ফুঁক দেওয়া, আঙ্গুলসমূহ পরস্পর মিলাইয়া রাখা এবং পিঠ বাঁকা করা মাক্‌রূহ। মোটকথা, চক্ষু, হস্ত এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় বিনয় ও আদবের সহিত রাখিতে হইবে যেন নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হইয়া আখিরাতের সম্বলস্বরূপ হইতে পারে।

উপরে নামাযের যে সমস্ত আরকান বর্ণিত হইল তন্মধ্যে চৌদ্দটি ফরয—(১) নিয়ত করা, (২) তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলা, (৩) দাঁড়াইয়া নামায পড়া, (৪) সূরা ফাতিহা পড়া, (৫) রুকূ করা, (৬) রুকূ অবস্থায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, (৭) রুকূ হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান, (৮) দণ্ডায়মান অবস্থায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, (৯) সিজদা করা, (১০) সিজদা অবস্থায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা, (১১) দুই সিজদার মধ্যস্থলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসা, (১২) শেষ বৈঠক, (১৩) দরূদ শরীফ পড়া এবং (১৪) সালাম ফিরান। (হানাফী মযহাব মতে নামাযের মধ্যে ৭টি ফরয, ১৯টি ওয়াজিব এবং ২৬টি সুন্নত কাজ আছে।)

উপরে বর্ণিত কাজগুলি যথারীতি সম্পন্ন করিলে নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে; অর্থাৎ নামাযীর উপর দুনিয়াতে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে নামায কবূল হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে সংশয় থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তি বাদশাহের দরবারে নযর দিবার জন্য একটি দাসী লইয়া গেল। দাসীটির প্রাণ আছে বটে; কিন্তু তাহার নাক, কান, হাত-পা নাই। এরূপ অঙ্গহীনা দাসী বাদশাহের দরবারে গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ থাকে। (কেবল ফরয আদায় করত নামায পড়ার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ)।

নামাযের রূহ ও হাকীকত ঃ উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা নামাযের দেহ স্বরূপ। এই দেহের এক হাকীকত (মূলতত্ত্ব) রহিয়াছে; ইহাই নামাযের রূহ্ (প্রাণ)।

মোটকথা, প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক ইবাদতেরই রূহ আছে। নামাযের আসল রূহ্ না থাকিলে ইহা মৃত মানুষের প্রাণহীন দেহস্বরূপ। আসল রূহ্ থাকিলেও নামাযের আনুষঙ্গিক কার্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন না হইলে উহা চক্ষু উৎপাটিত এবং ছিন্নকর্ণ মানুষের ন্যায় অঙ্গহীন হইবে। আবার নামাযের আনুষঙ্গিক কার্যগুলি যথারীতি সম্পন্ন করিলেও ইহা প্রাণহীন হইলে এইরূপ হইবে যেমন—এক ব্যক্তির চক্ষু আছে কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নাই; কান আছে; কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নামাযে বিনয় ও একাগ্রচিত্ততা রক্ষা করাই নামাযের প্রাণ। কারণ, আল্লাহ্‌র সহিত অকপটভাবে অন্তর নিবিষ্ট রাখা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ভয়-ভীতির হৃদয়ঙ্গম করত মনে তাঁহার স্মরণকে সজীব করিয়া তোলাই নামাযের আসল উদ্দেশ্য। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ অর্থাৎ "আমার স্মরণের জন্য নামায পড়" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"এমন অনেক নামাযী আছে যাহারা পরিশ্রম ও ক্লান্তি ব্যতীত নামায হইতে আর কিছুই পায় না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের শরীর নামাযে রত রাখে বটে; কিন্তু তাহাদের মন একেবারে উদাসীন থাকে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "এমন বহু নামাযী আছে যাহাদের নামাযের এক ষষ্ঠাংশ বা এক দশমাংশ লিখিত হয়।" অর্থাৎ নামাযের যে অংশে আল্লাহ্‌র দিকে মন নিবিষ্ট থাকে কেবল সেই অংশই লেখা হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন—"কোন বন্ধুকে যেমন বিদায় দিতেছ, এইভাবে নামায পড়িবে। অর্থাৎ নামাযে স্বীয় অস্তিত্ব ও সমস্ত বাসনা-কামনা এমনকি আল্লাহ্ ব্যতীত সকল বস্তুর চিন্তা অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত করত একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন রাখিবে। এই জন্যই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—"আমি এবং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরস্পর কথাবার্তা বলিবার সময় নামাযের সময় হইলে তিনি আমাকে চিনিতেন না এবং আমিও তাঁহাকে চিনিতাম না। অর্থাৎ নামাযের সময় হওয়া মাত্রই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও ভয় তাঁহাদের শরীরের ভিতর বাহিরকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট হয় না, সেই নামাযের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টিপাত করেন না। নামায পড়িবার সময় হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের হৃদয়ের বুদবুদ শব্দ দুই মাইল দূর হইতে শোনা যাইত। নামায পড়িবার সময় রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্তর হইতে এমন টগবগ শব্দ উত্থিত হইত যেন কোন পানিপূর্ণ তাম্রপাত্র আগুনের উপর উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতেছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন তাঁহার দেহে কাঁপন উপস্থিত হইত, তাঁহার শরীরের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং তিনি বলিতেন এমন এক আমানতের বোঝা বহনের সময় আসিয়াছে যাহা সাত যমীন ও সাত আসমান বহন করিতে সক্ষম হয় নাই।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) বলেন—নামাযের মধ্যে যাহার মনে বিনয়-দীনতা না আসে, তাহার নামায সহীহ্ হয় না। হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন—একাগ্রচিত্ততার সহিত যে নামায আদায় করা হয় না তাহা আযাবের নিকটবর্তী। হযরত ইবনে জাবাল (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে থাকিয়া স্বেচ্ছায় তাহার ডান-বামের লোককে চিনিবার চেষ্টা করে তাহার নামায হইবে না। হযরত ইমাম আবূ হানিফা (রা), হযরত ইমাম শাফেঈ (রা) ও অধিকাংশ আলিম যদিও বলিয়াছেন যে, তক্‌বীরে তাহরীমা বলিবার সময় মন আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির থাকিলে এবং অন্যান্য চিন্তা হইতে মন মুক্ত রাখিয়া নামায আরম্ভ করিতে পারিলেই নামায হইয়া যাইবে; কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বোধে তাহারা এই ফতওয়া দিয়াছেন। কারণ সর্বসাধারণ লোক আজকাল নিতান্ত গাফিল হইয়া পড়িয়াছে। আর নামায হইয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা যে ফত্‌ওয়া দিয়াছেন তাহার অর্থও ইহাই যে, সেইরূপ নামাযী দুনিয়াতে শরীয়তের বিচার হইতে অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহ্‌র দরবারে অনবরত হাযির থাকে কেবল তাহাই আখিরাতের সম্বল হইতে পারে। মোটকথা, তকবীরে তাহরীমার সময় আল্লাহ্‌র দরবারে মন হাযির রাখিতে পারিলে কিয়ামতের দিন এমন নামাযীর অবস্থা একেবারে বেনামাযী অপেক্ষা ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অবস্থা বেনামাযী অপেক্ষা অধিক মন্দ হওয়ার আশঙ্কাও আছে। কারণ যে ভৃত্য প্রভুর সেবায় উপস্থিত হইয়া অবহেলা ও বেয়াদবী করে, প্রভু নিশ্চয়ই অনুপস্থিত ভৃত্য অপেক্ষা এইরূপ বেয়াদব ভৃত্যের প্রতি অধিক রাগান্বিত হইবেন এবং তাহাকে অনুপস্থিত ভৃত্য অপেক্ষা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এইজন্যই হযরত হাসান বসরী (রা) বলিয়াছেন—একাগ্রচিত্ততার সহিত যে নামায আদায় করা হয় না তাহা আযাবের নিকটবর্তী এবং সওয়াব হইতে দূরবর্তী।' হাদীস শরীফে উক্ত আছে—"যে নামাযী নিজ নামাযকে বাজে কল্পনা ও অযথা চিন্তা হইতে রক্ষা করে না, সে আল্লাহ্‌র দরবার হইতে দূরবর্তী হওয়া ব্যতীত উক্ত নামাযে কোন ফল পাইবে না।"

উপরে যে সমস্ত আয়াত, হাদীস ও বুযর্গগণের বাণী উদ্ধৃত হইল উহা হইতে অবগত হইয়াছ যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির থাকে কেবল সেই নামাযই পূর্ণ ও সজীব। আর যে নামাযে শুধু তকবীরে তাহরীমার সময় মন হাযির থাকে ইহার জীবন মাত্র মুহূর্তকাল স্থায়ী হয়। এইরূপ নামায আসন্ন মৃত্যুরোগী সদৃশ।

নামাযের আরকানসমূহের রূহ ও হাকীকত

আযান ঃ নামাযের সময় হইলে নামায সম্বন্ধে যে ধ্বনি কর্ণগোচর হয় তাহাকে আযান বলে। ইহাই নামাযের গুপ্ত রহস্যের উৎস। আযানের শব্দগুলি অতি আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে। কোনও কাজে লিপ্ত থাকিলে আযানের আওয়াজ

শোনামাত্র তাহা ত্যাগ করিবে। দুনিয়ার সকল বিষয় হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। পূর্বকালের লোকেরা এইরূপই করিতেন, অর্থাৎ দুনিয়ার সকল কাজ ছাড়িয়া আযান শ্রবণ করাকে তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালের কর্মকার লোহা পিটাইবার জন্য হাতুড়ি উঠাইয়াছে, এমন সময় আযানের শব্দ কানে আসিলে তৎক্ষণাৎ হাতুড়ি ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিত, আর লোহার উপর মারিত না। চর্মকার চামড়ার ভিতর সুতা প্রবেশ করাইয়াছে, এমন সময় আযান শুনিলে সেই অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিত, সূঁচ বাহির করার অপেক্ষাও করিত না। আযানের শব্দে কিয়ামতের ধ্বনি তাহাদের স্মরণ হইতে এবং মনে করিত, যে ব্যক্তি আযানের শব্দে সন্তুষ্টচিত্তে আজ্ঞা পালনের জন্য দৌড়াইয়া যাইবে, সে কিয়ামতের সিঙ্গাধ্বনির সুসংবাদে সন্তুষ্ট হইবে। পূর্বকালের লোকদের ন্যায় আযান শ্রবণে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলে কিয়ামতের সিঙ্গা-ধ্বনিতে তুমিও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে।

পবিত্রতা ঃ শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতাকে বাহিরাবয়বের পবিত্রতা মনে কর এবং জানিয়া রাখ যে, অনুতাপের সহিত সমস্ত মন্দ স্বভাব হইতে হৃদয়কে পবিত্র করাই বাহ্য পবিত্রতার প্রাণ। কারণ আল্লাহ্র লক্ষ্যস্থল হৃদয়। নামাযের বহিরাকৃতির স্থান দেহ, আর নামাযের হাকীকতের স্থান হইল হৃদয়।

সতর ঢাকা ঃ শরীরের গুপ্ত অঙ্গসমূহ লোকচক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখাই সতর ঢাকার তাৎপর্য। ইহার রহস্য ও প্রাণ হইল যাহা তোমাদের অন্তরে মন্দ তাহা আল্লাহ্র দৃষ্টি হইতে গোপন রাখা। আর ইহাও জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্র দৃষ্টি হইতে কিছুই গোপন রাখা যায় না। অন্তরকে সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র করাই ইহার প্রকৃত অর্থ। অন্তরকে পবিত্র করার উপায় এই—পূর্বকৃত গোনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে এবং দৃঢ়সংকল্প হইবে যে, পুনরায় আর কখনও গোনাহ্ করিবে না।

হাদীসে আছে ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهُ -

অর্থাৎ "পাপ হইতে তওবাকারী একেবারে নিষ্পাপ হইয়া যায়।" অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানের পর তওবা করিলে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়। আর একান্তই যদি অনুতাপের সহিত পাপ বর্জন না করা যায় তবে পাপকে ভয় ও লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া ভীত ও বিমর্ষ হৃদয়ে এমনভাবে আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে যেন কোন ভৃত্য অপরাধ করত পলাইয়া গিয়া আবার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং লজ্জা ও অপমানের কারণে মস্তক উত্তোলন করে না।

কিবলামুখী হওয়া ঃ ইহার প্রকাশ্য অর্থ হইল অপর সমস্ত দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবল কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা। কিন্তু ইহার তাৎপর্য হইল উভয়

জগত হইতে মনের সংযোগ ছিন্ন করত কেবল আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ স্থাপন করা যাহাতে বাহির ও ভিতরের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয়। কা'বা শরীফে যেমন বাহিরের একমাত্র কিবলা তদ্রূপ আল্লাহ্‌ও অন্তরের একমাত্র কিবলা। নামাযের মধ্যে অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর চিন্তায় লিপ্ত করা নামাযে থাকিয়া মুখ এদিক-ওদিক ফিরানতুল্য। মুখ এদিক-ওদিক ফিরাইলে যেমন নামাযের বাহ্য আকৃতি নষ্ট হয় তদ্রূপ মন এদিক-ওদিক বিচরণ করিলেও নামাযের প্রাণ ও মূল স্বরূপ বিনষ্ট হয়। এই জন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মুখ, অন্তর ও প্রবৃত্তি এই তিনটিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট রাখে সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নামায হইতে বাহির হইয়া আসে।" অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ-খণ্ডন হইয়া যায় এবং সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া পড়ে। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, নামাযের মধ্যে মুখ কিবলা হইতে অন্য দিকে ফিরাইলে নামাযের বাহ্য আকৃতি যেমন নষ্ট হয়, আল্লাহ্‌র দিক হইতে মনের ধ্যান অন্যমুখী করত সাংসারিক চিন্তা মনে স্থান দিলে নামাযের প্রাণ ও সারবস্তু তদ্রূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনকে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট রাখা অতি উত্তম। কারণ বাহির ভিতরের আবরণস্বরূপ। আবরণের ভিতর যাহা ঢাকিয়া রাখা হয় তাহাই মূল উদ্দেশ্য; এতদ্ব্যতীত আবরণের নিজস্ব মূল্য নিতান্ত অল্প।

নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া ঃ ইহার প্রকাশ্য অর্থ, অবনত মস্তকে আজ্ঞাবহ গোলামের ন্যায় আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া। ইহার তাৎপর্য হইল যাবতীয় চিন্তা ও কল্পনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করত বিনয় ও দীনতা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নিজকে তাঁহার আদেশ পালনার্থে প্রবৃত্ত রাখা। তদসঙ্গে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে হাযির ও দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং সেই দিন তোমার সমস্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আরও ভাবিবে যে, এখনও আল্লাহ্‌র নিকট তোমার সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে বিদিত আছে এবং তোমার অন্তরে যাহা কিছু ছিল ও আছে সবই তিনি জানেন ও দেখেন; আর তোমার ভিতর-বাহিরের সব কিছুই তিনি ভালরূপে অবগত আছেন। যদি কোন নেককার লোক তুমি কিরূপে নামায পড় তাহা লক্ষ্য করেন তবে তুমি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত করিয়া লও, এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত কর না, নামাযে তাড়াতাড়ি করা ও এদিক-সেদিকে দৃষ্টি করাকে লজ্জাজনক মনে কর। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র চক্ষের সম্মুখে তুমি নামাযে দণ্ডায়মান রহিয়াছ, অথচ তাঁহাকে লজ্জা ও ভয় কর না। দুর্বল মানুষ যাহার কোন ক্ষমতাই নাই তাহার সম্মুখে তুমি লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়, তাহাকে দেখিয়া তুমি বিনীত হও; কিন্তু সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিকে তুমি মোটেই ভয় কর না, তাঁহার দৃষ্টিকে মানবের

দৃষ্টি অপেক্ষা সহজ মনে কর, ইহার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র নিকট কিরূপ লজ্জিত হওয়া উচিত?" তিনি বলিলেন, "নিজ পরিবারের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ও পরহেযগার তাঁহাকে তুমি যেমন লজ্জা কর আল্লাহ্কেও তদ্রূপ লজ্জা কর।" এইরূপ সম্মান প্রদর্শনের কারণেই অধিকাংশ সাহাবা (রা) নামাযে এমন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন যে, তাঁহাদিগকে প্রস্তর মনে করিয়া পাখি তাঁহাদের মস্তকের উপর বসিত এবং উড়িয়া যাইত না। যাঁরার হৃদয়ে আল্লাহ্র মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তাঁহাকে দেখিতেছেন বলিয়া যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয় ও আদবে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে লোককে দাড়ি নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া বলিতেন—"তাহার অন্তরে বিনয় থাকিলে তাহার হাতও অন্তরের সেই গুণে গুণান্বিত হইত।"

রুকূ-সিজদা ঃ শরীরের অঙ্গপ্র-ত্যঙ্গ দ্বারা বিনয় প্রকাশই রুকূ-সিজদার প্রকাশ্য অর্থ। কিন্তু অন্তরের বিনয়ই ইহার আসল উদ্দেশ্য। ইহা সর্বজনবিদিত যে, সিজদার অর্থ হইল শরীরের সর্বোত্তম অঙ্গ মাটিতে স্থাপন করা এবং মাটি অপেক্ষা হীন ও নীচ আর কোন পদার্থই নাই। রুকূ-সিজদা এই জন্য নির্ধারিত হইয়াছে যে, তুমি জানিতে পারিবে, মাটিই তোমার মূল পদার্থ এবং পরিশেষে তোমাকে মাটির সঙ্গেই মিশিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিলে মাটির যেমন অহংকার নাই তদ্রূপ তোমারও অহংকার থাকিবে না এবং নিজের অসহায়তা ও দীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

নামাযের প্রত্যেক কাজেই তদ্রূপ এক একটি মর্মার্থ আছে। ইহা হাসিলে অবহেলা করিলে নামাযের বাহ্য অবয়ব ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না।

কিরআত ও নামাযে যিকিরসমূহের হাকীকত ঃ নামাযে যে সকল কলেমা পাঠ করা হয় উহার প্রত্যেকটিরই এক একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। ইহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক যেন নামাযীর মন সেই তাৎপর্যের অনুরূপ হয় এবং নামাযী নিজ উক্তিতে সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, যেমন 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটির অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা হইতে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে। এই অর্থ যে না জানে সে মূর্খ। আবার এই অর্থ জানা থাকিলেও তাহার অন্তরে অন্য কোন পদার্থ আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা থাকিলে 'আল্লাহু আকবার' উক্তিতে সে মিথ্যাবাদী। এইরূপ নামাযীকে বলা হইবে, এই বাক্যটি তো নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু তুমি মিথ্যা বলিতেছ। মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি অধিক অনুগত হইলে তাহার নিকট সেই পদার্থটি আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যাহার প্রতি সে আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে উহাকেই' তাহার উপাস্য ও আল্লাহ্ বলা যাইতে পারে। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَرَ اَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ -

অর্থাৎ "তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে?' وجهت وجهى বলার মর্মার্থ এই, 'আমি সমস্ত বিশ্বজগত হইতে অন্তরকে ফিরাইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে ইহাকে নিবিষ্ট করিলাম।' এই সময় হৃদয় অন্য কোন পদার্থের দিকে আকৃষ্ট থাকিলে এই উক্তি মিথ্যা হইল। আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাতের সময় প্রথমে উক্তিটিই মিথ্যা হইলে ইহার বিপদ অতি সুস্পষ্ট। অতঃপর 'হানিফাম মুসলিমান' বলিবার সময় মুসলমান বলিয়া দাবি করা হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তির হস্ত ও রসনা হইতে লোকে নিরাপদে থাকে সে-ই প্রকৃত মুসলমান।" অতএব, 'হানীফাম মুসলিমান' শব্দসমূহ উচ্চারণকারী হাদীসোক্ত গুণে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক অথবা এইরূপে উক্তি করিবার সময় অন্তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, 'এখন হইতে আমি ঐ গুণে বিভূষিত হইব।' 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলিবার সময় আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহরাশি স্মরণপূর্বক হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার ভাব বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কারণ, এই কলেমাটি কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক এবং হৃদয় দ্বারাই কৃতজ্ঞতা হইয়া থাকে। اياك نعبد বলিবার সময় অকপটতার ভাব হৃদয়ে সজীব করিয়া তোলা কর্তব্য। اهدنا বলার সময় হৃদয় হইতে মিনতি ও ক্রন্দনের রোল উত্থাপন করা উচিত। কারণ, এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট সৎপথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এইরূপ নামাযের মধ্যে তাসবীহ, তাহলীল, কিরাআত ইত্যাদি যাহা কিছু পাঠ করা হয়, তৎসমুদয় উচ্চারণকালে ঐ সমস্তের অর্থানুযায়ী ভাব গ্রহণ করা এবং অন্তরকে তদনুরূপ গুণে বিভূষিত করা কর্তব্য। এই সকলের বিবরণ অতি বিস্তৃত। নামায দ্বারা সৌভাগ্য লাভের আশা করিলে উল্লিখিতভাবে হৃদয়কে বিভূষিত করিতে হইবে। অন্যথায় অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত আর কোন লাভই হইবে না।

নামাযে একাগ্রতা লাভের উপায় ঃ দুই কারণে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়। (১) বাহ্য কারণ ও (২) আভ্যন্তরিক কারণ। বাহ্য কারণ এই—কারণ নামাযের স্থানে দর্শন-শ্রবণের কোন কিছু বিদ্যমান থাকিলে মন সেই দিকে ধাবিত হয়। কেননা, মন চক্ষু-কর্ণের অধীন। জনশূন্য নীরব স্থানে নামায পড়িলে মন অন্য দিকে আকৃষ্ট হয় না। স্থান অন্ধকার হইলে বা চক্ষু বন্ধ করিয়া লইলে গভীর মনোনিবেশের জন্য উত্তম। অধিকাংশ আবেদ ইবাদতের জন্য অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ তৈয়ার করিয়া লইতেন। কারণ, প্রশস্ত গৃহে মন এদিক-সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। হযরত ইবনে উমর (রা) নামাযে দাঁড়াইবার পূর্বে কুরআন শরীফ, তরবারি প্রভৃতি যাহা কিছু সঙ্গে থাকিত সমস্তই মন সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় দূরে সরাইয়া রাখিতেন।

আভ্যন্তরিক কারণ হইল নানাবিধ দুশ্চিন্তা এবং ভয় ও আশঙ্কাজনিত চিত্তচাঞ্চল্য। ইহার প্রতিকার অতি দুঃসাধ্য ও নিতান্ত কঠিন। আভ্যন্তরিক কারণও আবার দুই প্রকার—(১) কোন কাজের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ। প্রথমে কাজটি সমাধা করিয়া তৎপর নামাযে দণ্ডায়মান হওয়াই এই আকর্ষণ দূরীকরণের উপায়। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ ـ

অর্থাৎ "আহার ও ইশার নামাযের সময় একযোগে উপস্থিত হইলে প্রথমে আহার করিয়া লইবে।" এইরূপ কোন কথা বলার প্রয়োজন থাকিলে তাহাও বলিয়া শেষ করত তৎপর নিশ্চিন্ত মনে নামাযে দাঁড়াইবে। (২) যে কাজের চিন্তা ও আশংকা অল্পক্ষণের মধ্যে নিঃশেষ হইতে পারে না অথবা এমন অনাহুত বাজে কল্পনারাশি যাহা অভ্যাসগতভাবে আপনা আপনিই অন্তররাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছে, এই জাতীয় চিন্তা দূর করিবার উপায় এই—নামাযে যে সমস্ত তাসবীহ ও কিরাআত পাঠ করা হয় উহার অর্থের দিকে মনোনিবেশ করা। অর্থের দিকে ধ্যান রাখিলে হয়ত ঐ সমস্ত অনাহুত কল্পনা দূর হইয়া যাইবে। সেই কল্পনারাশি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া না পড়িলে এবং কোন কার্যের প্রতি মনের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল না হইয়া উঠিলে অর্থের দিকে মনোনিবেশের ফলে মনের ঐ সকল খেয়াল ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু খাহেশ অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থের প্রতি মনোনিবেশের দ্বারা উহা বিদূরিত হইবে না। জোলাপ ব্যবহারে ইহার মূল অন্তর হইতে ছিন্ন করিতে হইবে। ইহার ব্যবস্থা এই—যে পদার্থের আকর্ষণ বা কল্পনা মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বর্জন করা যেন ইহার চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইতে পার। কোন আকর্ষণীয় বস্তু সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করিলে ইহার চিন্তা হইতে কখনই মুক্ত থাকা যায় না.। এমতাবস্থায় নামাযেও সেই চিন্তা সর্বদা মনের সহিত বিজড়িত থাকে। এরূপ নামাযীর অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নিচে উপবেশন করিল এবং চড়ুই পাখির চেঁচামেচি হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় ইহাদিগকে লাঠি দ্বারা তাড়াইতে আরম্ভ করিল। তাড়া পাইয়া ইহারা উড়িয়া গেল বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিরিয়া আসিয়া বৃক্ষে উপবেশনপূর্বক কিচির-মিচির আরম্ভ করিয়া দিল। পাখির কিচির-মিচির হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলা উচিত। কারণ, বৃক্ষটি যতকাল বিদ্যমান থাকিবে ততকাল পাখি আসিয়া উহাতে বসিবেই। তদ্রূপ কোন কার্যের আকর্ষণ যতদিন মনের মধ্যে প্রবলভাবে বদ্ধমূল থাকিবে ততদিন সেই বিষয়ক নানাবিধ অনাহুত চিন্তা উদিত হইয়া মনকে পেরেশান করিতে থাকিবে। এক ব্যক্তি রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে একখানা উত্তম বস্ত্র উপহার দিলেন। ইহাতে একটি বড় বোটা অতি

চমৎকার ছিল। নামাযের সময় হযরত (সা)-এর দৃষ্টি বোটার উপর পড়িল। উক্ত কারণেই নামায শেষ হইলে তিনি বস্ত্রটি দেহ মোবারক হইতে খুলিয়া প্রদানকারীকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের পুরাতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। একবার তাঁহার পবিত্র পাদুকাদ্বয়ে নূতন ফিতা লাগান হইল। নামায পড়িবার সময় সেই ফিতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে উহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে তিনি নূতন ফিতা খুলিয়া ফেলিয়া পূর্বতন পুরাতন ফিতা লাগাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। একবার তাঁহার জন্য একজোড়া নূতন পাদুকা তৈয়ার করা হইল। তাঁহার নিকট উহা সুন্দর বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি সিজদায় যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আল্লাহ্, তোমার নিকট সকাতরে মিনতি করি, এই পাদুকাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করার অপরাধে আমাকে শত্রু মনে করিও না।" তৎপর তিনি বাহিরে আসিয়া সর্বপ্রথমে যে ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই পাদুকা জোড়াটি দান করিলেন।

একদা হযরত তাল্‌হা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু নিজ বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। হঠাৎ বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে উড্ডীয়মান এক সুন্দর পাখির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পাখিটি বাহির হইবার পথ পাইতেছিল না। তাঁহার মন এই দিকে আকৃষ্ট হইল এবং কত রাকআত নামায পড়িলেন তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। তৎপর তিনি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলেন এবং ঐ অপরাধের কাফ্‌ফারাস্বরূপ উক্ত বাগানটি গরীব-দুঃখীর জন্য দান করিয়া দিলেন। পূর্বকালের বুযর্গগণ এইরূপ কার্যই করিতেন এবং উহাকে মনের একাগ্রতা রক্ষার উপায় মনে করিতেন।

মোটকথা, নামাযের প্রথম হইতে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মন আচ্ছন্ন না হইলে নামাযে একাগ্রচিত্ত হওয়া যায় না। আর যে চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে নামায দ্বারা তাহা বিদূরীত হয় না। একাগ্রচিত্ততার সহিত নামায পড়িতে চাহিলে নামাযের পূর্বেই হৃদয়ের চিকিৎসা করত নীরোগ অন্তরে নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। অন্তরকে রোগমুক্ত করিতে হইলে দুনিয়ার চিন্তা অন্তর হইতে দূর করিতে হয় এবং আবশ্যক পরিমাণ দুনিয়ার বস্তুতে পরিতুষ্ট থাকিতে হয়। আর নিশ্চিত মনে ইবাদতের সুযোগ লাভই আবশ্যক পরিমাণ পার্থিব সম্পদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অন্যথায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নামাযে একাগ্রতা রক্ষা পাইবে না; বরং নামাযের কিছু অংশে একাগ্রতা রক্ষা হইবে। এমতাবস্থায় নফল নামাযের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে এবং এইরূপে একাগ্রতা রক্ষার চেষ্টা করিবে। মনে কর, চার রাকআত নামায পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছ; কিন্তু নামাযের মধ্যে একাগ্রতা নষ্ট হইল। এরূপ ক্ষেত্রে নফল নামাযের পরিমাণ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করিবে। কারণ, নফল নামাযে এই জাতীয় ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে।

জামাআত সুন্নত হওয়ার প্রমাণ ঃ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"জামাআতের সহিত এক নামায একাকী সাতাইশ নামাযের সমান।" তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে পড়িল সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে কাটাইল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়িল সে যেন সমস্ত রাত্র ইবাদতে কাটাইল।" তিনি আরও বলেন—"যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায জামাআতে পড়িল এবং প্রথম তকবীর ছুটিল না, সে দুইটি বিষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে—(১) কপটতা ও (২) দোযখ।" এই জন্যই পূর্বকালের বুযর্গগণের মধ্যে যাহার প্রথম তকবীর ছুটিয়া যাইত তিনি একাধারে তিন দিন শোক করিতেন এবং জামাআত ছুটিয়া গেলে সাত দিন ব্যাপিয়া শোক করিতেন। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রাঃ) বলেন—"আমি বিশ বৎসর যাবৎ আযানের পূর্বে মসজিদে পৌঁছিয়াছি।" অধিকাংশ আলিম বলেন—"যে ব্যক্তি বিনা ওযরে একাকী নামায পড়ে তাহার নামায দুরস্ত হয় না।" অতএব জামাআতে নামায পড়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানা উচিত।

ইমাম ও মুকতাদীরূপে নামাযের নিয়ম ঃ ইহার নিয়ম জানিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মুকতাদিগণের আন্তরিক সন্তোষের সহিত ইমামত করা উচিত। তাহারা যাহাকে ঘৃণা করে তাহার ইমামত করা উচিত নহে। আবার মুকতাদিগণ কাহাকেও ইমাম বানাইলে বিনা ওযরে ইমামত অস্বীকার করাও তাহার পক্ষে উচিত নহে। কারণ, ইমামতের ফযীলত আযান দেওয়ার ফযীলত অপেক্ষা অনেক বেশি। ইমামত করিতে হইলে পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতার দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং নামাযের সময়ের প্রথম ভাগে নামায পড়িতে হইবে। জামাআতের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করা উচিত নহে; কেননা সময়ের প্রথমভাগের ফযীলত জামাআতের ফযীলত অপেক্ষা অধিক। জামাআতের জন্য দুইজন উপস্থিত হইলে সাহাবাগণ তৃতীয় জনের অপেক্ষা করিতেন না এবং জানাযার নামাযের জন্য চারিজন উপস্থিত হইলে পঞ্চম জনের অপেক্ষা করিতেন না। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একদা জামাআতে আসিতে বিলম্ব হইল। সাহাবা (রা)-গণ তাহার অপেক্ষা না করিয়া হযরত আবদুর রহ্‌মান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। এক রাকআত নামায পড়া হইয়া গেলে রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জামাআতে শামিল হইলেন। নামায শেষে তাঁহাকে দেখিয়া সাহাবাগণ ভীত হইলেন। হযরত (সা) তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা উত্তম কাজ করিয়াছ। সর্বদা এইরূপই করিবে।"

একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইমামত করিবে, ইমামতের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না। কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত তকবীর বলিবে না। নামাযের সমস্ত তকবীর উচ্চস্বরে বলিবে। ইমাম জামাআতের সওয়াব লাভের আশায়

ইমামতের নিয়ত করিবে। ইমামতের নিয়ত না করিলে জামাআত দুরস্ত হইবে; কিন্তু ইমাম জামাআতের সওয়াব পাইবে না। মাগরিব, ইশা, ফজরের নামাযের প্রথম দুই রাকআতে এবং জুম'আ ও উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়িবে। নামাযের মধ্যে তিন বার তিন স্থানে বিরাম লইবে—(১) তকবীরে তাহরীমা বাঁধিয়া انى وجهت وجهى الخ পড়িবার পর; এই সময় মুকতাদিগণ সূরা ফাতিহা পড়িতে আরম্ভ করিবে; (২) সূরা ফাতিহা পড়িবার পর একটু বিরাম লইয়া অন্য সূরা পড়িবে। যে সকল মুকতাদী সূরা ফাতেহা পূর্ণ করে নাই বা মোটেই পড়ে নাই, তাহারা এই অবসরে সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করিয়া লইবে। (হানাফী মতে মুকতাদীদের সূরা ফাতিহা পড়িতে হয় না)। (৩) কিরাআত সমাপ্ত হইলে এতটুকু বিরামের পর রুকূতে যাইবে যাহাতে রুকূর তকবীর সূরার সাথে মিলিয়া না যায়। মুকতাদী ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছুই পড়িবে না কিন্তু দূরে থাকার কারণে ইমামের কিরাআত শুনিতে না পাইলে এবং ইমাম রুকূ-সিজদায় তাড়াতাড়ি করত তিনবারের অধিক তসবীহ্ না বলিলে পড়া যাইতে পারে।

হযরত আনাস (রা) বলেন যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামাযের ন্যায় হালকা ও পূর্ণ নামায আর কাহারও ছিল না। জামাআতে বৃদ্ধ, দুর্বল বা এমন লোক থাকিতে পারে যাহার কোন অত্যাবশ্যক কাজ আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি নামায হালকা করিতেন। মুক্তাদী ইমামের একেবারে সমানে সমানে কোন রুকন আদায় না করিয়া একটু পরে করিবে। যেমন, ইমামের কপাল ভূমিতে লাগিবার পূর্বে মুক্তাদী রুকূতে যাইবে না। ইহাকেই ইমামের অনুসরণ বলে। মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকূ-সিজদায় গেলে তাহার নামায বাতিল হইবে। সালাম ফিরাইবার পর এই দু'আ পড়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعٰلَيْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমিই শান্তি, তোমা হইতেই শান্তি আগমন করে এবং তোমার দিকেই শান্তি প্রত্যাবর্তন করে। অনন্তর হে আল্লাহ্ আমাদিগকে শান্তির সহিত জীবিত রাখ এবং আমাদিগকে শান্তির আলয়ে প্রবেশ করাও হে আল্লাহ্, তুমি মঙ্গলময় তুমি অতি মহান, হে প্রতাপশালী ও করুণা সিন্ধু।" তৎপর অবিলম্বে মুক্তাদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মুনাজাত করিবে। জামাআত হইতে ইমামের পূর্বে উঠিয়া যাওয়া মাকরূহ; কাজেই ইমামের পূর্বে মুকতাদী উঠিবে না।

জুম'আ নামাযের ফযীলত ঃ শুক্রবার শ্রেষ্ঠ দিন এবং ইহার ফযীলত অনেক। ইহা মুসলমানদের ঈদের দিন। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম'আ কাযা করিল সে ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং তাহার হৃদয়ে মরিচা পড়িয়া গেল।' হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, শুক্রবারে আল্লাহ্ ছয় লক্ষ বান্দাকে দোযখ হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন। হযরত (সা) বলেন—প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোযখের আগুনকে অধিক মাত্রায় প্রজ্বলিত করা হয়; এই সময় নামায পড়িও না। কিন্তু শুক্রবারে তাহা করা হয় না। তিনি আরও বলেন—যে ব্যক্তি শুক্রবারে ইন্তেকাল করে সে শহীদের সওয়াব পাইবে এবং কবর আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবে।

জুম'আর নামাযের শর্ত ঃ অন্যান্য নামাযের যে সমস্ত শর্ত আছে জুম'আর নামাযের জন্য সেই সকল শর্ত তো আছেই, তদুপরি জুম'আর জন্য আরও ছয়টি শর্ত রহিয়াছে ঃ (১) সময়। ইমাম জুম'আর নামাযের সালাম ফিরাইবার পূর্বে আসরের সময় আসিয়া পড়িলে জুম'আর নামায নষ্ট হইবে; এমতাবস্থায় জোহরের নামায পড়িতে হইবে। (২) স্থান। জুম'আর নামায ময়দানে ও তাঁবুর মধ্যে দুরস্ত নহে; বরং ইহার জন্য শহর হইতে হইবে; অথবা যে গ্রামে কমপক্ষে চল্লিশজন স্বাধীন, বুদ্ধিমান, বালেগ ও স্থায়ী পুরুষ বাসিন্দা বাস করে এমন স্থানে মসজিদে না পড়িয়া অন্য জায়গায় পড়িলেও জুম'আর নামায দুরস্ত হইবে। (৩) মুসল্লীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে চল্লিশজন বুদ্ধিমান, বালেগ, স্বাধীন ও স্থায়ী পুরুষ বাসিন্দা জামাআতে উপস্থিত না হইলে জুম'আর নামায দুরস্ত হইবে না। (হানাফী মতে ইমাম ব্যতীত তিনজন পুরুষ উপস্থিত হইলেই নামায দুরস্ত হইব)। খুৎবার সময় কিংবা নামাযে ইহা অপেক্ষা কম লোক উপস্থিত হইলেই বুঝিবে যে, নামায দুরস্ত হইবে না। (৪) জামাআত। উক্ত সংখ্যক লোক পৃথক পৃথক নামায পড়িলে নামায দুরস্ত হইবে না। কোন ব্যক্তি শেষ রাকআত পাইলে অপর এক রাকআত একাকী পড়িলেও তাহার নামায সহীহ্ হইবে। দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ না পাইলে ইমামের পিছনে ইকতেদা করিবে বটে, কিন্তু জোহরের নামাযের নিয়ত করিবে। (৫) অন্য লোকেরা যেন, প্রথমে জুম'আর নামায পড়িয়া না ফেলে। কারণ, একই শহরে জুম'আর জামাআত একবারের অধিক হওয়া উচিত নহে। কিন্তু শহর যদি এত বড় হয় যে, এক জামে মসজিদে সমস্ত মুসল্লীর স্থান সংকুলান না হয় অথবা দূর-দূরান্ত হইতে সকল মুসল্লীর পক্ষে ঠিক সময়ে মসজিদে আসা কষ্টকর হয়, তবে একই শহরে একাধিক জুম'আর জামাআত করাতে কোন দোষ নাই। একই মসজিদে বিনা কষ্টে শহরবাসী সকল লোকের সমাবেশ হইলেও যদি একাধিক মসজিদে নামায পড়া হয় তবে যে জামাআত তাকবীরে তাহরীমা আগে বাঁধিয়াছে সেই জামাআতের নামাযই সহীহ্ হইবে। (৬) নামাযের পূর্বে দুই খুৎবা

পড়া ফরয। দুই খুৎবার মধ্যে কিছুক্ষণ বসাও ফরয। উভয় খুৎবা দাঁড়াইয়া পড়াও ফরয। প্রথম খুৎবার মধ্যে চারিটি ফরয—(ক) আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করা। এইজন্য 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলাই যথেষ্ট। (খ) দরূদ শরীফ পাঠ করা। (গ) আল্লাহ্কে ভয় করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করা। এইজন্য أُوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰه "আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেছি" বলিলেই যথেষ্ট। (ঘ) কুরআন শরীফের এক আয়াত পাঠ করা। দ্বিতীয় খুৎবাতেও চারিটি ফরয আছে। প্রথম খুৎবার প্রথমোক্ত তিনটি এবং অপরটি হইল আয়াতের পরিবর্তে কোন দু'আ পড়া। স্ত্রীলোক, ক্রীতদাস নাবালেগ ও মুসাফিরের উপর জুম্'আর নামায ফরয নহে।

ওযরে জুম'আর নামায না পড়া জায়েয ঃ পথে ভয়ানক কাদা, বৃষ্টি, নিজে পীড়িত হওয়া কিংবা কোন নিঃসহায় রোগীর সেবা-শুশ্রূষা-কার্যে আবদ্ধ থাকার দরুন জুম'আর নামাযে হাযির হইতে অক্ষম হইলে জুম'আর নামায না পড়া জায়েয আছে। কিন্তু এইরূপ ওযরবিশিষ্ট লোকের পক্ষে জুম'আর নামায শেষ হওয়ার পর জোহরের নামায পড়া উত্তম।

জুম'আর আদবসমূহ ঃ জুম'আর দিনের যথাযথ সম্মান করা উচিত। জুম'আর দিনে দশটি সুন্নত ও নিয়ম পালনে তৎপর হওয়া আবশ্যক। (১) বৃহস্পতিবারে সমস্ত সামান ঠিক করত আন্তরিক আগ্রহের সহিত জুম'আর দিনকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে—যেমন, সাদা বস্ত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে। হাতের কর্তব্য কর্মসমূহ সমাধা করিয়া ফেলিবে যেন পরদিন প্রাতে মসজিদে উপস্থিত হইতে পারে। বৃহস্পতিবার আসরের সময় অন্তর হইতে পার্থিব সকল চিন্তা দূর করত তাসবীহ্ ও ইস্তেগফারে ব্যাপৃত হইবে। কারণ, এই সময়ের ফযীলত খুব বেশি। পর দিবস জুম'আর ফযীলতের মতই এই সময়ের ফযীলত। আলিমগণ বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা সুন্নত যেন জুম'আর দিনে উভয়ের উপর গোসল ফরয হইয়া পড়ে। (২) নামাযের সময়ের পূর্বেই মসজিদে যাইতে চাহিলে প্রাতেই গোসল সম্পন্ন করিবে; অন্যথায় বিলম্বে গোসল করাই উত্তম। জুম'আর দিনে গোসলের জন্য রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খুব তাকিদের সহিত নির্দেশ দিয়াছেন। এই কারণে কতিপয় আলিম জুম'আর গোসলকে ফরয মনে করিয়াছেন এবং মদীনাবাসিগণ কাহাকেও কঠোর গালি দিবার ইচ্ছা করিলে বলেন, "যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে না তুমি সেই ব্যক্তি হইতেও মন্দ।" জুম'আর দিনে ফরয গোসলের আবশ্যক হইলে গোসলের সময় জুম'আর গোসলের নিয়তে কিছু পানি শরীরে ঢালিয়া দেওয়া উত্তম। একই গোসলে অপবিত্রতা দূরীকরণ এবং জুম'আর সুন্নত গোসল, এই উভয়বিধ নিয়ত করিলেই যথেষ্ট হইবে; ইহাতে জুম'আর গোসলের সওয়াবও পাওয়া যাইবে। (৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া পবিত্র পোশাক

পরিধান করত পরিপাটি ও সুন্দর বেশে মসজিদে যাইবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, মাথার চুল মুণ্ডাইবে, নখ কাটিবে, গোঁফ ছাটিবে। ইতিপূর্বে হাম্মামে এই সমস্ত কাজ করিয়া থাকিলে উহাই যথেষ্ট। পরিপাটি হওয়ার অর্থ এই যে, সাদা পোশাক পরিধান করিবে, কারণ, সাদা পোশাক আল্লাহ্ সর্বাধিক পছন্দ করেন এবং মসজিদ ও নামাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে। ইহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে। অন্যথায় দুর্গন্ধে অপর লোকে বিরক্ত হইয়া গীবত করিবে। (৪) প্রত্যুষেই জামে মসজিদে চলিয়া যাইবে; ইহার ফযীলত খুব বেশি। প্রাচীনকালের লোকেরা প্রদীপ জ্বালাইয়া অতি প্রত্যুষে মসজিদে গমন করিতেন। ফলে যাত্রীদের এত ভিড় হইত যে, পথচলা দুষ্কর হইত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) একদা তিন ব্যক্তিকে তাঁহার পূর্বে মসজিদে উপস্থিত দেখিয়া নিজের উপর রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি চতুর্থ পর্যায়ে পড়িলাম। আমার পরিণাম কি হইবে?" কথিত আছে যে, অতি প্রত্যুষে মসজিদে গমনের রীতি পরিত্যাগরূপ বিদ্আতই ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানগণ শনি ও রবিবারে অতি প্রত্যুষে নিজ নিজ উপাসনালয়ে গমন করিয়া থাকে অথচ মুসলমানগণ নিজেদের জুম্'আর দিনে প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে না। এমতাবস্থায় তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে?

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম্'আর মসজিদে সর্বপ্রথম উপস্থিত হইবে সে একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাইবে; দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি গরু কুরবানীর এবং তৃতীয় ব্যক্তি একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব লাভ করিবে। আর চতুর্থ ব্যক্তি একটি মোরগ ও পঞ্চম ব্যক্তি একটি ডিম দান করার সওয়াব পাইবে। ইমাম খুৎবার জন্য স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলে কুরবানীর সওয়াব লিখক ফেরেশতা কাগজ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া খুৎবা শ্রবণে লিপ্ত হন। ইহার পর যাহারা মসজিদে আসে তাহারা নামাযের সওয়াব ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সওয়াব পায় না। (৫) মসজিদে বিলম্বে আসিয়া অপরের ঘাড়ে পা রাখিয়া সম্মুখের সারির দিকে যাওয়া উচিত নহে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পিছন হইতে উল্লম্ফনপূর্বক সম্মুখের সারিতে যায়, কিয়ামতের দিন তাহাকে পুলের আকারে স্থাপন করিয়া অন্য লোককে তাহার উপর দিয়া পার করা হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এরূপ উল্লম্ফনপূর্বক সম্মুখের সারিতে গিয়া নামায শেষ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জুম'আর নামায কেন পড়িলে না?" সে ব্যক্তি নিবেদন করিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তো আপনার সঙ্গেই নামায পড়িলাম।" হযরত (সা) বলিলেন—"আমি দেখিলাম, অপরের ঘাড়ে পা রাখিয়া তুমি সম্মুখের সারিতে চলিয়া গেলে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে সে যেন নামাযই পড়ে নাই।" সামনের সারিতে শূন্যস্থান থাকিলে তথায় যাওয়ার চেষ্টা করা দুরস্ত আছে। কারণ

সম্মুখের সারিতে স্থান শূন্য রাখিয়া যাহারা পিছনে দাঁড়াইয়াছে সে-ত্রুটি তাহাদের। (৬) নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাইবে না। কারণ, নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাওয়া নিষেধ। হাদীস শরীফে আছে যে, নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করা অপেক্ষা মাটি হইয়া বরবাদ হওয়া ভাল। (৭) প্রথম সারিতে স্থান লাভের চেষ্টা করিবে। তাহা সম্ভব না হইলে ইমামের যত নিকটে দাঁড়ান যায় ততই ভাল। ইহাতে বড় ফযীলত আছে। কিন্তু প্রথম সারিতে সৈন্য কিংবা রেশমী পোশাক পরিহিত লোক থাকিলে অথবা স্বয়ং খুৎবা পাঠকারী কাল বর্ণের রেশমী পোশাক পরিহিত থাকিলে, কিংবা তাহার তরবারিতে স্বর্ণের কারুকার্য থাকিলে অথবা অপর কোন মন্দ কার্য পরিলক্ষিত হইলে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। কারণ, যে-স্থানে মন্দ আচরণ অনুষ্ঠিত হয় তথায় ইচ্ছাপূর্বক বসা উচিত নহে। (৮) ইমাম খুৎবা পাঠের জন্য প্রস্তুত হইলে কাহারও কথাবার্তা বলা উচিত নহে; বরং আযানের শব্দের উত্তর প্রদান এবং খুৎবা শ্রবণে মনোনিবেশ করা সকলেরই কর্তব্য। কেহ কথা বলিলে নিজে কথা না বলিয়া ইশারায় তাহাকে নীরব করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি খুৎবার সময় অপরকে বলে 'চুপ কর' অথবা 'খুৎবা শ্রবণ কর' সে বেহুদা কথা বলিল এবং যে ব্যক্তি এই সময় বেহুদা কথা বলে সে জুম'আর সওয়াব পাইবে না।" ইহা হইতে দূরে থাকার কারণে খুৎবা শুনিতে না পাইলে চুপ থাকা কর্তব্য। যে স্থানে লোকে কথাবার্তা বলে তথায় বসিবে না। খুৎবার সময় তাহিয়াতুল মসজিদ নামায ব্যতীত অন্য নামায পড়িবে না। (হানাফী মতে এই সময় কোন নফল-সুন্নত নামায জায়েয নহে)। (৯) জুম'আর নামায শেষ করিয়া আলহামদুলিল্লাহ্, কুলহুওয়াল্লাহ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস ও এই চারিখানা সূরা সাতবার করিয়া পড়িবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, জুম্'আর নামাযের পর এই সূরাসমূহ পাঠ করিলে পরবর্তী জুম্'আ পর্যন্ত শয়তান হইতে নিরাপদে থাকা যায়। তৎপর এই দু'আ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِىُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হে অভাবহীন, হে প্রশংসিত, হে সৃজনকারী, হে পুনর্জীবন প্রদানকারী, হে করুণাময়, হে বন্ধু, তোমার হালাল বস্তু দ্বারা তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তোমা ছাড়া অপর সমস্ত কিছু হইতে আমাকে অভাবশূন্য কর। বুযর্গগণ বলেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ সর্বদা পড়িবে সে কল্পনাতীত স্থান হইতে স্বীয় জীবিকা পাইতে থাকিবে এবং কখনও পরমুখাপেক্ষী হইবে না।

তৎপর ছয় রাকআত সুন্নত নামায পড়িবে, কারণ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই পরিমাণ নামায পড়িতেন। (১০) আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করিবে। মাগরিব পর্যন্ত থাকিতে পারিলে অতি উত্তম। আলিমগণ বলেন, ইহাতে এক হজ্জ এক উমরার সওয়াব পাওয়া যায়। একান্তই যদি মস্‌জিদে অবস্থান করা না যায় এবং গৃহে চলিয়া যাইতে হয় তবুও আল্লাহ্‌র যিকির হইতে মুহূর্তকালও গাফিল থাকিবে না। তাহা হইলে জুম'আর দিনে যে একটি অতি মুবারক মুহূর্ত আছে উদাসীনভাবে তাহা নষ্ট হইবে না এবং ইহার ফযীলত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে না।

জুম'আর দিনের কার্য ঃ জুম্‌আর দিনে সাতটি নেক কাজে তৎপর থাকা উচিত। (১) প্রত্যূষে যে স্থানে ইলমে দীনের চর্চা হয় এমন মজলিসে যোগদান করিবে। বাজে গল্পের বৈঠক হইতে দূরে থাকিবে। এমন বুযর্গের মজলিসে হাযির হইবে যাঁহার উপদেশ শ্রবণে ও কার্যাবলী দর্শনে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং পরকালের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। যাহার উক্তিতে এইরূপ প্রভাব নাই তাহার মজলিসকে ইলমে দীনের মজলিস বলা যায় না। যাহার উক্তিতে উক্তরূপ প্রভাব আছে এমন ব্যক্তির মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকআত নফল নামায অপেক্ষা উত্তম বলিয়া হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। (২) জুম'আ দিনে একটি অতি মুবারক মুহূর্ত আছে। হাদীছ শরীফে আছে, সেই মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নিকট যাহা চাওয়া হয় তাহাই কবূল হয়। এই শুভ মুহূর্ত নির্ধারণে মতভেদ আছে। কোন কোন আলিমের মতে তাহা সূর্যোদয়ের সময় অথবা দ্বিপ্রহরের ঠিক পর মুহূর্তে বা সূর্যাস্তের সময়। কেহ কেহ বলেন, সেই মুবারক মুহূর্তটি জুম'আর আযানের সময়, ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে যাওয়ার কালে, জুম'আর নামাযে দাঁড়াইবার সময় অথবা আসরের নামাযের সময় হইয়া থাকে। মোটকথা, সেই মুবারক মুহূর্তের নির্দিষ্ট সময় কেহই অবগত নহে। শবে কদরের ন্যায় ইহা গুপ্ত। অতএব সেই শুভ মুহূর্তের অনুসন্ধানে সমস্ত দিন আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত থাকা উচিত। (৩) প্রচুর পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। কারণ, রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে আশিবার আমার উপর দরূদ পড়িবে তাহার আশি বৎসরের (সগীরা) গুনাহ্ মাফ হইবে।" সাহাবাগণ আরয করিলেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার উপর কি প্রকারে দরূদ শরীফ পড়িব?" তিনি বলিলেন—"তোমরা বল ঃ"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَّلِحَقِّهٖ

اَدَاءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاَجْزِهٖ عَنَّا مَاهُوَ اَهْلُهٗ وَ اَجْزِهٖ اَفْضَلَ مَاجَزَيْتَ نَبِيًّنَا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর এমন রহমত নাযিল কর যাহাতে তোমার সন্তুষ্টি রহিয়াছে এবং যাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের হক আদায় হয়। আর তাঁহাকে শাফাআতের ক্ষমতা, মাহাত্ম্য এবং মাকামে মাহ্মুদ দান কর যাহা তুমি তাঁহাকে প্রদানের ওয়াদা করিয়াছ। আর যে পুরস্কারের তিনি উপযুক্ত আমাদের পক্ষ হইতে তুমি তাঁহাকে উহা দান কর। আর তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এমন উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদান কর যাহা তুমি কোন পূর্ববর্তী নবীকে দান করিয়াছ। আর তাঁহার নবী ও পুণ্যবান ভ্রাতৃবৃন্দের উপর রহমত নাযিল কর, হে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" কথিত আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সাতবার দরূদ শরীফ পড়িবে সে অবশ্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শাফাআত লাভ করিবে। এই দরূদ পড়িলেও চলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল কর।" (৪) জুম'আর দিনে অধিক পরিমাণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিবে এবং সূরা কাহাফ পড়িবে। হাদীস শরীফে এই সূরার অনেক ফযীলত বর্ণিত আছে। পূর্বকালের আবেদগণ জুম'আর দিনে সূরায় ইখলাস, দরূদ শরীফ, ইস্তেগফার ও নিম্নলিখিত দু'আ হাজার হাজার বার পড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

অর্থাৎ "আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য আর কেহই নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।" (১) শুক্রবারে নফল নামায অধিক পরিমাণে পড়িবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে পৌঁছামাত্রই এই নিয়মে চারি রাকআত নফল নামায পড়ে যে, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা ও পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করে, সে ব্যক্তি বেহেশতে নিজের স্থান না দেখিয়া অথবা অপর কাহারও নিকট হইতে এই সুসংবাদ শ্রবণ না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিবে না। জুম'আর দিন চারি রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব এবং এই নামাযে 'আন্আম', 'কাহাফ', 'তা-হা' ও 'ইয়াসীন', এই চারি সূরা পড়িবে। এই সূরাগুলি পড়িতে না পারিলে 'লুকমান', 'সিজদা', 'দুখান' ও 'মুলক' এই চারি সূরা পড়িবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জুম'আর দিন সর্বদা 'সালাতুত

তাসবীহ' পড়িতেন। এই নামায সর্বজনবিদিত। অতি উত্তম নিয়ম এই যে, জুম'আর দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নফল নামায পড়িবে, জুম'আর নামাযের পর আসরের নামায পর্যন্ত ইলমে-দীন চর্চার মজলিসে উপস্থিত থাকিবে এবং তৎপর মাগরিবের নামায পর্যন্ত তসবীহ্ ও ইস্তেগফার পড়িতে থাকিবে। (৬) জুম'আর দিন কিছু না কিছু অবশ্যই খয়রাত করিবে; কিছু না থাকিলে এক টুকরা রুটি হইলেও দান করিবে। কারণ, জুম'আর দিনে দানের ফযীলত অনেক বেশি। খুৎবার সময় কোন ভিক্ষুক কিছু চাহিলে তাহাকে ধমক দেওয়া উচিত। এই সময় কিছু দান করা মাকরূহ্। (৭) সপ্তাহের মধ্যে জুম'আর দিনকে পরকালের কাজের জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিবে; বাকি ছয় দিন দুনিয়ার কাজ করিবে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتُ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "অনন্তর যখন নামায শেষ হইবে তখন ধরাপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্র রহমত অন্বেষণ কর।" হযরত আনাস (রা) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়, এবং সাংসারিক কাজকর্ম এই আয়াতের মর্ম নহে; বরং ইল্ম অনুসন্ধান, প্রিয়জনের সাক্ষাত, পীড়িত ব্যক্তির দর্শন, জানাযার সহিত কবরস্থানে গমন এবং এবম্বিধ অন্যান্য কাজ এই আয়াতের মর্ম।

নামাযের নিয়তের মর্ম ও ওয়াসওয়াসা বিদূরণ ঃ নামাযের অতি প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলি উপরে বর্ণিত হইল। অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ আলিমের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নামাযের সমস্ত মাসআলা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। অপর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, নামাযের নিয়তে অধিকাংশ সময় ওয়াসওয়াসা বা বাজে চিন্তা আসিয়া পড়ে। তিন কারণে এইরূপ ওয়াসওয়াসা হইয়া থাকে। (১) মানসিক অসুস্থতা, (২) চিত্তচাঞ্চল্য, (৩) শরীয়তের বিধান এবং নিয়তের মর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা অর্থাৎ যে সংকল্প মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ পালনে প্রবৃত্ত করে তাহাকেই যে নিয়ত বলে, এই তাৎপর্য না জানা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন আলিমের আগমন সংবাদ কেহ তোমাকে প্রদানপূর্বক তাঁহার সম্মানার্থে যদি দাঁড়াইতে বলে তবে এই কথা শোনামাত্র তাঁহার ইল্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোমার অন্তরে এক প্রকার ইচ্ছার সঞ্চার হইবে। সেই ইচ্ছাই তোমাকে দণ্ডায়মান করাইয়া দেয়। এই ইচ্ছাকেই নিয়ত বলে। মনে মনে বা মুখের কোন উক্তি ব্যতীতই নিয়ত তোমার অন্তরে থাকে। তুমি মনে মনে বা মুখের নিয়ত নহে; ইহা ইন্দ্রিয়ের কার্য। যে ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে প্রেরণা দান করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করে তাহাকেই নিয়ত বলে। নিয়তের বিধান জানিয়া লওয়া আবশ্যক। তুমি যে নামায পড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ তাহা জোহর কি আসরের নামায মনে মনে স্থির করিয়া "আল্লাহু আকবর' বলিয়া তাহরিমা বাঁধিলেই হইল। মন অন্যমনস্ক থাকিলে ওয়াক্তের নাম স্মরণ করিয়া লইবে। ইহা

ধারণা করিও না যে, যে নামায পড়িতেছ তাহা ফরয, কি ওয়াজিব; জোহর কি আসরের; এই সকল বিষয় এক সঙ্গে বিস্তৃতভাবে মনে জমাইয়া লইতে হইবে; বরং তন্মধ্যে যখন যেটি মনে আসে ক্রমান্বয়ে উহা মনে জমাইয়া লইলেই নিয়তের জন্য যথেষ্ট। কারণ কেহ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "জোহরের নামায পড়িয়াছ কি?" উত্তরে তুমি বলিবে 'হ্যাঁ'। 'হ্যাঁ' বলিবার সময় তোমার হৃদয়ে এই সমস্তের মোটামুটি অর্থ উদয় হয় বটে; কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ হৃদয়ে উদিত হয় না। এইরূপ তোমার নামাযের ওয়াক্তের নাম স্মরণ করা উক্ত লোকটির জিজ্ঞাসাতুল্য এবং তাকবীরে তাহ্‌রীমা বাঁধিতে যাইয়া 'আল্লাহু আকবর' বলা তোমার 'হ্যাঁ' বলা সদৃশ। ইহার অতিরিক্ত করিতে চাহিলে মন অস্থির হইয়া পড়িবে এবং নামাযও ঠিক হইবে না। নামাযে সহজ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিতরূপে নিয়ত করিতে পারিলে তৎপর যে-অবস্থাই হউক, জানিতে হইবে যে, নামায জায়েয হইয়াছে। কারণ, নামাযের নিয়তও অন্যান্য কার্যের নিয়তের ন্যায়। এই জন্যই রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সময়ে কাহারও নিয়তে ওয়াসওয়াসা হইত না। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, ইহা সহজ এবং যে-ব্যক্তি ইহাকে সহজ বলিয়া মনে করে না সে নির্বোধ।

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাত

যাকাত ইসলামের ভিত্তিসমূহের অন্যতম। কারণ, রসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ,' (২) নামায, (৩) যাকাত, (৪) রোযা ও (৫) হজ্জ।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য নিজেদের অধিকারে রাখিয়া উহার যাকাত না দেয়, পরলোকে এই স্বর্ণ-রৌপ্য পোড়াইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বক্ষস্থলে এমন দাগ দেওয়া হইবে যে, তাহা বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। আর যে-ব্যক্তি পশু আপন অধিকারে রাখিয়া যাকাত না দেয় পরকালে এই পশুগুলিকে তাহার উপর শাস্তি প্রদানে নিযুক্ত করা হইবে; পশুগুলি তাহাকে ঢুঁ মারিতে ও পদদলিত করিতে থাকিবে। অগ্র-পশ্চাতের সকল পশু যখন তাহাকে একবার করিয়া এইরূপ শাস্তি দিয়া শেষ করিবে তখন প্রথম হইতে আবার ইহারা আসিয়া তাহাকে পূর্ববৎ পর্যায়ক্রমে শাস্তি দিতে থাকিবে। কিয়ামত দিবসে সকলের হিসাব-নিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পশুগুলি তাহাকে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া শাস্তি প্রদান করিতে থাকিবে। এই হাদীসখানা সহীহ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ধনীদের প্রতি যাকাতের নিয়মাবলী শিক্ষা করা ফরয।

যাকাতের শ্রেণী-বিভাগ ও শর্ত ঃ ছয় প্রকার ধনের উপর যাকাত ফরয। (১) গৃহপালিত পশুর যাকাত। ইহার মধ্যে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত দিতে হয়। অন্যান্য গৃহপালিত পশু যেমন, অশ্ব, গর্দভ ইত্যাদির যাকাত দিতে হয় না। চারিটি শর্ত পূর্ণ হইলে গৃহপালিত পশুর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়। যথা—(ক) গৃহপালিত না হইয়া চারণভূমিতে প্রতিপালিত হওয়া যেন প্রতিপালন খরচ অধিক না হয়। সারা বৎসর পশুগুলিকে গৃহে প্রতিপালন করিলে যদি যাকাত পরিমাণ খরচ হয় তবে যাকাতের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। (খ) পূর্ণ এক বৎসর অধিকারে থাকা। কারণ, বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অধিকারচ্যুত হইলে যাকাত লাগে না। কিন্তু বৎসরের শেষাংশেও কোন পশুর বাচ্চা হইলে ইহাও হিসাবে ধরিয়া যাকাত দিতে হইবে। (গ) ধনী বলিয়া গণ্য হওয়া এবং ধনের উপর অবাধ ক্ষমতা থাকা। মাল কমিয়া গেলে বা কোন অত্যাচারী ব্যক্তি ছিনাইয়া লইয়া গেলে যাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু হারানো পশু প্রভৃতি মাল পুনরায় লাভসহ পাওয়া গেলে অতীতকালের জন্যও যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। কাহারও যে পরিমাণ মাল অধিকারে আছে সেই পরিমাণ ঋণ

থাকিলে তাহার উপর যাকাত ওয়াযিব নহে। (ঘ) যে পরিমাণ মাল থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয় তাহা পূর্ণ থাকা। প্রত্যেক প্রকারের মালই নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক; তদপেক্ষা কম হইলে যাকাত ওয়াযিব হয় না।

(১) গৃহপালিত পশুর যাকাতের হিসাব ঃ শ্রেণীভেদে গৃহপালিত পশু নিম্নলিখিত পরিমাণে অধিকারে থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয়।

উটের যাকাত ঃ পাঁচটির কম হইলে উটের যাকাত ফরয হয় না। পাঁচটি উট থাকিলে একটি ছাগী, দশটি থাকিলে দুইটি ছাগী, পনরটি থাকিলে তিনটি ছাগী, বিশটি থাকিলে চারিটি ছাগী যাকাত দেওয়া ফরয। এই ছাগী পূর্ণ এক বৎসরের এবং ছাগ হইলে পূর্ণ দুই বৎসরের হইতে হইবে। বয়স ইহার কম হইলে চলিবে না। পঁচিশটি উট থাকিলে উহার যাকাত পূর্ণ এক বৎসরের একটি উটনী দেওয়া ফরয। উটনীর পরিবর্তে পূর্ণ দুই বৎসরের একটি উট দিলে চলিবে। উটের সংখ্যা ছয়ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত এই হিসাবে যাকাত দিতে হইবে; ছয়ত্রিশটি উট হইলে উহার যাকাত-স্বরূপ পূর্ণ দুই বৎসরের একটি উটনী দেওয়া ওয়াজিব। ছয়চল্লিশটি উটের জন্য তিন বৎসরের একটি উটনী, একষট্টিটি উট হইলে চারি বৎসরের একটি উটনী, ছিয়াত্তরটি উটের জন্য দুই বৎসরের দুইটি উটনী, একান্নব্বইটি উটের জন্য তিন বৎসরের দুইটি উটনী এবং একশত একুশটির জন্য দুই বৎসরের তিনটি উটনী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। তৎপর প্রতি চল্লিশটি উটের জন্য দুই বৎসরের এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য তিন বৎসরের একটি করিয়া উটনী যাকাত দিতে হইবে।

গরুর যাকাত ঃ গাভী হউক কি বলদ হউক, সংখ্যায় ত্রিশটি পূর্ণ না হইলে যাকাত ওয়াযিব হয় না। ত্রিশটি পূর্ণ হইলে এক বৎসরের একটি বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটির জন্য দুই বৎসরের একটি বাছুর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। ষাটটি পূর্ণ হইলে এক বৎসরের দুইটি বাছুর দিতে হইবে। মোটকথা, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি এক বৎসরের এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে পূর্ণ দুই বৎসরের একটি বাছুর যাকাত দিতে হইবে।

ছাগলের যাকাত ঃ সংখ্যায় চল্লিশটি, পূর্ণ না হইলে ছাগলের যাকাত ওয়াযিব নহে। চল্লিশটি পূর্ণ হইলে একটি, একশত একুশটি হইলে দুইটি দুইশত একটি হইলে তিনটি এবং চারশত হইলে চারিটি ছাগল যাকাত দিতে হইবে। এই হিসাবে প্রতি একশতের জন্য একটি দিতে হইবে। ছাগী এক বৎসরের কম এবং ছাগল দুই বৎসরের কম হইলে চলিবে না। দুই ব্যক্তি নিজেদের ছাগল পরস্পর মিশাইয়া রাখিলে এবং তাহাদের কেহই কাফির বা ক্রয়-মূল্য প্রদানে মুক্তিদানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস না হইলে উভয়ের মাল এক বলিয়া গণ্য হইবে। উভয়ের ছাগল একত্রে চল্লিশের অধিক

না হইলে উভয়ের উপর অর্ধেক অর্ধেক ছাগী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। উভয়ের ছাগল মিলিয়া একত্রে একশত বিশটি হইলে দুইজনে মিলিয়া একটি ছাগী যাকাত দিলেও চলিবে।

(২) শস্যের যাকাত ঃ কাহারও অধিকারে গম, যব, খুরমা, মোনাক্কা বা এমন কোন খাদ্যশস্য যদ্দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে, যেমন মুগ, ছোলা, চাউল, প্রভৃতি থাকিলে উক্ত শস্যের এক-দশমাংশ যাকাত দেওয়া ওয়াযিব। খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যেমন, তুলা, সূতা ইত্যাদি এবং ফল-ফলাদির যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নহে।

গম এবং যব থাকিলেও এক-দশমাংশ দেওয়া ওয়াজিব নহে। কারণ যাকাত ওয়াযিব হওয়ার জন্য একজাতীয় বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে অধিকারে থাকা আবশ্যক। নদী-নালা, খাল ও প্রণালী হইতে পানি সিঞ্চন করত শস্য উৎপাদন করিলে যাকাত দিতে হয় না। শস্যের যাকাতে তাজা আঙ্গুর ও খুরমা দেওয়া উচিত নহে; বরং মোনাক্কা (শুষ্ক আঙ্গুর) ও শুষ্ক খোরমা দেওয়া উচিত। কিন্তু যে আঙ্গুর শুষ্ক হইয়া মোনাক্কা হয় না তদ্দ্বারাও যাকাত দেওয়া যাইতে পারে। বৃক্ষে আঙ্গুরে রং ধরিলে এবং যব ও গমের গোটা শক্ত হইয়া উঠিলে যাকাতের আনুমানিক হিসাব না করিয়া উহা হইতে কিছু খরচ করিবে না। আনুমানিক হিসাব করিয়া লইলে উহা হইতে খরচ করা জায়েয আছে।

(৩) স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত ঃ রৌপ্য দুইশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা পূর্ণ এক বৎসর অধিকারে থাকিলে তন্মধ্য হইতে বৎসর শেষে পাঁচ দিরহাম যাকাত দেওয়া ওয়াজিব এবং খাঁটি স্বর্ণ বিশ দিনার। (৭॥ তোলা) এক বৎসর অধিকারে থাকিলে ইহা হইতে অর্ধ দিনার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। স্বর্ণ-রৌপ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। স্বর্ণ-রৌপ্য যত অধিক হউক না কেন, এই হিসাবে যাকাত দিতে হইবে। স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত তৈজষপত্র, স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত ঘোড়ার সাজ ও তরবারি ইত্যাদি এবং স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত যে সকল বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ উহা থাকিলে এই সমস্তের যাকাত দিতে হইবে। কিন্তু যে সকল অলংকার স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার জায়েয উহার যাকাত দিতে হইবে না। (হানাফী মতে অলংকারের যাকাত দিতে হইবে)। যে স্বর্ণ-রৌপ্য অপরের নিকট গচ্ছিত আছে এবং চাওয়ামাত্র পাওয়া যাইতে পারে উহারও যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

(৪) পণ্য-দ্রব্যের যাকাত ঃ অন্ততঃপক্ষে বিশ দিনার মূল্যের কোন এক প্রকার পণ্যদ্রব্য খরিদ করত বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখিলে খরিদের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইলে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। এক বৎসরে যে লাভ হয় তাহাও হিসাবে ধরিয়া যাকাত দিতে হইবে। প্রতি বৎসরের শেষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিতে

হইবে। মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য-দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকিলে সেই মুদ্রা দ্বারাই যাকাত দিবে। মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করা না হইয়া থাকিলে দেশের প্রচলিত মুদ্রায় মূল্য নির্ণয় করত তদনুসারে যাকাত দিবে। এক ব্যক্তি হস্তস্থিত সামান্য ধনের বিনিময়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কিছু মাল খরিদ করিল। কেবল ব্যবসায়ের নিয়ত ছিল বলিয়াই সেই সময় হইতেই ইহার যাকাত ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু উহা নগদ ও যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী হইলে মালিক হওয়ার সময় হইতেই যাকাতের হিসাব ধরিতে হইবে। আর প্রথম খরিদের সময় যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য থাকে এবং এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সেই উদ্দেশ্য লোপ পায় তবে যাকাত লাগিবে না।

(৫) **ফিতরা ঃ** ইহাও একরকম যাকাত। রমযানের ঈদের রাত্রে যে মুসলমান এই পরিমাণ খাদ্যশস্যের অধিকারী থাকে যাহাতে ঈদের দিনের আহারাদি স্বাচ্ছন্দ্যে চলিয়া কিছু উদ্বৃত্তও থাকে এবং ইহা ছাড়া গৃহে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রও বাহির হইতে পারে, তবে এমন ব্যক্তির উপর খাদ্যশস্য হইতে এক সা' (صاع) পরিমিত শস্য ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব। (এক সা' আশি তোলা সেরের তিন সের আট ছটাক চারি তোলা হয়।) যে ব্যক্তি গম আহার করে, যব দ্বারা ফিতরা দেওয়া তাহার উচিত নহে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি যব আহার করে তাহার গম দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শস্য আহার করিলে উহার মধ্যে যাহা উত্তম তদ্দ্বারা ফিতরা দিতে হইবে। গমের পরিবর্তে আটা ইত্যাদি দেওয়া উচিত নহে। ইহা হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-র মত। এক পরিবারভুক্ত যত লোকের ভরণ-পোষণ গৃহস্বামীর উপর তত লোকের ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব ; যেমন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, দাস-দাসী। দাস বা দাসীর উপর দুই ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে তাহার ফিত্‌রা দেওয়া উভয়ের উপর ওয়াজিব। কাফির দাস-দাসীর ফিত্‌রা দেওয়া ওয়াজিব নহে। নিজের ফিত্‌রা নিজের দেওয়া স্ত্রীর জন্য দুরস্ত আছে। আবার স্বামী স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে তাহার ফিতরা দিলেও দুরস্ত হইবে।

যাকাত সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি উপরে বর্ণিত হইল। ইহার অতিরিক্ত জানিবার প্রয়োজন হইলে অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট জানিয়া লইবে। যাকাত দিবার নিয়ম ঃ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাকাত দিতে হয়। (১) যাকাত দিবার সময় নিয়ত করিতে হইবে, "আমি ফরয যাকাত দিতেছি।" অথবা যাকাত প্রদানের জন্য কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলে নিযুক্ত করিবার সময় এইরূপ নিয়ত করিবে, "ফরয যাকাত বণ্টনের জন্য আমি প্রনিধি নিযুক্ত করিতেছি।" অথবা প্রতিনিধিকে বলিয়া দিতে হইবে, "যাকাত দিবার সময় নিয়ত করিবে যে, তুমি আমার

পক্ষ হইতে ফরয যাকাত প্রদান করিতেছ।" (২) বৎসর পূর্ণ হইলে শীঘ্র যাকাত দেওয়ার চেষ্টাই রবে। বিনা কারণে বিলম্ব করা উচিত নহে। ঈদের দিনের মধ্যে ফিতরা দিয়া দিবে। রমযান শরীফের মধ্যে ফিতরা দেওয়া দুরস্ত আছে ; কিন্তু রমযানের পূর্বে দেওয়া দুরস্ত নহে। মালের যাকাত বৎসরের প্রথম হইতে দিলেও চলে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে যাকাত দেওয়া হইয়াছে সে বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মরিয়া গেলে অথবা ধনবান বা কাফির হইয়া গেলে প্রদত্ত যাকাত আবার দিতে হইবে। (৩) যে বস্তুর যাকাত সেই বস্তু দ্বারাই যাকাত দিতে হইবে। রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং যবের পরিবর্তে গম অথবা যাকাতের মূল্যের পরিমাণ অন্য কোন বস্তু প্রদান করা হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-র মতে সঙ্গত নহে। (৪) ধন যে স্থানে থাকে সে স্থানেই যাকাত দিবে। কারণ, সে স্থনে গরীব-মিসকিনগণ যাকাতের আশায় থাকে। অন্য কোন স্থানে বণ্টনের জন্য পাঠাইলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (৫) যে পরিমাণ যাকাতই হউক না কেন. আট দল লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত এবং কোন দলেই তিনজনের কম হইবে না এবং সর্বমোট চব্বিশজন হইবে। যাকাতের এক দিরহাম হইলেও হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-র মতে চব্বিশ ব্যক্তিকে দিতে হইবে। ইহার আট ভাগ করত প্রত্যেক ভাগ তিনজকে অথবা বণ্টনকারী ইচ্ছানুযায়ী তিনের অধিক সংখ্যক লোককে দিয়া দিবে। যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রাপ্ত অংশ পরস্পর সমান না হইলেও চলিবে। যে আট দলের মধ্যে যাকাত বণ্টন করিতে হইবে তাহারা হইল-(১) ধর্ম-যোদ্ধা, (২) মুআল্লাফায়ে কুলূব অর্থাৎ সম্মানী নওমুস্লিম। (৩) যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত তহশীলদার, (৪) ফকির, (৫) মিসকিন, (৬) ক্রয়-মূল্য প্রদানে মুক্তি দানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস। (৭) মুসাফির ও (৮) ঋণী ব্যক্তি। প্রথম তিন শ্রেণীর লোক আজকাল পাওয়া দুষ্কর। অবশিষ্ট পাঁচ শ্রেণীর লোক পাওয়া যাইবে। পনের জনের কম লোকের মধ্যে যাকাত দেওয়া কাহারও উচিত নহে। শাফেঈ মযহাবে এইরূপ নির্দেশ আছে। উল্লিখিত সংখ্যক ও শ্রেণীর লোককে যাকাত দেওয়া এবং যে বস্তুর যাকাত সে বস্তু দ্বারাই যাকাত প্রদান করা ও উহার বিনিময়ে অন্য বস্তু না দেওয়ার যে আদেশ শাফেঈ মযহাবে রহিয়াছে তাহা পালন করা বড় কঠিন। এইজন্যই শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশ লোক যাকাত– প্রদান ব্যাপারে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র অনুসরণ করিয়া থাকে। আমরা আশা করি, এইজন্যই তাহাদিগকে ধরপাকড় করা হইবে না।

যাকাত গ্রহণযোগ্য আট প্রকার লোকের পরিচয় ঃ (১) ফকির যাহার কিছুই নাই এবং উপার্জনেও অক্ষম, এমন ব্যক্তিকেই ফকির বলে। যাহার একদিনের খাদ্য ও সতর ঢাকিবার উপযোগী বস্ত্র আছে সে ফকির নহে। কিন্তু যাহার অর্ধদিনের আহার ও সম্পূর্ণ পোশাক আছে অর্থাৎ চাদর আছে পাগড়ী নাই অথবা পাগড়ী আছে চাদর নাই,

তবে এমন ব্যক্তি ফকির বলিয়া গণ্য হইবে। হাতিয়ার থাকিলে লোকে কাজকর্ম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে। হাতিয়ারের অভাবে কাজকর্ম করিতে অক্ষম ব্যক্তিকেও ফকির বলা যায়। অভাবগ্রস্ত ইল্‌মে দীন শিক্ষার্থী ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যদি ইল্‌মে দীন শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় তবে তাহাকেও ফকির শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। অল্পবয়স্ক শিশু ব্যতীত প্রকৃত ফকির খুব কম পাওয়া যায়। অতএব পোষ্য-বর্গবিশিষ্ট ফকির তালাশ করিয়া লইবে এবং শিশু-সন্তানদের জন্য এরূপ ফকিরকে তাহার অংশ দান করিবে। (২) মিসকিন। যাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যয় তাহার আয় অপেক্ষা অধিক, তাহার বাসগৃহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ থাকিলেও সে মিসকিন। এমন ব্যক্তির যদি এক বৎসরের জীবিকা না থাকে এবং তাহার নিজস্ব উপার্জনে এক বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলান না হয় তবে তাহাকে এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া জায়েয যাহাতে তাহার বৎসরের অবশিষ্টাংশের খবচ চলে। বিছানা, গৃহের তৈজষপত্র ও কিতাবাদি থাকিলেও তাহার এক বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলানের অভাব থাকিলে সে মিসকিন। কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত কোন জিনিস তাহার থাকিলে সে মিসকিন নহে। (৩) যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত তহশীলদার। তহশীলদারগণ ধনী লোকদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করত যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টনের উপায় করিয়া থাকে। তাহাদের বেতন আদায়কৃত যাকাতের মাল হইতে দেওয়া উচিত। (৪) মুআল্লাফায়ে কুলূব অর্থাৎ সম্মানী নওমুসলিম। এইরূপ লোকদিগকে ধন দান করিলে ধন লাভের আশায় অন্যান্য লোকও মুসলমান হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারে। (৫) ক্রয়-মূল্য প্রদানে মুক্তিদানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস। যে-সকল দাস-দাসী ক্রয় মূল্য দুই বা ততোধিক কিস্তিতে প্রদানের অঙ্গীকারে স্বীয় প্রভু হইতে মুক্তি লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করিতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে দরিদ্র হউক, কি ধনী হউক কোন সৎ উদ্দেশ্যে বা বিপদ মোচনের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে গিয়া ঋণের দায়ে পড়িয়া থাকিলে তাহা পরিশোধের জন্য সে যাকাতের মাল গ্রহণ করিতে পারে। (৭) ধর্মযোদ্ধা। যে ধর্মযোদ্ধার জীবিকা বাইতুল মাল হইতে নির্ধারিত নহে, সে ধনী হইলেও তাহার সফরের সামানের খরচ যাকাতের মাল হইতে দেওয়া উচিত। (৮) সফররত পাথেয়শূন্য মুসাফির বা বাড়ি হইতে বিদেশ যাওয়া কালে পথ-খরচের অভাব হইলে যাকাতের মাল হইতে তাহাকে পথ-খরচের পরিমাণ দেওয়া উচিত।

কোন ব্যক্তি নিজকে ফকির বা মিসকিন বলিয়া পরিচয় দিলে সে মিথ্যা বলিয়াছে বলিয়া যদি জানা না যায় তবে তাহার কথা বিশ্বাস করত তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। কোন ধর্মযোদ্ধা বা মুসাফির ধর্মযুদ্ধ বা সফরের উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহণ

করত যুদ্ধ বা বিদেশ-ভ্রমণে না গেলে তাহার নিকট হইতে যাকাতের মাল ফেরত লওয়া আবশ্যক। যাকাতের মাল গ্রহণযোগ্য অবশিষ্ট চারি প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য লোকের নিকট হইতে জানিয়া নিঃসন্দেহ হইলে পর তাহাদিগকে যাকাত দিবে।

যাকাতের তাৎপর্য ঃ নামাযের যেমন একটি বাহ্যরূপ এবং একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে যাহা নামাযের প্রাণ তদ্রূপ যাকাতেরও একটি বাহ্যরূপ এবং একটি গূঢ় তাৎপর্য বা প্রাণ আছে। যে ব্যক্তি যাকাতের গূঢ় তাৎপর্য বা প্রাণ আছে। যে ব্যক্তি যাকাতের গূঢ় তাৎপর্য অবগত নহে তাহার যাকাত প্রাণশূন্য দেহের ন্যায়। যাকাতের গূঢ় তাৎপর্য তিনটি।

প্রথম তাৎপর্য ঃ আল্লাহ্‌কে ভালবাসিবার নির্দেশ বান্দাকে দেওয়া হইয়াছে এবং এমন কোন মুসলমান নাই, যে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার দাবি করে না। এমনকি, আল্লাহ অপেক্ষা অপর কোন কিছুকেই অধিক ভাল না বাসার নির্দেশও মুসলমানকে দেওয়া হইয়াছে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَائُكُمْ وَاَبْنَائُكُمْ الاية ـ

অর্থাৎ "তোমাদের পূর্বপুরুষ, সন্তানগণ, ভ্রাতৃবর্গ, সহধর্মিণিগণ, আত্মীয়স্বজন উপার্জিত ধন, তৃপ্তিজনক বাণিজ্য ও আরামদায়ক গৃহ তোমাদের নিকট আল্লাহ্, রসূল ও জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলে আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষা কর। আল্লাহ্ অনাচারীকে ভালবাসেন না।" মোটকথা এমন কোন মুসলমান নাই, যে যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক ভালবাসার দাবি করে না এবং এই দাবিতে সকলেই নিজকে সত্য বলিয়া মনে করে। এমতাবস্থায় এই দাবির সত্যতার নিদর্শনও প্রমাণের আবশ্যক। তাহা হইলে কেহই ভিত্তিহীন দাবি করিয়া গর্বিত হইয়া পড়িবেন না। ধন মানুষের প্রিয় বস্তুর অন্যতম। তাই মানুষ ধন অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে অধিক ভালবাসে কিনা উহা যাচাই করিবার জ্য তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন, "যদি মোমরা আমাকে সর্বাাধিক ভালবাসিয়া থাক তবে তোমাদের প্রিয় বস্তু ধন আমার জন্য উৎসর্গ কর। আমার ভালবাসার ব্যাপারে তোমরা কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা এই উপসর্গ কার্য দ্বারাই বুঝিতে পারিবে।" যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা যাঁহারা আল্লাহ্‌কে অধিক ভালবাসেন তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী ঃ সিদ্দিকগণ ঃ তাঁহারা নিজেদের যথাসর্বস্ব আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, "দুইশত দিরহামের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রদান করা কৃপণের কাজ। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হইয়া যথাসর্বস্ব তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য।" যেমন হযরত আবূ বকর রাদিয়াআল্লাহু আনহু নিজের যথাসর্বস্ব

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সিদ্দিক! নিজের পরিবারবর্গ ও সন্তানাদির জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ?" হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, "একমাত্র আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি।' কেহ কেহ নিজের অর্ধেক মাল আল্লাহ্র রাস্তায় প্রদান করিয়াছেন, যেমন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করিলেন। হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ফারুক, সন্তানাদির জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ?" হযরত উমার (রা) নিবেদন করিলেন, "এখানে যে পরিমাণ আনিয়াছি সে পরিমাণ রাখিয়া আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) বলিলেন ঃ

بَيْنَكُمَا مَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا تَفَاوُتٌ -

অর্থাৎ "তোমাদের (মরতবার) পার্থক্য উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে।" **দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ** পুণ্যবানগণ। তাঁহারা সামর্থ্যের অভাবে নিজেদের যথাসর্বস্ব আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করিয়া দেন না বটে কিন্তু তৎসমুদয় ফকির-মিসকিনদের অভাব মোচন ও সৎকাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত রাখিয়া উহার প্রতীক্ষায় থাকেন। তাঁহারা দরিদ্রের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করেন এবং শুধু যাকাত দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না, যে সমস্ত অভাবগ্রস্ত লোক তাঁহাদের নিকট আসে তাহাদিগকে তাঁহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির ন্যায় মনে করেন এবং তদনুযায়ী সাহায্য করিয়া থাকেন। **তৃতীয় শ্রেণী ঃ** সাধারণ মুসলমান। তাহারা দুইশত দিরহামের মধ্যে পাঁচ দিরহামের অতিরিক্ত দানের ক্ষমতা রাখে না এবং কেবল ফরয যাকাত আদায় করাকেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু তাহারা যাকাত প্রদানে আল্লাহ্র আদেশ খুশি মনে অতি সত্ত্বর পালন করিয়া থাকে এবং যাকাত প্রদান করিয়া ফকির মিসকিনদের উপর ইহসান করা হইল বলিয়া বেড়ায় না। আল্লাহ্র-প্রেমিকদের মধ্যে তাহারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহে দুইশত দিরহামের অধিকারী হইয়া পাঁচ দিরহামও তাঁহার পথে দান করিতে অনিচ্ছুক, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভালবাসা হইতে একেবারে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি পাঁচ দিরহামের অধিক দিতে পারে না, আল্লাহ্র প্রতি তাহার ভালবাসা নিতান্ত দুর্বল। সে আল্লাহ্ প্রেমিকদের মধ্যে নিতান্ত কৃপণ ও নগণ্য।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ কৃপণতার মলিনতা হইতে অন্তর পাক করা। কারণ, কৃপণতা অন্তরের মলিনতাস্বরূপ। বাহ্য অপবিত্রতা দেহকে যেমন নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার উপযুক্ততা রাখে না তদ্রূপ কৃপণতারূপ অপবিত্রতাও অন্তরকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অযোগ্য করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্র পথে ধন ব্যয় না করিলে অন্তরকে কৃপণতারূপ অপবিত্রতা হইতে পাক করা যায় না। যাকাত অন্তরের এই অপবিত্রতা দূর করে। যাকাত এমন পানিস্বরূপ যদ্দ্বারা অপবিত্রতা ধৌত করা হয়। এই কারণেই যাকাত ও

সাদকার মাল রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার বংশধরগণের জন্য হারাম করা হইয়াছে যেন তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদা ঐ মালের অপবিত্রতা হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারে।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ সম্পদের কৃতজ্ঞতা। ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তির কারণ হইয়া থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ যেমন দেহরূপ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা তদ্রূপ যাকাত ধনরূপ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা। মানুষ নিজকে ধনৈশ্বর্যের প্রভাবে নিশ্চিন্ত অবস্থায় দেখিয়া যখন তৃপ্তিবোধ করে তখন তাহারই ন্যায় অপর মুসলমানকে অর্থাভাবে কষ্টে নিপতিত দেখিয়া মনে মনে তাহার বলা উচিত, 'এই ব্যক্তিও তো আমার ন্যায় আল্লাহ্র একজন বান্দা। আল্লাহ্ আমাকে তাহার মুখাপেক্ষী করেন নাই, বরং তাহাকে অভাবগ্রস্ত করিয়া আমার মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন, এই জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। অতএব এই অভাবগ্রস্তের প্রতি অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা আমার উচিত। আমাকে যে পরমুখাপেক্ষী করেন নাই ইহা আমার জন্য পরীক্ষাও হইতে পারে। বিচিত্র নহে যে, গরীব-দুঃখীদের প্রতি অনুগ্রহ ও সৌজন্য প্রদর্শনে ত্রুটি করিলে আল্লাহ্ আমার অবস্থা তাহাদের ন্যায় এবং তাহাদের অবস্থা আমার ন্যায় করিয়া দিবেন।"

যাকাত প্রদানের উল্লিখিত গুঢ় তাৎপর্য সকলেরই অবগত হওয়া আবশ্যক যাহাতে যাকাতরূপ ইবাদত প্রাণহীন দেহের মত হইয়া না পড়ে।

ঃযাকাতের নিয়মাবলী ঃ নিজের যাকাতরূপ ইবাদতকে প্রাণশূন্য না করিয়া সজীব পাইতে চাহিলে এবং ইহাতে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবার আশা করিলে সাতটি নিয়ম পালন করা প্রত্যেক যাকাত প্রদানকারীর কর্তব্য।

(১) যাকাত প্রদানে তাড়াতাড়ি করা। যাকাত ওয়াযিব হইবার পূর্বে সমস্ত বৎসরের মধ্যে কোন সময় আদায় করিয়া দিবে। ইহাতে তিনটি উপকারিতা আছে। (ক) ইবাদতের আনন্দের প্রভাব তাহার উপর প্রকাশ পাইবে। যাকাত ওয়াযিব হইবার পর আদায় করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, আদায় না করিলে আযাব হইবে, এই ভয়েই আদায় করা হইতেছে, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের কারণে আদায় করা হইতেছে না। যে ব্যক্তি ভয়ে কাজ করে, ভালবাসা ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করে না, সে বান্দা ভাল নহে। (খ) তাড়াতাড়ি যাকাত দান করিলে ফকির-মিসকিনদের মন সন্তুষ্ট হইবে। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহারা প্রফুল্লচিত্তে আন্তরিকতার সহিত দাতার জন্য দু'আ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের দু'আ দুর্ভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দাতাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। (গ) তাড়াতাড়ি যাকাত দিলে বিলম্বজনিত আপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, বিলম্বে অনেক আপদই ঘটিয়া থাকে। হয়ত এমন

কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে যাহাতে শুভ কাজ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। মানব-হৃদয়ে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মিলে ইহাকে আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করা উচিত। কারণ, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দৃষ্টি আছে বলিয়াই হৃদয়ে নেক কাজের আগ্রহ জন্মিয়াছে, পর মুহূর্তেই হয়ত শয়তানের প্রবঞ্চনারূপ আক্রমণে সে আগ্রহ বিনষ্ট হইতে পারে। বর্ণিত আছে যে, অবশ্যই মু'মিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র দুই অঙ্গুলির মধ্যে রহিয়াছে।

কাহিনী ঃ এক বুযুর্গ পায়খানায় বসিলেন, এমন সময় ফকিরকে একটি পিরহান দান করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজদেহে পরিহিত পিরহানটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার এক মুরীদকে ডাকিয়া পিরহানটি তাহার দিকে নিক্ষেপ করত বলিলেন, "ইহা অমুক গরীবকে দিয়া দাও।" নির্দেশ পালনের পর মুরীদ নিবেদন করিলেন–"হে মহাত্মন, পায়খানা হইতে বাহির হইয়াই তো পিরহানটি দিতে পারিতেন। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না কেন?" বুযুর্গ বলিলেন–"আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, হয়ত ততক্ষণে আমার মনে উদিত শুভ ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতে পারে এবং আমি নেক কাজটি হইতে বিরত থাকিতে পারি।"

(২) যাকাত একবারে দিতে হইলে মহররম মাসে দিবে। ইহা ফযীলতের মাস এবং বৎসরের আরম্ভ। অথবা রমযান মাসে দিবে। দানের সময় যত ফযীলতের হইবে দানের সওয়াবও তত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দাতা ছিলেন। তাঁহার সব কিছুই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করিয়া দিতেন। বিশেষত রমযান শরীফে তিনি নিজে কিছুই রাখিতেন না, যথাসর্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেন।

(৩) যাকাত গোপনে দিবে, প্রকাশ্যে দিবে না। তাহা হইলে রিয়া হইতে দূরে থাকিবে এবং ইখলাসের নিকটবর্তী হইবে। (একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাজ করাকে ইখলাস বলে।) হাদীস শরীফে আছে, "গোপন দান আল্লাহ্‌র ক্রোধকে প্রশমিত করে।" হাদীস শরীফে আরও উক্ত আছে, "কিয়ামত দিবস সাত প্রকার লোক আরশের ছায়াতলে থাকেবে তন্মধ্যে এই দুইটি উল্লেখযোগ্য– (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ্, (২) এমন দাতা যে দক্ষিণ হস্তে এরূপে দান করে যাহাতে বাম হস্ত জানিতে না পারে।" এখন ভাবিয়া দেখ গোপন দানের মরতবা কত অধিক ; গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারক বাদশাহের সমকক্ষ শ্রেণীতে স্থান পাইবে। হাদীস শরীফে আছে, "যে দান প্রকাশ্যে করা হইবে তাহা প্রকাশ্য আমলের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইবে এবং গোপনে প্রদত্ত দান গুপ্ত আমলের মধ্যে লিখিত হইবে। আর যে ব্যক্তি দান করিয়া বলে, "আমি দান করিলাম, তাহার দান প্রকাশ্য দান ও গুপ্ত উভয় তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে এবং রিয়ার তালিকায় লিপিবদ্ধ হইবে।" এইজন্যই

পূর্বকালের বুযর্গগণ গোপনে দান করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। কোন কোন বুযুর্গ অন্ধ ফকির অনুসন্ধান করত গোপনে তাহাকে দান করিতেন এবং মুখে কিছুই বলিতেন না যেন সে দাতাকে চিনিতে না পারে। কোন কোন বুযর্গ ফকিরদের চলার পথে তাহাদের অগোচরে কিছু অর্থ রাখিয়া দিতেন। আবার কেহ কেহ অন্যের মারফত ফকিরদিগকে দান করিতেন। কেহ কেহ আবার নিদ্রিত ফকিরের কাপড়ের কোণে চুপে চুপে এমনভাবে অর্থ বাঁধিয়া দিতেন যেন তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হয় ; ফকিরগণও যেন দাতাকে চিনিতে না পারে এইজন্যই তাঁহারা এরূপ করিতেন এবং অপর লোক হইতে দান গোপন রাখাকে তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেন। কারণ, প্রকাশ্যে দান করিলে হৃদয়ে রিয়া জন্মে। এইরূপ দানে কৃপণতা দূর হয় বটে, কিন্তু হৃদয়ে রিয়া প্রবল হইয়া উঠে। কৃপণতা, রিয়া ইত্যাদি কুস্বভাবসমূহ মানবাত্মা ধ্বংস করে। কৃপণতা বিচ্ছুতুল্য এবং রিয়া সর্প সদৃশ। সর্প বিচ্ছু অপেক্ষা প্রবল ও মারাত্মক। বিচ্ছুকে সর্পের আহারস্বরূপ প্রদান করিলে উহা খাইয়া সর্প অধিক বলবান হইয়া উঠিবে। ইহাতে একটি মারাত্মক শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অপর একটি অধিকতর মারাত্মক শত্রুর কবলে পতিত হইতে হইল। এই সকল দোষ হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করে তাহা মৃত্যুর পর সাপ-বিচ্ছুর দংশনজনিত ক্ষতের ন্যায় প্রকাশ পাইবে। এই বিষয় দর্শন পুস্তকে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশ্য দানে উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক।

(৪) যাহার রিয়ার আশঙ্কা মোটেই নাই এবং যে ব্যক্তি রিয়ার আপদ হইতে স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন এমন বুযুর্গ ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, প্রকাশ্যে দান করিলে অপর লোকের মনেও দানের স্পৃহা জাগিয়া উঠিবে এবং তাঁহার দেখাদেখি তাহারাও গরীব-দুঃখীদর অভাব মোচনে ব্রতী হইবে, তবে তাঁহার পক্ষে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। যাহাদের নিকট প্রশংসা ও তিরস্কার এবং নিন্দা ও সুখ্যাতি সমান, কেবল তাঁহারাই এই উন্নত শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবগত আছেন ইহাকেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন।

(৫) দান করত দান গ্রহণকারীর উপকার করা হইল বলিয়া আস্ফালন করিয়া এবং দানের কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া বেড়াইয়া দানের সওয়াব নষ্ট করিবে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

অর্থাৎ "দান গ্রহণকারীকে দানের খোঁটা দিয়া এবং কথায় কষ্ট প্রদান করিয়া তোমাদের দানসকল নষ্ট করিও না।" من واذى শব্দের অর্থ ফকিরগণকে দুঃখিত ও বিরক্ত করা। ইহা বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে ; যেমন, তাহাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার

করা, নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করা, কর্কশ কথা বলা, দরিদ্র বলিয়া ও কিছু চাহিতেছে জানিয়া তাহাদিগকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত মনে করা এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন করা। ধনীলোকদের এইরূপ আচরণ দুই প্রকার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে হইয়া থাকে-(ক) হাত হইতে ধন বাহির করা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, এইজন্যই সঙ্কীর্ণমনা হইয়া কর্কশ কথা বলিয়া থাকে। একগুণ দান করত সহস্রগুণ লাভ করে যাহার নিকট অপ্রীতিকর বাস্তবিকই সে মূর্খ ও নির্বোধ। কারণ সামান্য যাকাত প্রদান করিলে পরকালে বেহেশ্‌ত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হইবে এবং নিজকে দোযখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে-এই কথাগুলির প্রতি যাহাদের ঈমান আছে তাহাদের নিকট যাকাত দেওয়া অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে কেন? (খ) ধনীরা ধনের কারণে নিজদিগকে গরীব-দুঃখী অপেক্ষা মর্যাদাশীল মনে করে ; অথচ তাহারা জানে না যে, গরীবগণ ধনীদের অপেক্ষা কত অধিক মর্যাদাশীল এবং তাহারা কত উন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ্‌র নিকটও দারিদ্রতার মর্যাদা আছে, ঐশ্বর্যের কোন মর্যাদা নাই। গরীবগণ যে ধনীদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী দুনিয়াতে ইহার প্রমাণ ও নিদর্শন এই, আল্লাহ্ ধনীদিগকে প্রতিনিয়ত দুনিয়া ও ধনের চিন্তায় ব্যাপৃত রাখিয়াছেন এবং ধনের হিফাজতের দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তার ভার তাহাদের উপরই অর্পণ করিয়াছেন। অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার কোন কিছুই উপভোগ করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। অপরপক্ষে গরীবদিগকে তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করা ধনীদের উপর আল্লাহ্ ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ বাস্তব পক্ষে ধনীদিগকে দুনিয়াতে গরীবদের বেতনবিহীন খাদেমরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আবার পরলোকেও গরীবগণ ধনীদের পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং ধনীরা তৎপর পাঁচশত বৎসর অপেক্ষা করিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিবে।

(৬) দান করত দান-গ্রহণকারীর উপকার করিয়াছ বলিয়া মনে করিবে না। এইরূপ মনে করা অন্তরের একটি দোষ এবং মূর্খতার কারণেই লোকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। দান করিয়া যদি ধারণা কর, আমি গরীবের মঙ্গল সাধন করিয়াছি, আমার অধিকারের ধন তাহাকে দান করিলাম যেন সে আমার অধীনে থাকে, তবেই বুঝা যাইবে যে, তুমি তাহার উপকার করিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ। আর এইরূপ মনে করিলে বুঝা যায় যে, তুমি আশা করিতেছ, গরীবেরা আমার খেদমত অধিক করুক, সর্বদা আমার কাজের জন্য প্রস্তুত থাকুক, সর্বাগ্রে আমাকে সালাম করুক ; মোটকথা, আমাকে অধিক সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমার গৌরব বৃদ্ধি করুক। দান গ্রহণকারীর কোন প্রকার ত্রুটি হইলে দাতা পূর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তাহার এই উপকার করিলাম, তথাপি সে আমার অনুগত হইল না!

এইরূপ ধারণা করা নিতান্ত মূর্খতা। বাস্তবপক্ষে গরীবেরাই ধনীদের দান গ্রহণপূর্বক তাহাদিকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইয়া ও তাহাদের অন্তরকে কৃপণতার অপবিত্রতা হইতে পাক করিয়া তাহাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে এবং ধনীদের প্রতি তাহাদের ভালবাসার পরিচয় দিয়াছে। কোন বৈদ্য বিনা পারিশ্রমিকে সিঙ্গা লাগাইয়া কোন ধনী ব্যক্তির শরীর হইতে মারাত্মক দূষিত রক্ত যাহা তাহার প্রাণনাশের কারণ হইত তাহা বাহির করিয়া দিলে সে উপকার স্বীকার করত বৈদ্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকে। এইরূপ ধনীর অন্তরের কৃপণতা এবং তাহার নিকট রক্ষিত যাকাতের মালও তাহার ধ্বংসের ও অপবিত্রতার কারণ ছিল। গরীবেরা তাহার দান গ্রহণের কারণেই সে পবিত্রতাও লাভ করিল এবং ধ্বংসের হাত হইতেও রক্ষা পাইল। এইজন্য গরীবদের উপকার স্বীকার করত তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ধনীদের কর্তব্য। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দান প্রথমে আল্লাহ্র রহমতের হস্তে গমন করে। তৎপর গরীবদের হাতে আসে।" অতএব দান আল্লাহ্কে দেওয়া হয় এবং গরীব ব্যক্তি তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ ইহা গ্রহণ করে। এই কারণেও গরীবের প্রতি দাতার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ; দান গ্রহণকারীর উপকার করিয়াছে বলিয়া বেড়ান উচিত নহে।

যাকাতের উল্লিখিত তিনটি তাৎপর্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বুঝা যাইবে যে, দান করিয়া গরিবের উপকার করা হইল বলিয়া মনে করা এবং ইহা বলিয়া বেড়ান নিতান্ত মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে। পূর্বকারের বুযর্গগণ উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা দরিদ্রের সম্মুখে বিনয় ও নম্রতার সহিত দাঁড়াইতেন এবং দানের বস্তু তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেন। আর দানের বস্তু হাতে লইয়া গরীবদের সম্মুখে এইরূপে স্থাপন করিতেন যেন তাহারা উপর হইতে উহা তুলিয়া লইতে পারে এবং গরীবদের হাত তাঁহাদের হাতের নিজে না যায়। কারণ,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلٰى -

অর্থাৎ "উপরের হাত নিচের হাত হইতে উৎকৃষ্ট।" এমতাবস্থায় দান করিয়া বলিয়া বেড়ান এবং উপকার করা হইল বলিয়া প্রতিদান আশা করা কাহার পক্ষে শোভা পাইতে পারে?

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা এবং হযরতে উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আন্হা দরিদ্রকে কোন কিছু পাঠাইবার সময় যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন, "দরিদ্র ব্যক্তি যে দু'আ করিবে তাহা স্মরণ রাখিও। তাহা হইলে প্রতিদানে আমরাও তাহার জন্য দু'আ করিব যেন আমাদের দান প্রতিদানবিহীন ও খাঁটি থাকে।"

দান করিয়া গ্রহণকারী দু'আর প্রত্যাশা করাও তাঁহারা জায়েয মনে করিতেন না। কারণ, দাতা উপকার করিয়াছে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রহণকারী দু'আ করিয়া থাকে। অথচ দরিদ্রগণই ধনীদের দান গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপকার করে।

(৭) নিজের মাল হইতে খুব উৎকৃষ্ট ও হালাল বস্তু দরিদ্রদিগকে দান করিবে। যে মালের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাহা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করার যোগ্য নহে। কারণ, আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং পবিত্র বস্তুই তিনি কবূল করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِأٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -

অর্থাৎ, "এমন মন্দ বস্তু দান করিতে ইচ্ছা করিও না যাহার প্রতি চক্ষুমুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরাও ইহা গ্রহণ করিবে না।" (সূরা বাকারা, রুকূ ৩৭)। গৃহের নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র পথে দান করা ও উৎকৃষ্ট বস্তু তাঁহার বান্দার জন্য রাখিয়া দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইবে? নিকৃষ্ট বস্তু দান করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঘৃণার সহিত দান করা হইতেছে এবং সন্তুষ্টচিত্তে দান না করিলে ইহা কবূল না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দানের এক দিরহাম হাজার দিরহামের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। উহা এমন দিরহাম যাহা উৎকৃষ্ট এবং সন্তুষ্টচিত্তে দান করা হয়।

যাকাতের উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধানের নিয়ম ঃ যে কোন মুসলমান গরীবকে যাকাত দিলে ফরয আদায় হইয়া যাইবে বটে; কিন্তু পরকালের ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত গরীবের অনুসন্ধানে ত্রুটি করা উচিত নহে। উপযুক্ত পাত্রে যাকাত দিলে উহার সওয়াবও দ্বিগুণ পাওয়া যাইবে। অতএব, নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি গুণের মধ্যে অন্তত একটি গুণ যাহার মধ্যে আছে, এমন দরিদ্র অনুসন্ধান করিয়া যাকাত দেওয়া উচিত।

প্রথম গুণ ঃ পরহিযগারী ও আল্লাহ্-ভীরুতা। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ভীরু লোকদিগকে তোমাদের খাদ্য আহার করাও।" কারণ, এই শ্রেণীর লোক যাহা গ্রহণ করিবেন তাহা কেবল আল্লাহ্র বন্দেগীতে ব্যয় করিবেন এবং ইবাদতে সাহায্য করার জন্য দাতাও তাঁহাদের ইবাদতের সওয়াবে অংশী হইয়া থাকে। এক ধনী ব্যক্তি সর্বদা সূফিগণকে দান করিতেন এবং বলিতেন, "তাঁহারা

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুরই অভিলাষী নহেন। অভাব হইলে তাঁহাদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আমি এরূপ একটি হৃদয় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করাকে দুনিয়া অর্জনে অভিলাষী একশতজনকে উপকার করা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি।" এই ধনী ব্যক্তির অবস্থা লোকে হযরত জুনাইদ (র)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন, "এই ব্যক্তি বন্ধুগণের অন্তর্ভুক্ত।" এই ব্যক্তি প্রথমে খাদ্যশস্যের ব্যবসা করিতেন। দরিদ্র লোকেরা তাঁহার দোকান হইতে যাহা কিছু ক্রয় করিত তিনি তাহার মূল্য লইতেন না। এইজন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব হইয়া পড়েন। হযরত জুনাইদ (র) কিছু মূলধন দিয়া পুনরায় তাঁহাকে ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেন এবং বলেন-"তোমার মত লোকের ব্যবসায় কখনও ক্ষতি হইবে না।"

দ্বিতীয় গুণ ঃ ইল্মে দীন শিক্ষার্থী হওয়া। ইল্মে দীন শিক্ষার্থীকে দান করিলে তাহারা ইল্ম শিক্ষার সুযোগ পাইবে এবং দাতা ইল্ম শিক্ষার সওয়াবের অংশী হইবে।

তৃতীয় গুণ ঃ নিজের অভাব ও দরিদ্রতা গোপন রাখা এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলা। এই স্বভাবের লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ -

অর্থাৎ "কিছু চায় না বলিয়া মূর্খ লোক তাহাদিগকে ধনী বলিয়া মনে করে।" এই শ্রেণীর লোকে নিজেদের দারিদ্রতা আড়ম্বর ও মর্যাদার আবরণে ঢাকিয়া রাখেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া ভিক্ষাজীবী ফকিরদিগকে দান করা উচিত নহে।

চতুর্থ গুণ ঃ বহু পোষ্য থাকা ও রোগাক্রান্ত হওয়া। কারণ, যে দরিদ্রের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট যত অধিক তাহাকে সেই পরিমাণে শান্তি প্রদান করিলে সওয়াবও তত অধিক হইবে।

পঞ্চম গুণ ঃ আত্মীয়তা। দরিদ্র আত্মীয়স্বজনকে দান করিলে দানের সওয়াব তো হইবেই, তদুপরি আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াবও পাওয়া যাইবে। আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের কারণে যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মে তাহারাও আত্মীয়ের অন্তর্গত।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার গুণ যাহার মধ্যে যত অধিক পাওয়া যায় তিনিই দান গ্রহণের জন্য তত অধিক সৎপাত্র। এই প্রকার লোকদিগকে দান করিলে দাতার জন্য তাহাদের দু'আ বিপদাপদ হইতে দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ হইবে। দান করাতে হৃদয়ের কৃপণতা বিদূরিত এবং নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করা হইবেই, তদুপরি এই লাভও হইবে। সৈয়দ বংশের লোকদিগকে যাকাত দিবে না। কারণ, যাকাত ধনের ময়লা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরগণের মর্যাদাও এত উচ্চ যে, তাঁহারা যাকাত গ্রহণের উপযোগী নহে। কাফিরকেও যাকাত দিবে না। কারণ, তাহারা এত অপবিত্র যে, মুসলমানের ধনের ময়লা গ্রহণেও উপযুক্ত নহে।

যাকাত গ্রহণকারীর কর্তব্য ঃ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা যাকাত গ্রহণকারীর কর্তব্য।

(১) ভালরূপে বুঝিয়া লইবে যে, আল্লাহ্ তাহার কতক বান্দাকে দরিদ্র করিয়াছেন বলিয়াই অপর কতক বান্দাকে ধনবান করিয়াছেন এবং যাহাদের উপর তাহার দয়া অধিক তাহাদিগকেই তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদের ঝচ্ঞ্ঝাট হইতে রক্ষা করিয়াছেন; আর ধন অর্জনের দায়িত্ব ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণের কষ্ট ধনীদের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ধনীদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন, "আমার দরিদ্র প্রিয়পাত্রগণকে তাহাদের আবশ্যক অনুযায়ী দান কর যেন তাহারা দুনিয়ার চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত করিতে পারে এবং অভাবে পড়িয়া দরিদ্রদের মন যখন অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে তখন ধনীরা যেন তাহাদের অভাব মোচনের উপযোগী ধন তাহাদিকে দান করে।" তাহা হইলে দরিদ্রদের দু'আর বরকতে ধন-সম্পদ বিষয়ে ধনীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। সুতরাং কেবল নিজের অভাব দূর করত নিরুদ্বিগ্ন মনে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ করা দরিদ্রের কর্তব্য এবং তাহারা যেন সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকে। এই উদ্দেশ্যেই যে আল্লাহ্ ধনীদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক বিহীন খাদেমরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহাদের উচিত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। দুনিয়ার বাদশাহ্ যেমন তাঁহার ভৃত্যগণের মধ্যে যাহাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া তাহা হইতে বিশেষ খেদমত লাভের ইচ্ছা করেন তাহাকে জীবিকা অর্জনের জন্য বিদায় দেন না এবং বিশেষ খেদমতের অনুপযুক্ত কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে তাহার পারিশ্রমিকবিহীন মজুররূপে নিযুক্ত করেন ও তাহাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করত পার্শ্বচরের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন তদ্রূপ আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রিয়পাত্রদের খেদমতের জন্য তাঁহার অপর বান্দাগণকে নিযুক্ত রাখেন। দুনিয়ার বাদশাহ্ প্রজাবৃন্দ হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্রদের খেদমত লাভের আশা করে, কিন্তু আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির ইবাদত পাইবার আশা করেন। এইজন্য তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ "একমাত্র আমার ইবাদত করিবার জন্যই আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি।" অতএব দরিদ্রগণ যাহা গ্রহণ করিবে তাহা একমাত্র নিরুদ্বেগে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করিবে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দান গ্রহণকারী যদি অভাব মোচনপূর্বক নিশ্চিত মনে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ করে তবে গ্রহণকারী অপেক্ষা দাতার মর্যাদা অধিক নহে।

(২) আল্লাহ্র নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছ বলিয়া মনে করিবে এবং দাতাকে আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ বলিয়া জানিবে। কারণ, ধনী ব্যক্তি, অভাবগ্রস্তকে দান করে কিনা দেখিবার জন্য আল্লাহ্ তাহার উপর এক পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই পরিদর্শক হইল ঈমান। ঈমানের প্রেরণায়ই দাতা দান করিয়া থাকে। কেননা, তাহার পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য দানের উপরই নির্ভর করে। ঈমানরূপ পরিদর্শক তাহার সহিত নিযুক্ত না থাকিলে ধনী ব্যক্তি একটি শস্যকণাও দান করিত না। ধনীর সহিত যিনি এইরূপ পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন তিনি দরিদ্রের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। দাতার হস্ত দানের মাধ্যমমাত্র; উহার স্বাধীন ক্ষমতা নাই, বরং আল্লাহ্র ইঙ্গিতে ইহা পরিচালিত হয়। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দান গ্রহণকারীর কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে ঃ

فَاِنَّ مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ -

অর্থাৎ "অবশ্যই যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" মানুষের সকল কার্যের প্রকৃত কর্তা একমাত্র আল্লাহ্। তথাপি তিনি নিজ বান্দাগণের প্রশংসা করিয়া তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

অর্থাৎ "সে কত উত্তম বান্দা! সে নিশ্চয়ই তওবাকারী" তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তিনি সিদ্দীক নবী ছিলেন।" এই প্রকার আরও আয়াত কুরআন শরীফে আছে। এই সকল প্রশংসাবাদের কারণ এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে নেক কার্যের উপলক্ষ বানাইয়াছেন তাহাকে তিনি সম্মানিত করিয়াছেন; যেমন রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র যবানে বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ خَلَقْتُهٗ لِلْخَيْرِ وَيَسَّرْتُ الْخَيْرَ عَلٰى يَدَيْهِ -

অর্থাৎ "যাহাকে আমি নেক কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং যাহার হস্তদ্বয়কে নেক কার্যের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি, তাহার জন্য শুভ সংবাদ।" যাঁহাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহার মর্যাদা অবগত হইয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও উচিত। ইহাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ। দাতার জন্য দানগ্রহণকারীকে এইরূপ দু'আ করা উচিত ঃ

طَهَّرَ اللّٰهُ قَلْبَكَ فِى قُلُوْبِ الْاَبْرَارِ وَزَكّٰى عَمَلَكَ فِىْ عَمَلِ الْاَخْيَارِ وَصَلّٰى عَلٰى رُوْحِكَ فِىْ رُوْحِ الشُّهَدَاءِ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ আপনার অন্তর পবিত্র করত নেককারগণের অন্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত করুন, আপনার কার্যকে পবিত্র করত নেককার লোকদের কার্যাবলীর শ্রেণীভুক্ত করুন এবং আপনার আত্মার উপর রহমত বর্ষণ করত শহীদগণের আত্মার শ্রেণীভুক্ত করুন।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে, "কেহ তোমার উপকার করিলে উহার বিনিময়ে তুমিও তাহার উপকার কর। অক্ষম হইলে তাহার জন্য এই পরিমাণে দু'আ কর যাহাতে বুঝিতে পার যে, উহার প্রতিদান পূর্ণ হইয়াছে।" প্রচুর দান করিয়াও দাতা উহাকে নগণ্য ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবে। অপর পক্ষে দান গ্রহণকারী দানের বস্তু নিতান্ত অল্প হইলেও অল্প ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবে না এবং দানের ঘোষ গোপন রাখিবে। ইহাই তাহার পক্ষে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

(৩) হারাম মাল কখনও গ্রহণ করিবে না এবং অত্যাচারী ও সুদ-খোরের মালও লইবে না।

(৪) আবশ্যক পরিমাণ গ্রহণ করিবে। সফরের জন্য গ্রহণ করিলে পাথেয় ও ভাড়ার অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে না। ঋণ পরিশোধের জন্য লইলে ঋণের পরিমাণই লইবে। পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য দশটি মুদ্রা যথেষ্ট হইলে এগারটি লইবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুদ্রাটি লওয়া হারাম। গৃহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় থাকিলে যাকাতের মাল গ্রহণ করা উচিত নহে।

(৫) যাকাত দাতা আলিম না হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "আপনি যাহা দান করিতেছেন, মিসকিনের অংশ দান করিতেছেন, না ঋণগ্রস্তের অংশ?" দাতা যে শ্রেণীর অংশ দান করিতেছেন গ্রহণকারী সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে ; অন্যথায় নহে। দাতা সমস্ত যাকাতের আটভাগের একভাগ সম্পূর্ণই একজনকে দিলে তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে; কারণ, শাফেঈ মাযহাব মতে ইহা সঙ্গত নহে। (হানাফী মতে সমস্ত যাকাত একজনকেও দেওয়া যাইতে পারে)।

সদকা-খয়রাতের ফযীলত ঃ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—"একটি খুরমার অংশ হইলেও দান কর। কারণ, ইহা দরিদ্রকে জীবিত রাখে এবং পাপকে এমনভাবে বিনাশ করে যেমন পানি অগ্নি নির্বাপিত করে।" তিনি বলেন—"একটি খুরমার অর্ধাংশ দান করিয়া হইলেও দোযখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর। তাহাও অসাধ্য হইলে অন্তত মিষ্ট কথা বলিয়া বাঁচিবার চেষ্টা কর।" তিনি

বলেন–"যে মুসলমান নিজের হালাল মাল হইতে দান করে আল্লাহ্ তাহাকে স্বীয় করুণায় এমনিভাবে প্রতিপালন করেন যেমন তোমরা তোমাদের গৃহপালিত পশুকে প্রতিপালন করিয়া থাক, এমনকি তাহার কতিপয় খুরমা ওহুদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়।" তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন সকলের বিচার সমাপ্ত হইয়া শেষ আদেশ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দাতা নিজ নিজ দানের ছায়াতলে অবস্থান করিবে।" তিনি বলেন–"দান অমঙ্গলের দ্বারসমূহের মধ্য হইতে সত্তরটি দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়।" লোকে নিবেদন করিল, "হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ দান সর্বোৎকৃষ্ট?" তিনি বলিলেন–"সুস্থ দেহে আরও বাঁচিবার আশা থাকাকালীন দারিদ্রতার ভয় না করিয়া দান করা সর্বোৎকৃষ্ট। দানে গড়িমসি করিতে করিতে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়া 'ইহা অমুকতে দাও; উহা অমুককে দাও' বলা শ্রেয় নহে। কারণ, এ সময় সে দান করুক বা না করুক তাহার সমস্ত মাল আপনা-আপনিই অপরের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িবেই।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"যে ব্যক্তি নিজ গৃহ হইতে ফকিরকে বঞ্চিত করিয়া ফিরাইয়া দেয় সাত দিন পর্যন্তই সেই গৃহে ফেরেশতা গমন করে না।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইটি কাজ অপরের উপর ছাড়িতেন না, স্বয়ং নিজ হস্তে করিতেন। যথা (১) নিজ হস্ত মুবারকে দরিদ্রকে দান করিতেন এবং (২) তাহাজ্জুদের ওযূর জন্য পানি সংগ্রহ করত নিজে ঢাকিয়া রাখিতেন। তিনি বলেন–"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করাইবে সেই বস্ত্র যতদিন তাহার পরিধানে থাকিবে ততদিন দাতা আল্লাহ্র হিফাজতে থাকিবে।" হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিতেন অথচ, তাঁহার পরিধানে তালি দেওয়া জামা থাকিত; তথাপি তিনি নূতন জামা তৈয়ার করাইয়া লইতেন না। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি সত্তর বৎসর ইবাদত করিয়াছিলেন ; একবার তাঁহার দ্বারা এত বড় এক পাপকর্ম সংঘটিত হইয়া পড়িল যে, তাঁহার সত্তর বৎসরের ইবাদত নষ্ট হইয়া গেল। সে ব্যক্তি এক ফকিরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাকে একটি রুটি দান করিলেন। ফল-স্বরূপ, আল্লাহ্ তাঁহার মহাপাপ ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং উক্ত সত্তর বৎসরের ইবাদতের সওয়াব তাঁহাকে প্রদান করিলেন। লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিলেন, "হে বৎস, যখনই তোমার দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হয় তখনই দান করিবে।" হযরত ইবনে উমর রাদিয়াআল্লাহু আনহু প্রচুর পরিমাণে চিনি দান করিতেন এবং বলিতেন যে, আল্লাহ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

অর্থাৎ "তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই নেকী পাইবে না।" আর আল্লাহ্ জানেন যে, আমি চিনি পছন্দ করি।" হযরত শা'আবী (র) বলেন-"দরিদ্রের জন্য দানের বস্তু যত আবশ্যক, দানের সওয়াব দাতার জন্য তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক, এই কথা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে না তাহার দান কবূল হয় না।" হযরত হাসান বসরী (র) এক দাস-বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী দাসী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"দুই দিরহাম মূল্যে তাহাকে কি বিক্রয় করিবে?" "সে বলিল-"না।" তিনি বলিলেন-"যাও, আল্লাহ্ দুই দিরহামের পরিবর্তে এমন পরমা সুন্দরী হুর দান করেন যাহা তোমার দাসী অপেক্ষা বহু গুণে অধিক সুন্দরী।" অর্থাৎ দুই দিরহাম দানের বিনিময়ে আল্লাহ্ বেহেশতে সেইরূপ পরমা সুন্দরী হুর দান করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযা

রোযা ইসলামে অন্যতম ভিত্তি। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ বলিয়াছেন, প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব আমি দশ হইতে সাতশত পর্যন্ত দিয়া থাকি। কিন্তু রোযা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয় বলিয়া আমি স্বয়ং ইহার প্রতিদান। আল্লাহ্ এ সম্বন্ধে আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থাৎ "বাসনা-কামনা দমনকারীদিগকে আল্লাহ্ উহার বিনিময়ে যাহা প্রদান করিবেন তাহা অসংখ্য, অপরিমিত ও অসীম।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবর ঈমানের অর্ধেক এবং রোযা সবরের অর্ধেক।" তিনি বলেন– "রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মৃগ-নাভীর সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ বলেন– "আমার বান্দা কেবল আমার জন্যই পানাহার স্ত্রী-সহবাস বর্জন করিয়াছে। একমাত্র আমিই ইহার বিনিময় প্রদান করিতে পারি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "রোযাদারের নিদ্রা ইবাদত ও শ্বাস-প্রশ্বাস তসবীহস্বরূপ এবং তাহার দু'আ নির্ঘাৎ গ্রহণযোগ্য।" তিনি বলেন–"রমযান মাসের আগমনে বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত, দোযখের দরজাসমূহ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানগণকে বন্দী করা হয় ও এক ঘোষণাকারী ডাকিয়া বলে–"হে কল্যাণকামী, তাড়াতাড়ি আস; এখন তোমার সময়। আর হে পাপী, ক্ষান্ত হও, এখন তোমার স্থান নাই।" রোযার বড় ফযীলত এই যে, আল্লাহ্ ইহাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ "কোবল আমার উদ্দেশ্যেই রোযা রাখা হয় এবং আমি ইহার বিনিময় প্রদান করিব।" সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত হইলেও কা'বা শরীফকে যেমন তাঁহার গৃহ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকিলেও রোযাকে তাঁহার নিজের বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইখানেই রোযার বিশেষত্ব।

রোযা আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণ ঃ দুইটি বিশেষত্বের কারণে রোযা বেনিয়ায আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার উপযোগী হইয়াছে- (১) রোযার মূলতত্ত্ব হইল বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করা এবং ইহা লোকচক্ষু হইতে সম্পূর্ণ গুপ্ত অন্তরের কার্য। সুতরাং ইহাতে রিয়ার অবকাশ নাই। (২) শয়তান আল্লাহ্‌র শত্রু এবং বাসনা-কামনা শয়তানের সৈন্য। রোযা শয়তানের সৈন্যকে পরাজিত করে। কারণ বাসনা-কামনা বর্জনই হইল রোযার গূঢ় মর্ম। এইজন্যই রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"মানব শরীরে রক্ত যেরূপ চলাচল করে শয়তান তদ্রূপ তাহার অন্তরে চলাচল করে। সুতরাং ক্ষুধার্ত থাকিয়া শয়তানের পথ দুর্গম করিয়া দাও।" তিনি আরও বলেন ঃ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ। অর্থাৎ "রোযা ঢালস্বরূপ।" হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- 'বেহেশতের দরজায় খটখটাইতে থাক।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল-"কোন জিনিস দ্বারা?" তিনি বলিলেন-"ক্ষুধা দ্বারা।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"রোযা ইবাদতের দরজা।" রোযার এত ফযীলতের কারণ এই -বাসনা-কামনা সকল ইবাদাতের প্রতিবন্ধকতা এবং তৃপ্তির সহিত ভোজনে বাসনা-কামনা প্রবল হইয়া উঠে; আর ক্ষুধা বাসনা-কামনাকে বিনাশ করে।

রোযার ফরযসমূহ ঃ রোযার মধ্যে ছয়টি কাজ ফরয। (১) রমযান মাসের নবচন্দ্রের অন্বেষণ করা। রমযান শরীফের চাঁদ দেখা গেলেই রোযার মাস আরম্ভ হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পূর্ববর্তী শা'বান মাসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে- ইহার ঊনত্রিশ দিন হইয়াছে কি ত্রিশ দিন হইয়াছে। ত্রিশ পূর্ণ হইলে পর দিন হইতেই রমযান মাস ধরিতে হইবে। উভয় অবস্থাতেই পরদিন রোযা রাখা ফরয। একজন পরহিযগার ন্যায়পরায়ণ মুসলমান নিজে চাঁদ দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিলে তাহা বিশ্বাস করত তদনুযায়ী কাজ করা জায়েয আছে। কিন্তু ঈদের চাঁদ সম্বন্ধে দুইজন তদ্রূপ মুসলমানের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে রোযা ভঙ্গ করা দুরস্ত নহে। রমযানের চাঁদ উঠিয়াছে বলিয়া কোন বিশ্বস্ত সত্যবাদী লোকের নিকট কেহ শুনিতে পাইলে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য কাযীর নিকট অগ্রাহ্য হইলেও শ্রোতার প্রতি রোযা রাখা ফরয হইবে। (২) রোযার নিয়ত করা। প্রত্যেক রাত্রে রোযার নিয়ত করা উচিত এবং মনে রাখিতে হইবে-আমি বর্তমান রমযান মাসের ফরয রোযা পালন করিতেছি। যে মুসলমান এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবে তাহার অন্তর নিয়তশূন্য থাকিবে না। প্রথম রাত্রে চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে যদি কেহ এইরূপ নিয়ত করে, 'আগামীকল্য রমযান হইলে আমি রোযা রাখিলাম, তবে পরদিন রমযান হইলেও এরূপ নিয়ত দুরস্ত নহে। কিন্তু কোন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্যে সন্দেহ দূর হইলে দুরস্ত হইবে। আর রমযানের শেষ

তারিখে ঈদের চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তদ্রূপ নিয়ত করা দুরস্ত আছে। কারণ কখনও রমযান মাস বাকি থাকে। অন্ধকারে আবদ্ধ ব্যক্তি চাঁদ দেখিতে অক্ষম হইয়া অনুমান করত চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে যদি রোযার নিয়ত করে তবে দুরস্ত হইবে। রাত্রে নিয়ত করিবার পর সুবহে সাদিকের পূর্বে কিছু আহার করিলে নিয়ত ভঙ্গ হইবে না। ঋতুবতী স্ত্রীলোক যদি মনে করে, আগামীকল্য ঋতু বন্ধ হইবে এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করত রাত্রে রোযার নিয়ত করে আর ঋতুও বন্ধ হইয়া যায় তবে তাহার রোযা দুরস্ত হইবে। (৩) বাহিরের কোন জিনিস ইচ্ছাপূর্বক শরীরের ভিতরে প্রবেশ না করান। শিরা হইতে রক্ত বাহির করা। ('ফাসদ লওয়া), সিঙ্গা লাগান, সুরমা ব্যবহার করা, কানে কাঠি প্রবেশ করান, লিঙ্গের ছিদ্রে তুলা স্থাপন করা ইত্যাদি কার্যে রোযা নষ্ট হইবে না। কারণ, শরীরের ভিতর বলিতে তাহাই উদ্দেশ্য যাহাতে কোন জিনিস স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারে ; যেমন, মস্তিষ্ক, উদর, পাকস্থলী, মূত্রাধার ইত্যাদি। কিন্তু বিনা ইচ্ছায় কোন জিনিস গলার ভিতর চলিয়া গেলে রোযা নষ্ট হইবে না, যেমন মাছি, ধূলা বা কুলির পানি। কিন্তু কুলি করিবার সময় বাড়াবাড়ি করত গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করাইলে রোযা নষ্ট হইবে। ভুলবশত হঠাৎ কোন বস্তু গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হইবে না। কিন্তু সুবহে সাদিক হয় নাই বা সূর্যাস্ত হইয়াছে মনে করত কিছু আহার করিলে পরে যদি জানা যায় যে, সুবহে সাদিক হইয়া গিয়োছে বা সূর্যাস্ত হয় নাই, তবে এই উভয় অবস্থাতেই রোযা নষ্ট হইবে এবং উহার কাযা আদায় করিতে হইবে। (৪) স্ত্রী সহবাস না করা। স্ত্রী-পুরুষের যতটুকু নৈকট্য হইলে গোসল ফরয হয়, রোযা রাখিয়া ততটুকু নৈকট্য হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ভুলক্রমে এইরূপ হইলে রোযা ভাঙ্গিবে না। রাত্রে স্ত্রী-সহবাস করলে সুবহে সাদিকের পর গোসল করিলে রোযা দুরস্ত হইবে। (৫) কোন প্রকার শুক্রস্খলন বা ইহার ইচ্ছা না করা। স্ত্রী-পুরুষের নৈকট্য অর্থাৎ স্পর্শ আকর্ষণ, ঘর্ষণ, চুম্বন প্রভৃতি কাজে, সঙ্গম না করিয়াও, যদি স্বামী যুবক হয় ও শুক্রপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং অবশেষে শুক্রপাত হইয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে। (৬) ইচ্ছাপূর্বক বমি না করা। অনিচ্ছায় বমি হইয়া গেলে রোযা নষ্ট হইবে না। যক্ষ্মা বা অন্য কোন রোগের কারণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত পানি উদ্‌গার হইলে এবং তৎক্ষণাৎ উহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা এইরূপ উদ্‌গার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নাই। কিন্তু উত্থিত পানি গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হইবে।

রোযার সুন্নত ঃ রোযার সুন্নত ছয়টি। (১) বিলম্বে সেহরী খাওয়া (২) খুরমা বা পানি দ্বারা সময়মত তাড়াতাড়ি ইফতার করা।(৩) দ্বিপ্রহরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিসওয়াক না করা। (৪) দরিদ্রকে আহার প্রদান করা। (৫) অধিক পরিমাণে কুরআন

শরীফ তিলাওয়াত করা। (৬) মসজিদে ই'তেকাফ করা; বিশেষত রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করা। এই দশদিনের মধ্যেই শবে কদর রহিয়াছে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এই দশদিন বিশ্রাম ও নিদ্রা পরিত্যাগ করত কেবল ইবাদতে রত থাকিতেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ সেই দশ দিন মুহূর্তকালও ইবাদত হইতে বিরত থাকিতেন না। রমযানের ২১, ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখে শবেকদর হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময় ২৭ তারিখেই শবেকদর হয়। এই জন্য রমযানের শেষ দশ দিনের দিবারাত্র ই'তেকাফে লিপ্ত থাকা অতি উত্তম। মান্নত করিলে উহা পালন করা ওয়াজিব হইয়া পড়ে। পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন ব্যতীত ই'তেকাফের অবস্থায় মসজিদের বাহিরে যাইবে না। পায়খানা-পেশাবের পর ওযূর জন্য যতটুকু সময়ের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক সময় মসজিদের বাহিরে থাকিবে না। জানাযার নামায, পীড়িত লোককে দেখা, সাক্ষাৎ প্রদান বা নূতন ওযূর জন্য মসজিদের বাহিরে গেলে ই'তেকাফ ভঙ্গ হয় না। ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে হাত ধোয়া, আহার করা এবং নিদ্রা যাওয়া দুরস্ত আছে। পায়খানা-পেশাবের পর আবার নূতনভাবে ইতেকাফের নিয়ত করিয়া লইবে।

রোযার শ্রেণী বিভাগ ঃ রোযা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা-(১) সাধারণ লোকের রোযা, (২) মধ্যম শ্রেণীর লোকের রোযা ও (৩) উচ্চ শ্রেণীর লোকের রোযা। ইতঃপূর্বে রোযা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই সাধারণ লোকের রোযা। পাহানার, স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকিলেই রোযার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পন্ন হইল। ইহা সর্বনিম্ন শ্রেণীর রোযা। উচ্চ শ্রেণীর লোকের রোযাই সর্বোচ্চ শ্রেণীর রোযা। এই শ্রেণীর রোযার রোযাদারের হৃদয়কে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া আল্লাহ্র নিকট নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয় এবং আল্লাহ্ ভিন্ন সমস্ত পদার্থের প্রতি অন্তরে ও বাহিরে একেবারে বিমুখ ও নির্লিপ্ত থাকিতে হয়। আল্লাহ্র কালাম ও ইহার আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে মন দিলে রোযা এই উন্নত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয় না। পার্থিব আবশ্যক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যদিও অসঙ্গত নহে তথাপি ইহাতে রোযার এই উন্নততর মর্যাদা নষ্ট হয়। সাংসারিক যে কর্ম ধর্ম-কার্যের সহায়তা হয় তাহা বাস্তবপক্ষে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। তথাপি আলিমগণ বলেন, দিবাভাগে ইফতারের আয়োজন করিলে পাপ হইবে। কারণ, ইহাতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ যে জীবিকা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন তৎপ্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আম্বিয়া (আ) ও সিদ্দিকগণের রোযা এই উন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সকলে এই উন্নত মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

মধ্যম শ্রেণীর লোকের রোযা ঃ কেবল পানাহার, স্ত্রী-সহবাস পরিত্যাগ করিলেই রোযা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় না; বরং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপ ও অন্যায়

কাজ হইতে বিরত রাখিতে হইবে। ছয়টি বিষয়ে এই শ্রেণীর রোযার পূর্ণতা লাভ হয়। (১) যে সকল বস্তু দর্শন করিলে আল্লাহ্‌র দিক হইতে মন ফিরিয়া যায় উহা দর্শন না করা। বিশেষজ্ঞ কামভাব জাগ্রত করে এমন কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করিবে না। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন– "শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে চোখের দৃষ্টি একটি অতি বিষাক্ত তীর। আল্লাহ্‌র ভয়ে যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ দৃশ্যের দর্শন হইতে চক্ষুকে সংযত রাখিবে তাহার ঈমানকে এমন সুসজ্জিত করা হইবে যাহার মিষ্টতা সে তাহার অন্তরে অনুভব করিবে।" হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–"রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন– মিথ্যা কথন, গীবত, চুগলখোরী, মিথ্যা শপথ ও কামভাবে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা–এই পাঁচ কার্যে রোযা নষ্ট হয়।" (২) বেহুদা বক্‌বক ও বেফায়দা কথা হইতে রসনাকে সংযত রাখিয়া আল্লাহ্‌র যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা অথবা নীরব থাকা। তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-কলহ বেহুদা কথার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন আলিমের মতে গীবত ও মিথ্যা কথন সাধারণ লোকের রোযাও নষ্ট করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দুইজন রোযাদার স্ত্রীলোক পিপাসায় মরণাপন্ন হইয়া রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট রোযা ভঙ্গের অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট পাত্র পাঠাইয়া উহাতে বমি করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়ের গাল হইতে জমাট রক্তপিণ্ড বাহির হইল। লোকে উহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেলেন–"আল্লাহ্‌র যে বস্তু হালাল করিয়াছেন তাহা দ্বারা এই দুইজন স্ত্রীলোক রোযা রাখিয়াছিল এবং তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দ্বারা রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ; অর্থাৎ তাহারা কাহারও গীবত করিয়াছে। এই রক্ত মানুষের মাংস যাহা তাহারা ভক্ষণ করিয়াছে।" (৩) অশ্লীল বাক্য শ্রবণ হইতে কর্ণকে বিরত রাখা। কারণ মন্দ কথা শুনাও উচিত নহে। গীবত ও মিথ্যা কথা যে শ্রবণ করে সেও যে ব্যক্তি গীবব করে ও মিথ্যা বলে তাহার পাপের শরীক হইয়া থাকে। (৪) হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কার্য হইতে বাঁচাইয়া রাখা। যে ব্যক্তি মন্দ কার্য করে সে এমন রোগীতুল্য, যে রোগের ভয়ে ফল ভক্ষণে বিরত থাকে অথচ বিষ পান করে। পাপই বিষ এবং খাদ্য খাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচায়। খাদ্য অধিক পরিমাপে খাইলেই অনিষ্ট হয় ; খাদ্যও মূলত অনিষ্টকর নহে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন–"এমন বহু রোযাদার আছে যাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ব্যতীত রোযা হইতে আর কোন কিছুই লাভ হয় না।" (৫) ইফতারের সময় হারাম বা সন্দেহজনক খাদ্য খাইবে না। হালাল খাদ্য ও অতিরিক্ত খাইবে না। কারণ, দিবারাত্রের নির্ধারিত খাদ্য রাত্রেই খাইয়া ফেলিলে রোযা রাখিয়া কি লাভ হইবে? কেননা, খাহেশ দমন করাই রোযার উদ্দেশ্য এবং দুইবারের খাদ্য

একবারে খাইলে খাহেশ অধিক বৃদ্ধি পায়। বিশেষত নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য খাইলে খাহেশ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলী খালি না হইলে অন্তর পরিষ্কার হয় না। বরং দিবাভাগে অধিক না ঘুমাইয়া জাগ্রত থাকা সুন্নত যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দুর্বলতা প্রভাব নিজের মধ্যে অনুভূত হয়। রাত্রে অল্প আহার করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন না করিলে তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায় না। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন যে, পরিপূর্ণ উদর আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট ভাণ্ড। (৬) ইফতারের পর রোযা কবূল হইবে কিনা, এই ভয় রাখা। হযরত হাসান বসরী (র) ঈদের দিন একদল লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা হাস্য-কৌতুক করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আল্লাহ্ রমযান মাসকে ময়দানস্বরূপ বানাইয়াছেন যেন তাহার বান্দাগণের একদল ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা অপর দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং একদল অপর দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। যাহারা হাস্য-কৌতুক করে ও নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহে তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময় লাগে। আল্লাহ্র শপথ যখন পর্দা বিদূরিত হয় এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় তখন যাহাদের ইবাদত কবূল হইয়াছে তাহারা আনন্দিত হইবে ; আর যাহাদের ইবাদত কবূল হয় নাই তাহারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হইবে। অতএব কখনও হাস্য-কৌতুকে লিপ্ত হওয়াও উচিত নহে।

রোযার হাকীকত ঃ উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল, ব্যক্তি শুধু পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া রোযা রাখে তাহার রোযা প্রাণহীন দেহস্বরূপ। মানুষ নিজে ফেরেশতার ন্যায় করিয়া তুলিবে, ইহাই রোযার হাকীকত। ফেরেশতার খাহেশ (কাম, লোভ) নাই; চতুষ্পদ জন্তুর খাহেশ প্রবল। এইজন্যই পশু ফেরেশতা হইতে বহু দূরে এবং মানুষের মধ্যেও যাহাদের খাহেশ প্রবল তাহারা পশুর ন্যায়। খাহেশ দমন হইলেই ফেরেশতার সহিত মানুষের সাদৃশ্য স্থাপিত হয়। এইজন্যই মানুষ গুণের দিক দিয়া ফেরেশতার নিকটবর্তী নহে। ফেরেশতা আল্লাহ্র নিকটবর্তী। অতএব ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত হইলে মানুষও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি ইফতারের পর উদর ভর্তি করিয়া আহার করে তাহার খাহেশ দুর্বল না হইয়া আরও প্রবল হইয়া উঠিবে এবং তাহার রোযা জীবন্ত হইবে না।

কাযা, কাফ্ফারা ইম্সাক ও ফিদ্ইয়া ঃ রমযানের রোযা ভঙ্গকারীর উপর অবস্থাভেদে কাযা, কাফ্ফারা, ইম্সাক ও ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হইয়া থাকে। শরীয়ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি রোযা রাখিতে বাধ্য সে কোন ওযরে বা বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভাঙ্গিলে ইহার পরিবর্তে তাহাকে উক্ত রোযার কাযা অবশ্যই করিতে হইবে। তদ্রূপ ঋতুবতী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক,মুসাফির, পীড়িত ব্যক্তি এবং ইসলাম-ত্যাগী

পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করিলে, তাহাদের সকলের উপরই রোযার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু পাগল ও নাবালেগের প্রতি রোযার কাযা ওয়াযিব নহে।

কাফ্‌ফারা ঃ রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস বা ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করিলে কিংবা বিনা ওযরে অন্য কোন উপায়ে রোযা ভঙ্গ করিলে তাহার উপর রোযার কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে। কাফ্‌ফারা এই একজন দাস বা দাসী আযাদ করিতে হইবে। ইহা না পারিলে একাদিক্রমে ষাট দিন রোযা রাখিতে হইবে ইহাও না পারিলে ষাট জনের ফিতরা পরিমাণ শস্য ষাটজন মিসকিনকে দিতে হইবে।

ইম্‌সাক ঃ দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর ইম্‌সাক ওয়াযিব। ঋতুবতী স্ত্রীলোক দিবাভাগে পবিত্র হইলে, মুসাফির দিবাভাগে মুকীম হইলে অথবা পীড়িত ব্যক্তি দিবাভাগে আরোগ্য লাভ করিলে তাহাদের কাহারও উপর ইম্‌সাক ওয়াজিব নহে।

রমযান শরীফের প্রথম তারিখ সন্দেহযুক্ত হইলে কোন ব্যক্তি যদি খবর দেয় যে, আমি চাঁদ দেখিয়াছি, তবে যাহারা রোযা রাখে নাই তাহাদের উপর এই সংবাদ শ্রবণের পর সেই দিবসের অবশিষ্টাংশ পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হইতে বিরত থাকিয়া রোযাদারের ন্যায় কাটাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। রোযাদার দিবাভাগে সফরে বাহির হইলে বা রোযা রাখিয়া সেই দিনই দূরবর্তী কোন স্থানে উপস্থিত হইলে রোযা ভঙ্গ করা তাহারও উচিত নহে। রোযা রাখিতে অক্ষম না হইলে মুসাফিরের পক্ষে রোযা না রাখা অপেক্ষা রাখাই উত্তম।

ফিদইয়া ঃ প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজনের ফিতরা পরিমাণ খাদ্য-শস্য মিসকিনকে দান করাই ফিদইয়া বলে। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কায় রোযা ভাঙ্গিলে ইহার কাযার সহিত (শাফেয়ী মতে) ফিদইয়া দেওয়াও ওয়াজিব হইবে। যে রোগী প্রাণনাশের ভয়ে রোযা ভঙ্গ করে তাহার ফিদইয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম হইলে তাহার প্রতি কাযার পরিবর্তে ফিদইয়া ওয়াজিব হইবে। রমযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করিতে পরবর্তী রমযান আসিয়া পড়িলে (শাফেয়ী মতে) এই রোযার কাযার সহিত ফিদইয়াও ওয়াজিব হইবে।

বৎসরের অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ রোযা ঃ বৎসরের মধ্যে ফযীলতপূর্ণ ও কল্যাণজনক দিনগুলিতে রোযা রাখা সুন্নত; যেমন আরাফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, মুহররম মাসের প্রথম দশ দিন এবং রজব ও শা'বান। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রমযানের পর মুহররমের রোযা সকল রোযা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট ও পূর্ণ মুহররম মাসে রোযা রাখা সুন্নত এবং এই মাসের প্রথম দশ দিন রোযার জন্য খুব তাকীদ আছে। হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ আছে যে, মুহররম মাসের এক রোযা অন্যান্য মাসের বিশ রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং রমযান মাসের এক রোযা অন্যান্য মাসের বিশ রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং রমযানের শরীফের এক রোযা মুহররমের মাসে বিশ রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন–"যে ব্যক্তি পবিত্র মাসের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রোযা রাখিবে তাহাকে সাতশত বৎসর ইবাদতের সওয়াব প্রদান করা হইবে। পবিত্র মাস চারিটি, যথা– মুহররম, রজব, যিলকদ ও যিলহজ্ব এবং তন্মধ্যে যিলহজ্ব মাসের ফযীলত সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, ইহা হজ্জের মাস।" হাদীস শরীফে আছে, "আল্লাহ্‌র নিকট যিলহজ্বের প্রথম দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোন সময়ের ইবাদত অধিক উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় নহে। এই সময়ের একদিনের রোযা এক বৎসরের রোযার সমান এবং এক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের ন্যায়।" লোকে নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জিহাদেরও কি এত ফযীলত নাই?" তিনি বলিলেন–জিহাদেও নাই; তবে জিহাদে যাহার অশ্ব হত হয় এবং সে নিজেও শহীদ হয়, সে তত ফযীলত পাইবে।" রজব মাসে একাধারে রোযা রাখিলে ইহা রমযানের মাসের ন্যায় দেখায় বলিয়া কতিপয় সাহাবা (রা) তাহা অপছন্দ করিয়াছেন। এইজন্যই এই মাসে এক বা একাধিক দিন তাঁহারা রোযা রাখেন নাই।

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, শা'বানের অর্ধেক গত হইলে রমযান পর্যন্ত আর রোযা না রাখা উচিত। রমযান মাস যেন পৃথক দেখায় এইজন্য শা'বানের শেষার্ধে রোযা একেবারে না রাখাই উত্তম। রমযান শরীফের অভ্যর্থনার জন্য শাবানের শেষভাগে রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে রাখিলে মাকরূহ নহে। আবার প্রত্যেক মাসের আয়্যামে বীয অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের রোযায় অত্যন্ত ফযীলত আছে। সপ্তাহে সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখিলে সব রোযাই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সারা বৎসরের মধ্যে পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম; যথা–ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন, আয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্বের তারিখের তিন দিন। ইফতার না করিয়া বরাবর রোযা রাখা মাকরূহ। যে ব্যক্তি সারা বৎসর রোযা রাখিতে অক্ষম, তাহার জন্য সারা বৎসর একদিন অন্তর রোযা রাখা ভাল। এইরূপ রোযাকে সওমে দাউদ বলে। কারণ, হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম এরূপ একদিন অন্তর একদিন রোযা রাখিতেন। এই রোযার ফযীলত অনেক বেশি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট রোযার সর্বোৎকৃষ্ট

নিয়ম জানিতে চাহিলে তিনি উক্ত সাওমে দাউদের কথা বলিলেন। তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন-"আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম জানিতে চাহিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন-"ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম আর নাই। আর ইহার অপর এক নিয়ম আছে, তাহা হইল বৃহস্পতিবারে ও সোমবারে রোযা রাখা।" ইহা পরিমাণে বৎসরের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া ইহার ফযীলত প্রায় রমযানের সমতুল্য।

রোযার উদ্দেশ্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, কামনা-বাসনা দমন করা ও অন্তর পবিত্র করাই রোযার উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় নিজ নিজ অন্তরকে যাচাই করিয়া দেখা প্রত্যেকেরই উচিত। তাহা হইলেও বুঝা যাইবে কোন্ অবস্থায় রোযা রাখা মঙ্গলজনক এবং কোন্ অবস্থায় রোযা না রাখা হিতকর। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও অনবরত এমনভাবে রোযা রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত, তিনি কখনও রোযা ভঙ্গ করেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি এমনভাবে রোযা বন্ধ রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত, তিনি আর কখনও রোযা রাখিবেন না। তাঁহার রোযা রাখার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

অনেক দিন রোযা বন্ধ রাখার দোষ ঃ কতিপয় আলিম একাধারে চারি দিনের অধিক রোযা হইতে বিরত থাকাকে মাকরূহ বলিয়া মনে করেন। ঈদুল আযহার দিন এবং তৎপরবর্তী তিন দিন- এই চারিদিন রোযা রাখা হারাম, ইহা হইতেই তাঁহারা উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ, ক্রমাগত অনেক দিন রোযা না রাখিলে অলসতা ও হৃদয়ে মলিনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং অন্তদৃষ্টি দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

হজ্জ

হজ্জের ফযীলত ঃ হজ্জ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং ইহা সারা জীবনে একবার করণীয় ইবাদত। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি হজ্জ (ফরয হওয়া সত্ত্বেও ইহা) সম্পন্ন না করিয়া মারা যায়, তাহাকে বলিয়া দাও, সে ইয়াহুদী হইয়া মরুক বা খ্রিস্টান হইয়া মরুক।" তিনি বলেন-"যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার সময় পাপ করে না এবং বেহুদা ও অশ্লীল কথা বলে না সে পূর্বকৃত পাপ হইতে এরূপ নিষ্পাপ হইয়া যায় যেরূপ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন সে নিষ্পাপ ছিল। তিনি বলেন- "বহু পাপ এমন আছে যাহা আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান না হইলে খণ্ডন হয় না।" তিনি বলেন-"আরাফার দিনে শয়তান যেমন অপদস্থ ও বিষণ্ন হয় তদ্রূপ আর কোনদিন হয় না। কারণ, সেই দিন আল্লাহ্ স্বীয় বান্দার উপর বিশেষ রহমত নাযিল করেন এবং অসংখ্য কবীরা গুনাহ্ মাফ করিয়া থাকেন।" তিনি বলেন-যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আমলনামায় প্রতি বৎসর এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ বা মদীনা শরীফ পৌঁছিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে সে কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশ হইতে অব্যাহতি পাইবে।" তিনি বলেন-"বিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন মকবুল এক হজ্জ সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম ; বেহেশত ব্যতীত অন্য কিছুই ইহার বিনিময় হইতে পারে না।" তিনি আরও বলেন-"হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দান দণ্ডায়মান হইয়া যদি কেহ মনে করে যে, আমার গুনাহ মাফ হইল না, তবে তদপেক্ষা অধিক গুনাহ্ আর কিছুই নাই।" হযরত আলী বিন মওয়াফ্ফির নামে এক বুযর্গ ছিলেন। তিনি বলেন-"এক বৎসর আমি হজ্জ করত আরাফার রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, সবুজ পোশাকধারী দুই ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরণ করেন। তাঁহাদের একজন অপরজনকে বলিলেন, 'আপনি কি জানেন এ বৎসর কতজন লোক হজ্জ করিয়াছে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'না'। সেই ফেরেশতা বলিলেন, 'ছয় লক্ষ।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- 'আপনি কি জানেন কত লোকের হজ্জ কবূল হইয়াছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না'। সেই ফেরেশতা পুনরায় বলিলেন, 'মোট ছয়জনের হজ্জ কবূল হইয়াছে।' সেই বুযর্গ

বলিলেন–'ফেরেশতা দুইজনের কথা শুনিয়া ভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। আর আমি মনে মনে বলিলাম, আমি কখনই সেই ছয়জনের মধ্যে হইব না। এইরূপ চিন্তা ও মনস্তাপে মশ্‌আরুল হারামে পৌঁছিয়া আবার নিদ্রামগ্ন হইলাম। স্বপ্নে আবার ঐ দুই ফেরেশতাকে পরস্পর ঐ প্রকার আলাপ করিতে দেখিলাম। তখন একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'আপনি কি জানেন, আজ রাত্রে আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণের সম্বন্ধে কি আদেশ দান করিয়াছেন?' দ্বিতীয়জন বলিলেন– 'না'। সেই ফেরেশতা বলিলেন–'সেই ছয়জনের তুফায়েলে আল্লাহ্ ছয় লক্ষকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।' তৎপর প্রফুল্লচিত্তে আমি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলাম এবং করুণাময় আল্লাহ্‌র শোকরগুজারী করিলাম।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্ ওয়াদা করিয়াছেন, প্রতি বৎসর হজ্জ উপলক্ষে ছয় লক্ষ লোক কা'বা শরীফ যিয়ারত করিবে। তদপেক্ষা কম লোকের সমাগম হইলে ফেরেশতা পাঠাইয়া তিনি এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিবেন। আর হাশরের দিন কাবা শরীফকে নববধুর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া উপস্থিত করা হইবে এবং হাজিগণ ইহার চারিদিকে তওয়াফ করিতে থাকিবে ও আহারা ইহার আচ্ছাদন বস্ত্রে স্পর্শ করিতে থাকিবে। পরিশেষে কা'বা শরীফ বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং হাজিগণও উহার সহিত বেহেশতে ঢুকিয়া পড়িবে।

হজ্জের শর্তসমূহ ঃ নির্ধারিত সময়ে হজ্জ করিলে হজ্জ দুরস্ত হইবে। পহেলা শাওয়াল হইতে ৯ই যিলহজ্ব সময়। (এই সময়ে হজ্জের আনুষঙ্গিক কার্য করা যায় বলিয়া হজ্জের সময় বলা হইয়াছে)। ঈদুল ফিতরের দিন প্রাতঃকাল হইতেই হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয। ইহার পূর্বে ইহরাম বাঁধিলে হজ্জ হইবে না, বরং ওমরাহ হইবে। ভালমন্দ বুঝিতে পারে এমন বালকের হজ্জ দুরস্ত হইবে। দুগ্ধপোষ্য শিশু হইলে অভিভাবক যদি তাহার পক্ষে ইহরাম বাঁধিয়া শিশুকে আরাফার "ময়দানে উপস্থিত রাখিয়া সাঈ ও তওয়াফ" করে তবে এই হজ্জ শিশুর পক্ষেই গণ্য হইবে। অতএব নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়াই হজ্জের শর্ত। কিন্তু ইসলামের হজ্জের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ এবং ফরয আদায় হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রহিয়াছে, যথা– (১) মুসলমান হওয়া, (২) আযাদ হওয়া, (৩) বালেগ হওয়া, (৪) বোধসম্পন্ন হওয়া, (৫) নির্দিষ্ট সময়ে ইহরাম বাঁধা। নাবালেগ অথবা দাস-দাসী যদি ইহরাম বাঁধে এবং আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বে বালেগ হয় বা স্বাধীনতা লাভ করে তবে তাহারা হজ্জের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। ফরয ওমরাহ আদায়ের জন্যও উল্লিখিত পাঁচটি শর্ত রহিয়াছে। কিন্তু ওমরাহ সারা বৎসরই করা যায়।

অন্যের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ হজ্জ করিবার শর্ত এই যে, প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করিয়া লইতে হইবে। নিজের ফরয হজ্জ আদায়ের পূর্বে অপরের

বদলী হজ্জ করিবার নিয়ত করিলে হজ্জকারীর হজ্জই আদায় হইবে ; যাহার বদলী হজ্জ করিবার নিয়ত করিয়াছে তাহার হজ্জ আদায় হইবে না। প্রথমে ফরয হজ্জ তৎপর কাযা হজ্জ, তৎপর মান্নতের হজ্জ এবং তৎপর অপরের পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ করিতে হইবে। এই নিয়মের বিপরীত নিয়ম করিলেও এই তরতীব অনুযায়ী হজ্জ আদায় হইবে।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত এই-(১) মুসলমান হওয়া, (২) বালেগ হওয়া, (৩) আযাদ হওয়া ও (৪) সামর্থ্য থাকা। এই সামর্থ্য দুই প্রকার-(ক) সুস্থ দেহে শরীর খাটাইয়া স্বয়ং হজ্জ করিবার শক্তি থাকা। এই শক্তি আবার তিন জিনিসে লাভ হয়- (১) সুস্থ শরীর, (২) নিরাপদ রাস্তা অর্থাৎ পথিমধ্যে ভয়সঙ্কুল সমুদ্র এবং শত্রু কর্তৃক জান ও মাল নাশের আশংকা না থাকা এবং (৩) এই পরিমাণ ধন থাকা যদ্দ্বারা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করত যাতায়াতের যানবাহন ও থাকা খাওয়ার ব্যয় স্বাচ্ছন্দ্যে চলে এবং তদুপরি সফর হইতে দেশে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত পরিবারস্থ সকলের ভরণ-পোষণ স্বাচ্ছন্দ্যে নির্বাহ হয় ঃ (খ) যে ব্যক্তি নিজের শরীর খাটাইয়া হজ্জ করিতে পারে না- যেমন শরীর অবশ হইয়া পড়িল বা পীড়াগ্রস্ত হইয়া এমনভাবে শয্যাশায়ী হইল যে, পুনরায় আরোগ্য লাভের আশা নাই তাহার সামর্থ্য এই- তাহার এই পরিমাণ ধন থাকা আবশ্যক যাহাতে সে অন্য একজনকে যাবতীয় খরচ ও মজুরি দিয়া তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইয়া তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করাইতে পারে। অচল ব্যক্তির পুত্র পিতা হইতে কোন খরচ গ্রহণ না করিয়া নিজ ব্যয়ে পিতার হজ্জ করিয়া দিতে চাহিলে ইহাতে সম্মতি হওয়া পিতার কর্তব্য। কারণ, পিতার খেদমত করা মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। কিন্তু পুত্র নিজে হজ্জে না যাইয়া যদি বলে, আমি যাবতীয় খরচ ও মজুরি দিতেছি, আপনি অপর কাহাকেও প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করত আপনার হজ্জ করাইয়া লউন তবে এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া পিতার অবশ্য কর্তব্য নহে। কারণ ইহাতে ইবাদত-কার্যে পুত্রের অনুকম্পা গ্রহণ করা হয়। এইরূপ কোন অনাত্মীয় যদি অচল ব্যক্তি হইতে খরচাদি গ্রহণ না করিয়া প্রতিনিধিরূপে তাহার হজ্জ করিয়া দিতে ইচ্ছা করে তবে এইরূপ অনুকম্পা গ্রহণ করাও আবশ্যক নহে।

হজ্জ সম্পাদনের সামর্থ্য হওয়ামাত্র অবিলম্বে হজ্জ সম্পাদন করা উচিত। বিলম্ব করাও দুরস্ত আছে। পরবর্তী কোন বৎসরে হজ্জ করিয়া থাকিলে তো মঙ্গল ; কিন্তু বিলম্ব করিতে করিতে হজ্জ করিবার পূর্বেই মৃত্যু হইলে গুনাহ্গার হইয়া মরিতে হইবে। কেহ ফরয হজ্জ আদায় না করিয়া মরিলে মৃত ওসিয়ত করুক বা না করুক তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করত হজ্জ করাইয়া লওয়া তাহার উত্তরাধিকারিগণের কর্তব্য। কারণ ইহা মৃত ব্যক্তির ঋণস্বরূপ। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "যে শহরের অধিবাসী হজ্জের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না

করে, আমার ইচ্ছা হয় যে তাহাদের নিকট হইতে জিযিয়া আদায় করিবার জন্য আমার অধীনস্ত শাসনকর্তাদিগকে আদেশ দেই।" (নিজেদের জানমাল রক্ষার্থে অমুসলমান প্রজাবৃন্দ মুসলিম রাষ্ট্রকে যে কর প্রদান করে তাহাকে জিযিয়া বলে)।

হজ্জের অবশ্য করণীয় কার্যাবলী ঃ হজ্জের অবশ্য করণীয় কার্য পাঁচটি ; যথা–(১) ইহ্‌রাম বাঁধা, (২) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা, (৩) সাঈ অর্থাৎ সাফা হইতে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত নির্ধারিত নিয়মে দৌড়ান, (৪) আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া এবং (৫) অপর এক রেওয়ায়েত মতে মস্তক মুণ্ডন করা। (হানাফী মতে মস্তক মুণ্ডন অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে)। হজ্জের ওয়াজিব কার্য ছয়টি। তন্মধ্যে যে কোন একটি ত্যাগ করিলে হজ্জ বিনষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ একটি ছাগ কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। ওয়াজিবগুলি এই–(১) মীকাত অর্থাৎ নির্ধারিত স্থানে ইহরাম বাঁধা ; ইহরাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করিলে ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ একটি ছাগল কুরবানী করিতে হইবে। (২) মিনায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা। (৩) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। (৪) মুযদালফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা। (৫) এইরূপে মিনায় অবস্থান করা, (৬) বিদায়কালে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা। কাহারও মতে শেষোক্ত চারিটি কার্য পরিত্যাগ করিলে ছাগল কুরবানী ওয়াজিব না হইয়া সুন্নাত হইবে।

হজ্জ করিবার প্রণালী ঃ তিন প্রণালীতে হজ্জ করা যায় ; যথা– (১) ইফরাদ (২) কিরান ও (৩) তামাত্তো।

ইফরাদ হজ্জ ঃ ইহা সর্বোৎকৃষ্ট হজ্জ। ইহাতে প্রথমে শুধু হজ্জ করিতে হয়। হজ্জ সম্পন্ন করার পর কা'বা শরীফের বাহিরে যাইয়া ওমরাহ করিবার জন্য ইহরাম বাঁধিতে হয় এবং ওমরাহ্ সমাধা করিতে হয়। জি'রানায় ওমরাহের ইহ্‌রাম বাঁধা তান্‌ঈমে বাঁধা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আবার তানঈমে বাঁধা হুদাইবিয়াতে বাঁধা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; এই তিন স্থান হইতে ওমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধা সুন্নত।

কিরান হজ্জ ঃ হজ্জ ও ওমরাহের ইহরাম একসঙ্গে মিলাইয়া বাঁধিলে ইহাকে কিরান হজ্জ বলে। কিরানের নিয়ত এইরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَّ عُمْرَةٍ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমি হজ্জ ও ওমরাহের জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি।" ইহাতে উভয় কার্যের ইহরামই একত্রে হওয়া যায়। এইরূপ নিয়ত করিয়া হজ্জের আবশ্যক কর্মসমূহ সম্পন্ন করিলে তৎসঙ্গে ওমরাহও সম্পন্ন হইয়া যাইবে, যেমন যথারীতি গোসল করিলে ওযূও সম্পন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরাহের নিয়ত এক সঙ্গে করত কিরান হজ্জ সমাধা করিবে তাহার প্রতি একটি ছাগল কুরবানী

করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মক্কা শরীফের অধিবাসিগণের উপর ওয়াজিব হইবে না। কারণ, দূরবর্তী মীকাতে ইহরাম বাঁধা তাঁহাদের উপর ওয়াজিব নহে, মক্কা শরীফও তাঁহাদের ইহরাম বাঁধার স্থান। কিরান হজ্জের অভিলাষী ব্যক্তি আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বে কা'বা শরীফ তওয়াফ ও সাঈ করিলে তৎসমুদয় কার্য হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের মধ্যেই গণ্য হইবে। কিন্তু আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর পুনরায় তওয়াফ করা আবশ্যক। কারণ, তওয়াফ আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর করিতে হয়।

তামাত্তো হজ্জ ঃ ইহার নিয়ম এই যে, প্রথমে ওমরাহের নিয়তে মীকাতে ইহরাম বাঁধিয়া মক্কা শরীফে গমনপূর্বক তওয়াফ প্রভৃতি সম্পন্ন করত ইহরাম ভঙ্গ করিবে। তৎপর হজ্জের সময়ে মক্কা শরীফে ইহ্রাম বাঁধিয়া যথানিয়মে হজ্জ সমাধা করিবে। তামাত্তো হজ্জকারীর উপর একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। কুরবানী করিতে অক্ষম হইলে ঈদুল আযহার পূর্বে উপর্যুপরি অথবা পৃথক পৃথকভাবে তিনটি রোযা করিবে এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আরও সাতটি রোযা করিবে। কিরান হজ্জকারীও কুরবানী করিতে অক্ষম হইলে এই নিয়মে দশটি রোযা করিবে। তামাত্তো হজ্জকারী যদি শাওয়াল, যিলকদ বা যিলহজ্জের প্রথম দশ তারিখের মধ্যে কেবল ওমরাহের নিয়তে ইহরাম বাঁধে কিংবা অন্য কোন প্রকারে হজ্জের মর্যাদা লাঘব করে ও হজ্জের ইহরাম নিজের নির্দিষ্ট মীকাতে না বাঁধিয়া থাকে, তবেই তাহার প্রতি কুরবানী ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মক্কা শরীফের অধিবাসী বা মুসাফির হজ্জের সময় মীকাতে বা ইহার সমদূরবর্তী স্থানে গমন করত ইহরাম বাঁধিয়া আসিলে তাঁহার উপর ছাগ-কুরবানী ওয়াজিব হইবে না।

হজ্জের সময় হারাম কার্যসমূহ ও উহার কাফ্ফারা ঃ হজ্জের সময় ছয়টি কার্য হারাম ; যথা– (১) সেলাই করা পোশাকী বস্ত্র পরিধান করা। কারণ, ইহারামের অবস্থায় পিরহান, ইযার ও পাগড়ী পরিধান করা নিষেধ। বরং সেলাইবিহীন তহবন্দ, চাদর ও পাদুকা ব্যবহার করিতে হইবে। পাদুকা না থাকিলে নগ্নপদে থাকাও দুরস্ত আছে। তহবন্দ না পাইলে ইযারও পরিধান করা যাইতে পারে। ইহরামের অবস্থায় সপ্ত অঙ্গ আবৃত রাখা আবশ্যক। কিন্তু মাথা খোলা রাখিতে হইবে। স্ত্রীলোক আপন অভ্যাসমত কাপড় পরিধান করিবে; কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখিতে হইবে। উটের পিঠের হাওদায় বা চাঁদোয়ার মধ্যে থাকা দুরস্ত আছে। (২) সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা। সুগন্ধি দ্রব্য এবং সেলাই করা পোশাকী বস্ত্র ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করিলে ইহার কাফ্ফারাস্বরূপ একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। (৩) চুল নখ কর্তন করা। ইহরাম অবস্থায় চুল-নখ কাটিলে একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব। হাম্মামে গোসল করা, দূষিত রক্ত বাহির করা এবং সিঙ্গা লাগাইবার অনুমতি আছে। চুল উঠিয়া না যায়, এরূপভাবে চিরুনী করা দুরস্ত আছে। (৪) স্ত্রী-সহবাস করা। সহবাস করিলে

ইহার কাফ্ফারাস্বরূপ একটি উট বা একটি গরু কিংবা সাতটি ছাগ কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জ নষ্ট হইয়া যাইবে ও পুনরায় হজ্জ করিয়া ইহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হইবে। প্রথম ইহরাম ভঙ্গের পর সহবাস করিলে একটি উট কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জ নষ্ট হইবে না। (৫) ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন, চুম্বন, রসালাপ প্রভৃতি করাও নাজায়েয। এরূপ কার্যে মযি বা মণি নির্গত হইয়া অপবিত্র হইলে একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করাও দুরস্ত নহে। করিলে এই বিবাহ শুদ্ধ হইবে না। এইজন্য ইহাতে ছাগ ইত্যাদি কুরবানী করাও ওয়াজিব নহে। (৬) ইহরাম অবস্থায় শিকার করাও দুরুস্ত নহে। কিন্তু সামুদ্রিক শিকার দুরস্ত আছে। স্থলজন্তু শিকার করিলে, উট, গরু ও ছাগল, এই তিন প্রকারের যে জন্তুর সহিত শিকার করা জন্তুর মিল আছে তাহা কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে।

হজ্জ করিবার নিয়ম

হজ্জের কর্তব্য-কার্যসমূহ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জানিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুন্নত তরীকা অনুযায়ী ইবাদতের ফরয, সুন্নত ও আদব-কায়দা পরস্পর জড়িতভাবে জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, অভ্যাস দ্বারা যে ব্যক্তি ইবাদত কার্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে তাহার নিকট সম্পাদনের হিসাবে সমস্ত ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব একরূপই হইয়া দাঁড়ায় এবং সুন্নত ও নফল কার্য দ্বারাই লোকে আল্লাহ্র মহব্বতের উন্নত মর্যাদা লাভে সমর্থ হয় ; যেমন রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন, "ফরয কার্য সম্পন্ন করিয়া বান্দা আমার অতি নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু আমার প্রিয় বান্দাগণ কেবল আমার নৈকট্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং সুন্নত ও নফল কার্য সম্পন্ন করিয়া তাহারা এমন মরতবায় উপনীত হয় যে, তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ আমি হইয়া যাই। তখন তাহারা আমার মাধ্যমেই শ্রবণ করে, আমার মাধ্যমেই দর্শন করে, আমার মাধ্যমেই গ্রহণ করে, আমার মাধ্যমেই কথা বলে।" অতএব ইবাদতের সুন্নত ও নফলসমূহও প্রতিপালন করা আবশ্যক। প্রত্যেক ইবাদতেরই শরীয়ত নির্দেশিত রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

সফরের সামান ও পথে পালনীয় নিয়ম ঃ হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইবার পূর্বে তওবা করিয়া লইবে। কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে ইহা পূরণ করিয়া দিবে। ঋণ থাকিলে পরিশোধ করিবে। নিজ পরিবারে স্ত্রী-পুত্রাদি যে সকল পোষ্য আছে তাহাদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অর্থ দিয়া দিবে। অসিয়তনামা

লিখিবে। হালাল মাল হইতে পাথেয় লইবে। সন্দেহজনক মাল লইবে না। কারণ, সন্দেহজনক মাল দ্বারা হজ্জ করিলে হজ্জ কবূল না হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই পরিমাণ মাল সঙ্গে লইবে যাহাতে পথে ফকির-মিসকিনদিগকে কিছু কিছু দান করিতে পার। গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার পূর্বে পথের শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে কিছু দান-খয়রাত করিবে। বাহনের জন্য সবল দ্রুতগামী পশু ভাড়া করিবে। যাবতীয় মালপত্র বাহনের পশুর মালিককে দেখাইয়া ভাড়া ঠিক করিবে যেন সে পরে অসন্তুষ্ট না হয়। অভিজ্ঞ নেককার সঙ্গী খুঁজিয়া লইবে যেন ধর্মকার্যে ও রাস্তার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানে সহায়তা করিতে পারেন। যাত্রাকালে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং স্বীয় মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট দু'আ চাহিবে। তাহাদের জন্যও এইরূপ দু'আ করিবে–

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ ـ

অর্থাৎ "তোমার ধর্ম, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও তোমার কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিতেছি।" ইহার উত্তরে হজ্জযাত্রীর জন্য তাহারা এইরূপ দু'আ করিবে।

فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَ كَنَفِهٖ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَ جَنَّبَكَ الرَّدٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্, তোমাকে স্বীয় হিফাযত ও করুণায় রাখুন। পরহিযগারীকে আল্লাহ্ তোমার পথের সম্বল করুন। তিনি তোমাকে যাবতীয় ক্ষতি হইতে দূরে রাখুন, তোমার গুনাহ্ মাফ করুন এবং তুমি যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন, একমাত্র মঙ্গলের দিকেই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।"

গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সময় দুই রাকআত নফর নামায পড়িবে–সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস নামায শেষে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ صَاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِىْ الاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ احْفَظْنَا وَاِيَّاهُمْ مِّنْ كُلِّ اٰفَةٍ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, এই সফরে তুমিই আমার সাথী এবং আমার পরিবারবর্গ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পত্তিতে তুমিই প্রতিনিধি। আমাদিগকে ও তাহাদিগকে সকল বিপদাপদ হইতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ্ এই সফরে আমরা তোমার নিকট নেকী, পরহিযগারী ও তোমার পছন্দনীয় আমল প্রার্থনা করি।" তৎপর গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া এই দু'আ পড়িবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ بِكَ اِنْتَشَرْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ وَاِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِىْ التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَجِّهْنِىْ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিলাম। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত গুনাহ্ হইতে বিরত থাকার ও নেক কার্য করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। হে আল্লাহ্ তোমার নামে বাহির হইলাম এবং তোমার উপরই নির্ভর করিলাম, তোমাকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করিলাম এবং তোমার দিকেই মুখ করিলাম। হে আল্লাহ্ পরহিযগারীকে আমার পথের সম্বল করিয়া দাও, আমার গুনাহ মাফ কর এবং আমি যে দিকেই মুখ ফিরাই একমাত্র মঙ্গলের দিকেই আমার মুখ ফিরাইয়া দাও।"

যানবাহনের উপর আরোহণকালে এই দো'আ পড়িবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرْ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র সহিত আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি ইহাকে (অর্থাৎ যানবাহনকে) আমাদের বশীভূত করিয়াছেন এবং আমরা ইহার আহার প্রদানকারী নহি। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" সফরকালে সমস্ত রাস্তায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকিবে এবং উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, সর্বোচ্চ মর্যাদা একমাত্র তোমারই এবং সর্বাবস্থায় তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।" রাস্তায় কোন প্রকার ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে পূর্ণ আয়াতুল কুরসী, এই আয়াত–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَ اُولُوْا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ ـ

এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িবে।

ইহরাম বাঁধা ও মক্কাশরীফে প্রবেশের নিয়ম

মীকাতে অর্থাৎ ইহরাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া হজ্জযাত্রিগণ ইহরাম বাঁধিবে। ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে গোসল করিবে এবং শুক্রবারের ন্যায় চুল, নখ ইত্যাদি কাটিবে। সেলাই করা পোশাক খুলিয়া রাখিয়া সাদা চাদর ও তহবন্দ পরিধান করিবে। আর ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধ দ্রব্য লাগাইয়া লইবে এবং রওয়ানা হইবার সময় উটকে দাঁড় করাইয়া মক্কাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া হজ্জের নিয়ত করিবে ও মনে-মুখে বলিবে–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

অর্থাৎ "আমি উপস্থিত হইয়াছি, হে আল্লাহ্ আমি উপস্থিত হইয়াছি। তোমার কোনই শরীক নাই। আমি তোমারই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত তোমারই এবং সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র তোমারই ; তোমার কোনই শরীক নাই।" যখনই কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবে বা নিম্ন স্থানে অবতরণ করিবে অথবা বহু সংখ্যক হাজীর সহিত একত্র হইবে তখনই এই দু'আ উচ্চস্বরে পড়িবে।

কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হইলে গোসল করিবে। হজ্জের মধ্যে নয় স্থানে গোসল করা সুন্নত ; যথা–(১) ইহরাম বাঁধার সময়, (২) মক্কা শরীফে প্রবেশের সময়, (৩) কা'বাগৃহ তওয়াফ করিবার পূর্বে (৪) আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে, (৫) 'মুযদালাফায়' অবস্থানকালে এবং (৬, ৭, ৮) তিনবার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনবার গোসল এবং (৯) বিদায়কালীন তওয়াফের পূর্বে। কিন্তু জমরা-আকাবা নামক স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য গোসল করিতে হয় না। মোটকথা, গোসল করিয়া মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবে এবং শহরে প্রবেশ করত কা'বাগৃহের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ামাত্র এই দু'আ পড়িবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا للّٰه وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ دَارُكَ دَارُ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ـ اَللّٰهُمَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهٗ وَشَرَّفْتَه

وَ كَرَّمْتَهٗ اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَّزِدْهُ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّزِدْهُ مَهَابَةً وَّ زِدْ مَنْ حَجَّهٗ بِرًّا وَّ كَرَامَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَدْخِلْنِيْ جَنَّتَكَ وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্, তুমিই শান্তি এবং তোমা হইতেই সমস্ত শান্তি ও তোমার গৃহই শান্তিময় গৃহ। তুমি মঙ্গলময়, হে প্রতাপশালী ও মহান। হে আল্লাহ্, ইহা তোমার গৃহ। ইহাকে তুমি মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান দান করিয়াছ। হে আল্লাহ্, ইহার মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান আরও বৃদ্ধি কর যে ব্যক্তি এই গৃহের হজ্জ করিয়াছে তাহার পুণ্য ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ্, আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দাও, আমাকে তোমার বেহেশতে প্রবেশ করাও এবং আমাকে বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রদান কর।" তৎপর বনি শাইবা নামক দ্বার দিয়া বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করিবে এবং হাজরুল আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হইয়া ইহাকে চুম্বন করিবে। লোকের ভীড়ের দরুন চুম্বন অসম্ভব হইলে ইহার দিকে হস্ত প্রসারণপূর্বক বলিবে–

اَللّٰهُمَّ اَمَانَتِيْ اَدَّيْتُهَا وَمِيْثَاقِيْ تَاهَدْتُهٗ اَشْهَدْلِيْ بِالْمُوَافَاتِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার আমানত আমি আদায় করিলাম এবং আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিলাম। আমার জন্য সাক্ষী থাক যে, আমি সম্পূর্ণ করিলাম।" ইহার পর কা'বাগৃহ তওয়াফ করিবে।

তওয়াফের নিয়ম ঃ নামাযের ন্যায় কাবাগৃহ তওয়াফকালেও দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া এবং সতর ঢাকিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। তওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা দুরস্ত আছে। চাদর গায়ে দিবার সময় ডান বাহু সম্পূর্ণ বাহিরে রাখিয়া চাদরটি বিস্তারিতভাবে ডান বগলের নিম্ন হইতে উঠাইয়া পিঠ ও বুক ঢাকিয়া চাদরের উভয় পার্শ্ব বাম স্কন্ধের উপর রাখিবে। এইরূপে চাদর গায়ে দেওয়াকে 'যতেবাগ' বলে। কাবাগৃহকে বামে রাখিয়া হাজরে আস্ওয়াদের নিকট হইতে তওয়াফ শুরু করিবে। তওয়াফকালে কা'বাগৃহ হইতে কমপক্ষে তিন ধাপ দূরে থাকিয়া চলিতে হইবে। কারণ, তদপেক্ষা নিকট দিয়া দৌড়াইলে কা'বাগৃহের গিলাফ বা পর্দার উপর পা পড়িতে পারে। যতদূর পর্যন্ত গিলাফ বা পর্দা বিস্তৃত থাকে ততটুকু স্থানকে কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। তওয়াফ আরম্ভ করিবার সময় এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا وَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, এই তওয়াফ তোমার প্রতি ঈমানের প্রতীক-স্বরূপ এবং তোমার কিতাবের সত্যতার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন ও তোমার প্রতি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যে।" আর কাবাগৃহের দরজায় পৌঁছিলে এই দু'আ পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ هٰذَا الْحَرَامُ حَرَمُكَ وَ هٰذَا الاَمْنُ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مُقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, ইহা তোমার গৃহ। এই হরম তোমার হরম। এই নিরাপদ স্থান তোমার আশ্রয় ; ইহা দোযখের আগুন হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান।" তৎপর রুক্‌নে ইয়ামানীতে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, অবশ্যই আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি– সন্দেহ, শিরক, অবিশ্বাস, মুনাফেকী, শত্রুতা, কুস্বভাব এবং পরিবার, ধন ও সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি হইতে।" অতঃপর কা'বাগৃহের ছাদের পানি পড়িবার নালী বা পাইপের নিম্নে উপস্থিত হইলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنِىْ بِكَاْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لاَّ اَظْمَاءُ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না সেদিন তোমার আরশের ছায়ার নিচে আমাকে স্থান দিও। হে আল্লাহ্, আমাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানপত্র হইতে পানীয় পান করাইও যেন তৎপর কখনও পিপাসার্ত না হই।" আরও অগ্রসর হইয়া রুক্‌নে শামীতে পৌঁছিলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْيًا مَشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّ تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, এই হজ্জ কবূল কর, এই পরিশ্রম সফল কর। আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার এই তেজারত চিরস্থায়ী কর। হে প্রতাপান্বিত ও ক্ষমাশীল, ক্ষমা কর, দয়া কর। আর (আমার পাপ সম্বন্ধে) তুমি যাহা কিছু জান, তাহা ছাড়িয়া দাও (তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করিও না)। অবশ্যই তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক মহৎ।" তৎপর রুক্‌নে ইয়ামানীতে পৌছিয়া বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, আমি কুফর হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং অভাব, কবরের আযাব ও জীবন-মরণের বিপদাপদ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর ইহ-পরকালের অপমান হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" এই রুক্‌ন হইতে হজরে আস্‌ওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِى الْاٰخِرَةِ وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রভূ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল আমাদিগকে দান কর। আর তোমার অনুগ্রহে কবরের আযাব ও দোযখের আযান হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

হাজরে আসওয়াদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোক্ত নিয়মে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার হাজরে আসওয়াদের নিকট উপস্থিত হইলে একবার তওয়াফ করা হইল। এই প্রকারে সাতবার তওয়াফ করিবে এবং প্রত্যেক বার তওয়াফকালে উল্লিখিত দু'আগুলি যথাস্থানে পড়িবে। প্রত্যেক প্রদক্ষিণকে 'শাওত' বলে। প্রথম তিন শাওত দ্রুতগতিতে খুবই উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতে হয়। কাবাগৃহের নিকট দিয়া লোকের ভিড় হইলে কিছু দূর দিয়া তওয়াফ করিবে যেন দ্রুতগতিতে চলিতে পার। শেষের চারি শাওতে আস্তে আস্তে চলিবে। প্রত্যেক তওয়াফে হাজরে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিবে এবং

রুক্‌নে ইয়ামানীর উপর হাত ফিরাইবে। লোকের ভিড়ের জন্য স্পর্শ করিতে না পারিলে হাতে ইশারা করিবে। এইরূপে সাতবার তওয়াফ শেষ হইলে কা'বাগৃহের দ্বার ও হাজরে আস্‌ওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইবে। পেট, বুক ও ডান গণ্ডদেশ কা'বাগৃহের দেওয়ালের সহিত মিলাইয়া দুই হাতের তালু খোলাভাবে দেওয়ালে স্থাপনপূর্বক তন্মধ্যে মাথা রাখিবে অথবা কা'বা শরীফের চৌকাঠের উপর রাখিবে। এই স্থানটিকে মুল্‌তাযম বলে। এই স্থানে দু'আ কবূল হয়। এই স্থলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتَ الْعَتِيْقِ اِعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَاَعِذْنِىْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَّقَنِعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ فِيْمَا اٰتَيْتَنِىْ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, হে কা'বাগৃহের প্রভু, আমার কাঁধকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর এবং সকল মন্দ হইতে আমাকে আশ্রয় দাও। আর আমাকে তুমি যাহা কিছু দান করিয়াছ তাহাতে বরকত দাও।" এই সময় অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়িবে, কৃত পাপের ক্ষমা চাহিবে এবং মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করিবে। তৎপর 'মাকামে ইবরাহীম'-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই রাকআত নামায পড়িবে। ইহা 'তওয়াফের দুই রাকআত' নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্যন্ত করিলে তওয়াফ শেষ হইল। উক্ত দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়িবে। নামাযের পর মুনাজাত করিবে। সাতবার প্রদক্ষিণ এবং এই দুই রাকআত নামায সম্পন্ন করত হাজরে আস্‌ওয়াদের নিকট যাইয়া উহাকে চুম্বন করিয়া তাওয়াফকার্য সমাপ্ত করিবে। অতঃপর সাঈ অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ান কার্যে লিপ্ত হইবে।

সাঈর নিয়ম ঃ প্রথম সাফা পাহাড়ে যাইবে এবং এত উপরে আরোহণ করিবে যেন কা'বা শরীফ দেখা যায়। তথায় কা'বাগৃহের দিকে মুখ করিয়া এই দু'আ পড়িবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَصَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ جُنْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্, ব্যতীত কেহই উপাসনার যোগ্য নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। সমস্ত বিশ্বের আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই এবং তাঁহার জন্যই সকল

প্রশংসা। তিনিই জীবিত করেন ও প্রাণসংহার করেন ; অথচ তিনি চিরজীবী, কখনই মরিবেন না। তাঁহারই হস্তে সর্ববিধ মঙ্গল এবং তিনি সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি একক, তাঁহার অঙ্গীকার সত্য। তিনি তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করেন এবং তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে পরাক্রমশালী করেন। তিনি একাকী বহু বিরোধী সেনাদলকে ধ্বংস করিয়াছেন। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। বিশ্বাসিগণ অকপটতার সহিত তাঁহার বন্দেগী করিয়া থাকে যদিও কাফিরগণ ইহা পছন্দ করে না।" এতদ্ব্যতীত মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দু'আ করিবে। তৎপর সাফা পাহাড় হইতে অবতরণ করত মারওয়ার দিকে অগ্রসর হইবে। প্রথমে আস্তে আস্তে চলিবে এবং এই দু'আ পড়িবে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّ تَعْلَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا

اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, ক্ষমা কর, দয়া কর এবং আমার যাহাকিছু পাপ তুমি জান তাহা ছাড়িয়া দাও। অবশ্যই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা মহান। হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রভু, ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মঙ্গল আমাদিগকে দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা কর।" এই দু'আ পড়িতে পড়িতে মসজিদের পার্শ্বে সবুজ খুঁটি পর্যন্ত ধীরে ধীরে চলিবে। ইহা হইতে ছয় গজ সম্মুখের দিকে অনুরূপ আর একটি খুঁটি আছে। উভয় খুঁটির মধ্যবর্তী ছয় গজ ভূমি খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া অতিক্রম করিবে। দ্বিতীয় খুঁটিটি অতিক্রম করত আস্তে আস্তে চলিয়া মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত যাইবে। মারওয়া পাহাড়ে আরোহণপূর্বক সাফা পাহাড়ের দিকে মুখ করিয়া সাফা পাহাড়ে যে দু'আ পড়া হইয়াছে, এখানেও তাহাই পড়িবে। এই নিয়মে সাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত গেলে একবার দৌড় হইল। আবার মারওয়া হইতে সাফা পৌঁছিলে আর একবার দৌড় হইল। এইরূপে সাতবার দৌড়াইবে। এই পর্যন্ত কার্যগুলি সমাপ্ত হইলে তওয়াফে কুদূম ও তওয়াফে সাঈ করিবে। হজ্জের মধ্যে এই তওয়াফ সুন্নত। হজ্জের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ নির্ধারিত তওয়াফ আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর করিতে হয়। সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ের সময় ওযূ-গোসল দ্বারা শরীর পবিত্র করিয়া লওয়া ওয়াজিব। এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা সাঈর জন্য যথেষ্ট। কারণ আরাফার অবস্থানে পর সাঈ করিতে হইবে বলিয়া কোন শর্ত নাই। কিন্তু তওয়াফের পরে হওয়া আবশ্যক, যদিও এই তওয়াফ সুন্নত হইয়া থাকে।

আরাফার ময়দানে অবস্থানের নিয়ম ঃ আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্ব তারিখে হজ্জ যাত্রী কাফেলা আরাফার ময়দানে পৌঁছিলে তওয়াফে কুদূম (প্রাথমিক তওয়াফ) করিবে না ; আরাফার দিনের পূর্বে পৌঁছলে তওয়াফে কুদূম করিবে। যিলহজ্জের ৮ই তারিখে মক্কা শরীফ হইতে বাহির হইয়া মিনাবাজারে রাত্রিযাপন করিবে ; পরদিন আরাফার ময়দানে পৌঁছিবে। ৯ই যিলহজ্জ তারিখ দ্বিপ্রহর হইতে পরদিবস সুব্হে সাদিক হওয়ার পর কেহ্ আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময়; সুতরাং ১০ই যিলহজ্ব সুবহে সাদিক হওয়ার পর কেহ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হইলে তাহার হজ্জ হইবে না। আরাফার দিন গোসল করিবে এবং যোহরের নামায আসরের নামাযের সহিত পড়িবে। নামাযের পর দু'আয় লিপ্ত থাকিবে। শারীরিক শক্তি বজায় রাখিয়া। নিজকে অধিক দু'আ ও প্রার্থনা কার্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য আরাফার দিনে হাজীদের রোযা রাখা উচিত নহে। এই শুভ ও পুণ্যময় দিবসে আল্লাহ্র সহিত মন ও প্রাণের অটল ও একাগ্র যোগাযোগ রক্ষা করাই হজ্জের আসল উদ্দেশ্য এবং ইহা দু'আ কবূল হওয়ার দিবস। এই দিবসের সর্বোত্তম যিকির হইল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এই দিন দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট অনুনয়-বিনয় বিলাপ ইস্তেগফার, তওবা এবং অতীত পাপের ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া অতিবাহিত করা উচিত। আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে পাঠ করিবার অনেক দু'আ আছে। এই সমস্ত লিখিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এই দু'আসমূহ 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুম' কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তথা হইতে মুখস্থ করিয়া লওয়া উচিত। যে দু'আ মুখস্থ করিবে তাহাই সেই সময় পড়িবে ; কারণ হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই সেই সময় মঙ্গলজনক। মুখস্থ না থাকিলে দেখিয়া পড়িবে। অথবা অন্যের পাঠ শুনিয়া 'আমীন' বলিবে। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দানের সীমা ছাড়িয়া যাইবে না।

হজ্জের অবশিষ্ট কার্যের নিয়ম ঃ আরাফার ময়দানে অবস্থানে পর মুযদালাফায় গমন করিবে। সেখানে যাইয়া গোসল করিবে; কারণ মুযদালাফা হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করত ইশার নামাযের সহিত মিলাইয়া এক আযান ও ইকামতে উভয় নামায আদায় করিবে। সম্ভব হইলে এই রাত্রি মুযদালাফায় জাগরিত থাকিয়া ইবাদতে কাটাইবে। কারণ ইহা অতিশয় ফযীলতের রাত্রি ; এই রাত্রে মুযদালাফায় অবস্থান করাই ইবাদতের মধ্যে গণ্য। মুযদালাফায় অবস্থান না করিলে একটি ছাগল কুরবানী করিতে হয়। মিনায় নিক্ষেপের জন্য এখান হইতে সত্তরটি প্রস্তরখণ্ড সঙ্গে লইবে। কারণ, এখানে প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। রাত্রির শেষভাগে মিনাবাজারে যাওয়ার আয়োজন করিবে। ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়িয়া রওয়ানা হইবে। মুযদালাফার শেষপ্রান্তে 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে পৌঁছিয়া রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং দু'আ

করিতে থাকিবে। তৎপর তথা হইতে 'ওয়াদিউল মাহ্শার' নামক স্থানে পৌঁছিবে। এই স্থানটি অতি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় বাহন পশুকে খুব দ্রুত হাঁকাইয়া নিবে এবং পদাতিকগণও অতি দ্রুতগতিতে চলিবে। কারণ, এই ময়দান অতি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করা সুন্নত। ঈদের দিন প্রাতঃকালে কখনও আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর পূর্ণ তকবীর বলিবে, কখনও 'লাব্বাইকা' বলিবে। এইরূপ 'জামারাত' নামক উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবে (এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে)। তৎপর ইহা হইতে অবতরণ করত 'জামারাতুল আকাবা' নামক উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবে (এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে) তথা হইতে কা'বাগৃহের দিকে মুখ ফিরাইলে ডান হাতের দিকে রাস্তার অপর পারে এই স্থানটি অবস্থিত। সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে উঠিলে সাতটি প্রস্তর উক্ত জাম্‌রাতে নিক্ষেপ করিবে। প্রস্তর নিক্ষেপের সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখা উত্তম। এখানে 'লাব্বাইক' না বলিয়া ইহার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবর' বলিবে। প্রত্যেকটি প্রস্তর নিক্ষেপকালে এই দু'আ পড়িবে-

اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

এই পর্যন্ত কার্য শেষ হইলে 'লাব্বাইকা' ও 'আল্লাহু আকবর' আর বলিতে হইবে না। কিন্তু আয়্যামে তাশরীকের শেষ দিবসের প্রাতঃকাল পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলিবে। ঈদের দিন হইতে চতুর্থ দিবস পর্যন্ত আয়্যামে তাশরীক। তৎপর (মিনাবাজারে) নিজ নিজ মঞ্জিলে প্রত্যাবর্তন করত দু'আ ও প্রার্থনায় লিপ্ত হইবে। কুরবানী করা আবশ্যক হইলে কুরবানী করিবে এবং কুরবানী শর্তগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এ সময়ে মস্তকও মুণ্ডন করিবে। প্রস্তর নিক্ষেপ হইতে মস্তক মুণ্ডন পর্যন্ত কার্য শেষ হইয়া গেলে এক তাহাল্লুল হইয়া গেল। ইহার পর স্ত্রী-সহবাস ও শিকার ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্য সকল কাজ হালাল হইয়া যাইবে।

তওয়াফে রুক্ন ঃ তৎপর মক্কা শরীফে যাইয়া তওয়াফে রুকন করিবে। ঈদের পূর্বরাত্রির অর্ধাংশ অতিবাহিত হইলেই তওয়াফে রুক্নের সময় আরম্ভ হয়। কিন্তু ঈদের দিন করাই উত্তম। তওয়াফ রুক্নের শেষ সময়ের কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই। যত বিলম্বেই এই তওয়াফ করা হউক না কেন, ইহা নষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় তাহল্লুল হাসিল হইবে না এবং স্ত্রী-সহবাস ও শিকার হারাম থাকিয়া যাইবে। পূর্ব বর্ণিত তওয়াফে কুদূমের নিয়মে তওয়াফে রুক্ন শেষ করিলেই হজ্জ সমাপ্ত হইল। তখন হাজীগণের জন্য স্ত্রী-সহবাস এবং শিকারও দুরস্ত হইবে। ইতঃপূর্বে সাঈ করা হইয়া থাকিলে এখন আর করিতে হইবে না। অন্যথায় সাঈয়ে রুক্ন এই তওয়াফের পরে করিবে। প্রস্তর নিক্ষেপ, মস্তক মুণ্ডন এবং কাবা শরীফের

তওয়াফ করিলে হজ্জ পূর্ণ হইল এবং ইহ্‌রামের বন্ধন মুক্ত হইল। ইহরাম মুক্ত হইলেও আয়্যামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ এবং মিনাবাজারে রাত্রিযাপন করিতে হয়। সুতরাং তওয়াফ ও সাঈ সমাধা করিয়া ঈদের দিনেই মিনাবাজারে ফিরিয়া আশা আবশ্যক। মিনায় রাত্রিবাস করিবে। ইহা ওয়াজিব।

ঈদের পরদিন নিক্ষেপের জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোসল করিবে। প্রথমে আরাফার নিকটবর্তী জামরায় যাইয়া কিবলামুখী হইয়া সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে এবং সূরা বাকারার পরিমাণ দীর্ঘ দু'আ করিবে। তৎপর মধ্যবর্তী জামরায় সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে এবং দু'আ করিবে। ইহার পর জামরায়ে আকাবায় সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে এবং সেইদিন মিনাবাজারে রাত্রিবাস করিবে। ১২ই যিলহজ্ব তারিখেও উক্ত নিয়মে একুশটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে। ইচ্ছা করিলে এই পর্যন্ত কার্য শেষ করিয়াই মক্কা শরীফে ফিরিয়া আসিতে পার। কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত তথায় বিলম্ব করিলে সেই রাত্রেও মিনাবাজারে অবস্থান এবং পরবর্তী দিনে একুশটি প্রস্তর নিক্ষেপ করাও ওয়াজিব হইয়া পড়িবে। হজ্জের বর্ণনা এ পর্যন্তই শেষ হইল।

ওমরার বিবরণ ঃ ওমরা করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে গোসল করত হজ্জের সময়ের ন্যায় ইহরামের বস্ত্র পরিধান করিবে এবং মক্কা শরীফ হইতে বাহির হইয়া ওমরার মীকাত অর্থাৎ জি'রানা, তানঈম ও হুদাইবিয়া– এই তিন স্থানের কোন এক স্থানে যাইবে। সে স্থানে ওমরার নিয়ত করিবে এবং لبيك بعمرة বলিবে। তৎপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মসজিদে গিয়া দুই রাকআত নামায পড়িবে এবং মক্কা শরীফে ফিরিয়া আসিবে। ফিরিবার পথে 'লাব্বাইকা' দু'আ পড়িতে থাকিবে। মসজিদে প্রবেশ করত লাব্বাইকা বলা স্থগিত রাখিবে এবং হজ্জের বিবরণে বর্ণিত নিয়মে তওয়াফ ও সাঈ করিবে। অতঃপর মস্তক মুণ্ডন করিবে। এ পর্যন্ত বর্ণিত নিয়মে তওয়াফ ও সাঈ করিবে। অতঃপর মস্তক মুণ্ডন করিবে। এ পর্যন্ত কার্যগুলিই করিলেই ওমরা পূর্ণ হইল। সারা বৎসরই ওমরা করা চলে। মক্কাবাসীগণের যথাসাধ্য ওমরা করা উচিত। অক্ষম হইলে তওয়াফ করা উচিত। ইহাতেও অসমর্থ হইলে কা'বা শরীফ দর্শন করা আবশ্যক।

কা'বা শরীফে প্রবেশ ঃ কা'বা শরীফের দরজায় পৌছিয়া দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে নামায পড়িবে এবং খালি পায়ে খুব বিনয় ও নম্রতার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিবে।

যমযমের পানি পান ঃ যমযমের পানি পেট ভরিয়া পান করিবে। পানের সময় যে নিয়ত করিবে তাহাই পূর্ণ হইবে। যমযমের পানি পানকালে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ سُقْمٍ وَّارْزُقْنِىْ الاِخْلَاصَ وَالْيَقِيْنَ

وَالْعَافَاتِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, এই পানিকে আমার সকল রোগের আরোগ্য করিয়া দাও। এবং (ইহার বরকতে) আমাকে অকপটতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ইহ-পরকালের শান্তি ও মঙ্গল দান কর।"

বিদায়কালীন তওয়াফ ঃ নিজ গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইলে প্রথমে সকল আসবাবপত্র বাঁধিয়া লইবে এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবে। তৎপর বাইতুল্লাহ্ হইতে বিদায় হইবে অর্থাৎ সাতবার তওয়াফ করিবে এবং দুই রাকআত নামায পড়িবে। এই তওয়াফে পূর্ববর্তী তওয়াফের ন্যায় ইযতেবাগ ও তাড়াতাড়ি করা আবশ্যক নহে। অতঃপর 'মুতানাম' নামক স্থানে যাইয়া দু'আ করিবে। অবশেষে কা'বাগৃহের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাতে হাঁটিতে হাঁটিতে হারম শরীফের সীমা অতিক্রম করিবে।

মদীনা শরীফ যিয়ারত ঃ মক্কা শরীফের কার্য শেষ করিয়া মদীনা শরীফ যাইবে, কারণ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি আমার (সমাধি) যিয়ারত করিবে, সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার দর্শন করিল।" তিনি আরও বলেন– "যে ব্যক্তি মদীনা শরীফ আগমন করে এবং আমার (রওযা) যিয়ারত ব্যতীত তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে আল্লাহ্র নিকট তাহার হক সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ আমাকে তাহার শাফাআতকারী করিবেন।" মদীনা শরীফের পথে অধিক সংখ্যায় দরূদ পড়িবে এবং মদীনার প্রাচীরের উপর দৃষ্টি পড়িলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِىْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْعَذَابِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ ইহা তোমার রসূলের হরম। সুতরাং ইহাকে আমার জন্য দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার স্থান এবং সর্বপ্রকার শাস্তি ও মন্দ হিসাব-নিকাশ হইতে নিরাপদে থাকার স্থান কর।" প্রথমে গোসল করত পাকপবিত্র সাদা পোষাক পরিধান করিবে এবং দেহে ও পরিধেয় বস্ত্রে সুগন্ধি লাগাইবে। তৎপর শহরে প্রবেশ করিবে। শহরে প্রবেশ করিয়া সর্বদীনতা ও নম্রতার সহিত অবস্থান করিবে এবং এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমাকে দাখিল কর সত্য দাখিল করা এবং আমাকে বাহির কর সত্য বাহির করা ও তোমার নিকট হইতে আমার জন্য প্রবল সাহায্য পাঠাও।" অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করত মিম্বরের নিচে দুই রাকআত নামায পড়িবে। এই নামায পড়িবার সময় এইরূপে দাঁড়াইবে যেন মিম্বরের স্তম্ভ ডান কাঁধের বরাবর থাকে। কারণ, ইহাই রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁড়াইবার স্থান ছিল। নামাযান্তে রওযা মুবারক যিয়ারত মনোযোগ দিবে এবং সেদিকে মুখ ফিরাইবে। তখন কা'বা শরীফ পিছন দিকে থাকিবে। রওযা শরীফের প্রাচীরের উপর হাত স্পর্শ করিয়া চুম্বন করা সুন্নত নহে ; বরং দূরে থাকিলেই অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। রওযা শরীফের দিকে মুখ করিয়া এই দু'আ পাঠ করিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ ادَمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِكَ وَ اَصْحَابِكَ الطَّاهِرِيْنَ وَ اَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ وَاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَزٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلّٰى عَلَيْكَ كُلَّ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْكَ الْغَافِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্র নবী আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্র প্রিয়তম, আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্র মনোনীত আপনার উপর সালাম। হে আদম সন্তানের একচ্ছত্র নেতা, আপনার উপর সালাম। হে নবীগণের সরদার, শেষ নবী ও বিশ্বপ্রভুর রাসূল, আপনার উপর সালাম ; আপনার সন্তানগণের উপর সালাম ; আপনার পবিত্র সাহাবীগণ এবং বিশ্ব মুসলমানের জননী আপনার পবিত্র পত্নিগণের উপর সালাম। আল্লাহ্ অন্য কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে যাহাকিছু পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন আমাদের পক্ষ হইতে তদপেক্ষা অধিক পুরস্কারে আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করুন এবং যত স্মরণকারী আপনাকে স্মরণ করে ও যত গাফিল লোক আপনাকে ভুলিয়া রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা পরিমাণ রহমত আল্লাহ্ আপনার উপর বর্ষণ করুন।"

অপর কেহ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সালাম পৌঁছাইবার ওসিয়ত করিয়া থাকিলে এইরূপ বলিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانٍ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانٍ -

(فلان শব্দের স্থলে সেই ব্যক্তির নাম বলিবে)। তৎপর সামান্য অগ্রসর হইয়া হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুমার প্রতি এইরূপে সালাম দিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ الْمُعَاوَنَيْنِ لَهٗ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ مَادَامَ حَيًّا وَّالْقَـئِمَيْنِ بَعْدَه فِىْ اُمَّتِه بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ نَتَّبِعَانِ فِىْ ذَالِكَ اثَارَهٗ تَعْمَلَانِ بِسُنَّتِهٖ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ خَيْرَ مَاَزٰى وُزْرَاءَ نَبِيٍّ عَلٰى دِيْنِهٖ -

অর্থাৎ “হে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযীরদ্বয়, তাঁহার জীবিতকালে ধর্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার সাহায্যকারীদ্বয় এবং তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার উম্মতের মধ্যে ধর্ম-কর্মের প্রতিষ্ঠাকারীদ্বয় আপনাদের উপর সালাম ; আপনারা উভয়ে ধর্ম-কর্মে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহার সুন্নত অনুযায়ী আমল করিতেন। সুতরাং আল্লাহ্ আপনাদিগকে যে কোন নবীর ধর্ম-উযীরকে প্রদত্ত পুরস্কার অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। তৎপর তথায় দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য দু'আ করিবে।

ইহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া 'জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গমন করত সাহাবী ও তৎকালীন বুযর্গগণের পবিত্র কবরসমূহ যিয়ারত করিবে।

মদীনা শরীফ হইতে ফিরিবার কালে আবার রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবাকর যিয়ারত করিয়া বিদায় হইবে।

হজ্জের নিগূঢ় তত্ত্ব ঃ হজ্জের কার্যাবলী সম্বন্ধে উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা উহার বাহ্য আবরণমাত্র। ইহাদের প্রত্যেকটির এক একটি রহস্য ও গূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। উপদেশ গ্রহণ ও পরকালের বিষয় স্মরণ করাই উহাদের মূল উদ্দেশ্য। বাস্তব কথা এই আল্লাহ্ মানুষকে এরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে তাহার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করিয়া না দিলে পূর্ণ সৌভাগ্য লাভ করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ইহা দর্শন পরিচ্ছেদে বর্ণিত রহিয়াছে। আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তির অনুসরণই মানুসের ধ্বংসের কারণ। প্রবৃত্তির নির্দেশ অনুসারে চলিলে মানুষের কোন কর্মই শরীয়তানুযায়ী হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ ব্যক্তি প্রবৃত্তিরই

গোলাম, আল্লাহ্‌র বান্দা হইয়া তাঁহার বিধানমতে চলিলেই চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সৌভাগ্য লাভের কোন উপায় নাই। এইজন্য পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর উম্মতের প্রতিই চির কৌমার্য ও সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনের নির্দেশ ছিল। এই কারণেই তখনকার ইবাদতকারীগণ মানুষের সংশ্রব পরিত্যাগ করত পর্বতগুহায় আশ্রয় লইতেন এবং কঠোর সাধনায় সারা জীবন কাটাইয়া দিতেন। লোকে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাদের ধর্মে কি চির কৌমার্য ও সন্ন্যাসব্রত নাই?" তিনি উত্তরে বলিলেন–"উহার পরিবর্তে আমাদের প্রতি জিহাদে ও হজ্জের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেন।" সুতরাং দেখা গেল, আল্লাহ্ এই উম্মতকে সন্ন্যাসব্রতের পরিবর্তে হজ্জের নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। কারণ, ইহাতে কঠোর সাধনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং আত্মা সংশোধনমূলক উপদেশও পাওয়া যায়। কেননা আল্লাহ্ কা'বা শরীফকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, ইহাকে নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন ও রাজপ্রাসাদের সমতুল্য বানাইয়াছেন ; ইহার চতুর্দিকের স্থানকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহার সম্মানার্থে উহার সীমার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার ও কোন বৃক্ষ কর্তন হারাম করিয়াছেন। আরাফার ময়দানকে রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্তী দরবারভূমির ন্যায় নির্ধারণ করত কা'বা শরীফের সামনে রাখিয়াছেন যেন সর্বদিক হইতে বিশ্বের মানুষ আল্লাহ্‌র পবিত্র গৃহে আগমন করিতে পারে। যদিও কোন নির্দিষ্ট স্থানে ও কা'বাগৃহে বাস করারূপ অপবাদ হইতে আল্লাহ্ একেবারে পবিত্র তথাপি মানুষের হৃদয়ে যখন প্রেমাবেগ প্রবল ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠে এবং মিলনের অভিপ্রায় সীমাহীন হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রিয়জনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। এইজন্যই আল্লাহ্ প্রেমে মত্ত মুসলমানগণ নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র পরিবার, সুখের বাসস্থান ও ধনসম্পদ ত্যাগ করত বিপদসঙ্কুল অরণ্য, ভীষণ সমুদ্র অতিক্রমপূর্বক প্রকৃত বান্দার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু ও একমাত্র প্রভু মহান আল্লাহ্‌র দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে।

হজ্জের আদিষ্ট কার্যগুলির মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে দৌড় প্রভৃতি অবশ্য যুক্তির সাহায্যে বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না। বুদ্ধির আওতাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে প্রবৃত্তির কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকে। কেননা, কর্মের ফলকে হিতকর বলিয়া বিবেচনা করিলেই মানুষ উহা করিতে আগ্রহান্বিত হয় এবং কর্মটি হিতকর হওয়াই তাহার কার্য সম্পাদনের কারণ হইয়া পড়ে। যেমন সে জানে, যাকাত প্রদানের মধ্যে অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহায়তা ও সৌজন্য প্রদর্শন আর নামাযে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দীনতা-হীনতা প্রকাশ রহিয়াছে এবং রোযা দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমিত ও শয়তানের শক্তি খর্ব হয়। বুদ্ধির নির্দেশানুসারে মানুষ এই সকল কার্য সম্পন্ন করে বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু লাভ-লোকসানের প্রতি একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রভুর

আদেশ পাওয়ামাত্রই কাজ সম্পন্ন করাকেই প্রকৃত বন্দেগী বলে। কঙ্কর নিক্ষেপ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে দৌড় এই শ্রেণীর কার্য। কেননা, শুধু প্রভুর আদেশ মান্য করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এরূপ কার্য কেহই করিতে পারে না। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন–

لبيك لحجة حقا تعبد او رقا -

অর্থাৎ "হজ্জকে প্রকৃত সত্য, যথার্থ বন্দেগী ও সত্যিকারের দাসত্ব জ্ঞান করিয়া ইহার জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইলাম।" হজ্জকে তিনি সত্যিকারের দাসত্ব ও বন্দেগী আখ্যা দিয়েছেন। হজ্জের মধ্যে ঐ প্রকার কার্যগুলির কোন যুক্তি নির্ণয় করিতে না পারিয়া কতক লোক হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। এই হয়রানি তাহাদের অজ্ঞতার কারণেই ঘটিয়াছে। কেননা ইহার প্রকৃত অবস্থা তাহারা অবগত নহে। বিনা উদ্দেশ্যেই যে হজ্জের উদ্দেশ্য, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কারণে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্বের জন্যই হজ্জ। প্রবৃত্তি বা বুদ্ধিকে ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা করিতে পারিলে সকল কার্যেই মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া একেবারে অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করাতেই মানুষের পরম সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। তখন সমস্ত কার্যে তাহার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁহার আদেশের দিকেই থাকিবে।

হজ্জের উপদেশ ঃ হজ্জ-যাত্রা এক হিসেবে পরলোক যাত্রার সমতুল্য। কারণ, হজ্জ-যাত্রা কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে হয় এবং পরলোক যাত্রা কা'বা শরীফের অধিপতির উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। অতএব, হজ্জ যাত্রার প্রত্যেক ঘটনায় পরলোকে যাত্রার অবস্থা স্মরণ করা উচিত। এই যাত্রাকালে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ মৃত্যুকালে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সমতুল্য। হজ্জ-যাত্রার পূর্বে মানুষ যেমন পার্থিব সকল বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত হইয়া রওয়ানা হয় তদ্রূপ শেষ বয়সে পরকাল-যাত্রার পূর্বে দুনিয়ার সকল চিন্তা হইতেও তাহার মনকে মুক্ত করা আবশ্যক। অন্যথায় পরকাল-যাত্রা নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক হইবে। হজ্জে যাওয়ার সময় যেরূপ যথেষ্ট পরিমাণে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় এবং যাহাতে উহা বিনষ্ট ও লুণ্ঠিত হইয়া নির্জন মরুপ্রান্তরে সম্বলহীন হইয়া পড়িতে না হয় তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তদ্রূপ পরকালে ভয়ঙ্কর বিপদ সমাকীর্ণ হাশরের মাঠ অতিক্রম করার জন্য দুনিয়া হইতে পরলোকে মঙ্গলজনক সওয়াবও প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে লওয়া একান্ত আবশ্যক এবং সে সওয়াবকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত

পাহারা দেওয়া উচিত। হজ্জে যাত্রাকালে হাজীগণ যাহা সহজে বিনষ্ট হয় এমন দ্রব্য সঙ্গে লয় না। কারণ, তাহারা জানে যে, উহা অস্থায়ী হওয়ার দরুন পাথেয়ের উপযোগী নহে। এইরূপ যে ইবাদত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে এবং যে ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ, উহাও পরলোক-যাত্রার সম্বল হইতে পারে না। হজ্জ-যাত্রাকালে যানবাহনে আরোহণপূর্বক পরকালের পথে জানাযায় আরোহণের কথা স্মরণ করিবে। কারণ, ইহা অবশ্যই জানা আছে যে, হজ্জের-পথে বাহনের ন্যায় কবরে যাইবার পথেও বাহন পাওয়া যাইবে। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, হজ্জের সওয়ারী হইতে অবতরেণর সময় মিলিবে না; বরং তখনই জানাযার আরোহণের সময় আসিয়া পড়িবে। হজ্জের সফর এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে উহা পরকালের সফরের পাথেয় হওয়ার উপযোগী হয়। ইহরাম বাঁধিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ প্রচলিত পোশাক পরিত্যাগপূর্বক ইহ্রামের সাদা ও সেলাইবিহীন দুইটি চাদর পরিধান করিবার সময় পরলোক-গমনের পথে কাফনের কাপড়ের কথা স্মরণ করিবে। কারণ, কাফনের কাপড়ও সাধারণ প্রচলিত পোশাক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে। পাহাড় ও অরণ্যের বিপদাপদের সম্মুখীন হইলে কবরের মনকার-নাকীর ফেরেশতা ও সাপ-বিচ্ছুর কথা স্মরণ করিবে। কবর হইতে হাশরের ময়দান পর্যন্ত বিপদাপদ পরিপূর্ণ অতি বৃহৎ অরণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। পথপ্রদর্শনের সহায়তা ব্যতীত যেমন গভীর অরণ্যে বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, ইবাদত ব্যতীত তদ্রূপ কবরের বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নাই। হজ্জের পথে অরণ্য দিয়া যাইবার সময় যেমন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করত একাকী চলিতে হয়, কবরেও তদ্রূপ একাকী যাইতে হয়। 'লাব্বায়েক' বলিবার সময় মনে করিবে, ইহা আল্লাহ্র আহ্বানের উত্তরমাত্র। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র আহ্বান শুনা যাইবে। সেই আহ্বানের ভয়ের কথা স্মরণ করিবে এবং ইহার আশঙ্কায় নিমজ্জিত থাকিবে।

ইহরামের সময় হযরত আলী ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিত, সমস্ত শরীর ভয়ে কম্পিত হইত এবং 'লাব্বায়েক' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি 'লাব্বায়েক' বলেন না কেন?" তিনি বলিলেন– "লাব্বায়েক বলিলে 'লা লাব্বায়েক' বলেন না কেন?" তিনি বলিলেন–"লাব্বায়েক বলিলে 'লা লাব্বায়েক' (অর্থাৎ তুমি মনে প্রাণে আমার দরবারে উপস্থিত হও নাই) উত্তর আসে কিনা, আমার এই ভয়।" এই বলিয়াই তিনি বেহুঁশ হইয়া উটের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র)-এর মুরীদ হযরত আহমদ ইবনুল হওয়ারী (র) বলেন যে, "তাঁহার পীর ইহ্রাম বাঁধিয়া

"লাব্বায়েক" বলিতে পারে না। এমতাবস্থায় এক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। তৎপর চেতনা লাভ করিয়া তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ্ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল করিয়াছিলেন ঃ "তোমার অত্যাচারী উম্মতদিগকে আমাকে স্মরণ করিতে ও আমার নাম লইতে নিষেধ কর। কারণ, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে স্মরণ করি। কিন্তু স্মরণকারী অত্যাচারী হইলে আমি তাহাকে অভিশাপের সহিত স্মরণ করিয়া থাকি।" তৎপর তিনি আরও বলেন- "আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক মাল হইতে হজ্জের পাথেয় সংগ্রহ করে, সে যদি 'লাব্বায়েক' বলে, ইহার উত্তরে তাহাকে বলা হয়-"তোমার হস্তস্থিত পাথেয় যে পর্যন্ত ইহার হকদারকে ফিরাইয়া না দিবে সে পর্যন্ত তোমার 'লাব্বায়েক' আমি কবূল করিব না।

কা'বা শরীফের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ- যেমন, কোন দীনহীন অসহায় ব্যক্তি শাহী দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বাদশাহের নিকট স্বীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে এবং রাজপ্রাসাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মধ্যে মধ্যে দরবারে যাতায়াত করে এবং সুপারিশ করিবার লোক খুঁজিতে থাকে। আর তদ্সঙ্গে বাদশাহের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাহার প্রতি আকর্ষণের এবং বাদশাহ্কে স্বচক্ষে দর্শনের আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে। ঠিক তদ্রূপ হাজীগণ কা'বা শরীফের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে আল্লাহ্র দর্শনের আশায় দৌড়াদৌড়ি করে ; তৎপর আরাফার দরবারভূমিকে স্বীয় দুঃখ নিবেদনের জন্য সর্বসঙ্গে উপস্থিত হয়। আরাফার ময়দানের জগতের সকল দেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক যখন সমবেত হইয়া নিজ নিজ ভাষায় প্রার্থনা করিতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি কিয়ামত দিবস হাশরের ময়দানে সমস্ত জগতের লোক সমবেত হওয়ার অনুরূপ। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় অস্থির থাকিবে, প্রত্যেকেই অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের ভয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হইল একদিকে ইবাদতরূপে প্রকৃত বন্দেগী প্রকাশ এবং অপরদিকে এই কার্য হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের কার্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখে। উক্ত স্থানে শয়তান আসিয়া হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের অন্তরে সন্দেহ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্যই তিনি শয়তানের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তোমার মনে যদি এই ধারণা উদ্রেক হয় যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম স্বচক্ষে শয়তানকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, আমি তো দেখিতে

পাইতেছি না ; এমতাবস্থায় অনর্থক প্রস্তর নিক্ষেপ করিব কেন? এইরূপ ধারণা তোমার হৃদয়ে উদিত হইলে মনে করিবে, শয়তান প্ররোচনা দ্বারা তোমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিনা দ্বিধায় প্রস্তর নিক্ষেপ করত তুমি শয়তানের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দাও। প্রস্তর নিক্ষেপ অবশ্যই শয়তানের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়। আর তুমি নিজকে আল্লাহ্‌র প্রকৃত আজ্ঞাবহ দাস বলিয়া প্রমাণ কর, তাঁহার উপর উৎসর্গ করিয়া দাও। আর বিশ্বাস কর, "প্রস্তরাঘাতে আমি শয়তানকে শাস্তি দিলাম এবং পরাজিত করিলাম।"

হজ্জ হইতে প্রাপ্ত উপদেশাবলীর এত বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের উদ্দেশ্য এই– ইহা যদি কোন ব্যক্তি সামান্য জ্ঞানও জন্মে তবে তাহার বুদ্ধিমত্তা, অনুরাগ ও চেষ্টা অনুযায়ী উহার গূঢ় রহস্য তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং প্রতিটি কার্য হইতে সে নির্ধারিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ইহাই ইবদতের প্রাণ। আর এই অর্থ বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক কার্যের বাহ্য আকৃতি হইতে ইহার আধ্যাত্মিক গূঢ় মর্মের দিকে সে অধিকতর অগ্রসর হইতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফযীলত ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বিশেষত নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত সমস্ত ইবাদতের মধ্যে উত্তম। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-“আমার উম্মতের ইবাদতের মধ্যে কুরআন শরীফ পাঠ সর্বাপেক্ষা উত্তম ইবাদত। তিনি বলেন-“আল্লাহ্ যাহাকে কুরআনরূপ নিয়ামত দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, অপর কাহাকেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করা হইয়াছে, তবে আল্লাহ্ যাহাকে সম্মান দান করিয়াছেন তাহাকে সে তুচ্ছ করিল।” তিনি আরও বলেন-“কুরআন শরীফকে কোন চর্মের মধ্যে রাখিলে অগ্নি ইহার নিকটেই যাইবে না।” তিনি অন্যত্র বলেন- “কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র দরবারে কোন ফেরেশতা, পয়গম্বর বা অন্য কেহ কুরআন শরীফ অপেক্ষা অধিক সুপারিশ করিতে পারিবে না।” তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ “কুরআন শরীফ পাঠে লিপ্ত থাকার দরুন যে ব্যক্তি দু'আ করিতে পারে না, আমার শোকরগুযার বান্দাগণের শ্রেষ্ঠ পুণ্য তাহাকে প্রদান করিব।” রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন- “লোহার ন্যায় মানুষের অন্তরে মরিচা ধরে।” নিবেদন করা হইল- “হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সেই মরিচা কিসে দূর হয়?” হযরত (সা) বলিলেন- “কুরআন শরীফ পাঠে ও মৃত্যুর স্মরণে।” তিনি বলেন- “আমি দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে দুইজন উপদেষ্টা রাখিয়া যাইতেছি। তাহারা সর্বদা তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবে ও সুনীতি শিক্ষা দিবে। তাহাদের একটি সবাক ও অপরটি নির্বাক। সবাক হইল কুরআন শরীফ, আর নির্বাক হইল মৃত্যু।” হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহ আন্হু বলেন- “কুরআন শরীফ পাঠ কর। ইহার প্রত্যেকটি অক্ষরের বিনিময়ে দশ দশটি নেকী পাওয়া যায়।

আমি বলিতেছি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ এক অক্ষর; বরং ‘আলিফ’ এক অক্ষর ‘লাম’ এক অক্ষর এবং ‘মীম’ এক অক্ষর।” হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন—“আমি আল্লাহ্কে স্বপ্নযোগে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“হে আল্লাহ্, তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য কোন্ বস্তুর উসিলা উত্তম!” আল্লাহ্ বলিলেন—“আমার বাণী কুরআন শরীফের উসিলা।” আমি আবার নিবেদন করিলাম, “উহার অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক উভয় অবস্থাতেই”, আল্লাহ্ বলিলেন—“হ্যাঁ অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক।”

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের আদব ঃ কুরআন শরীফ পাঠকারীর মর্যাদা অতি উচ্চ। অতএব কুরআন শরীফের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অসঙ্গত কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা কুরআন শরীফ পাঠকারীর আবশ্যক। কুরআন শরীফের সম্মুখে সর্বদা শিষ্টতার সহিত থাকা কর্তব্য। অন্যথায় কুরআন শরীফই তাহার পরম শত্রু হইয়া পড়িবার আশঙ্কার রহিয়াছে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আমার উম্মতের মধ্যে মুনাফিক অধিকাংশ কুরআন পাঠকেরাই হইবে।" হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র) বলেন—'দোযখের ফেরেশতা মূর্তিপূজকদিগকে ধরিবার পূর্বে কুরআন পাঠক ফাসাদকারীদিগকেই ধরিবে।" তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন—"হে মানব, তোমরা লজ্জা করো না? তোমার প্রিয়জনের কোন পত্র পাইলে তুমি চলার পথে থাকিলেও তৎক্ষণাৎ থামিয়া বা পথিপার্শ্বে বসিয়া ইহার প্রত্যেকটি অক্ষর পড়িয়া থাক এবং বিশেষভাবে প্রণিধানপূর্বক উহার অর্থ বুঝিয়া লও। কিন্তু আমার এই কিতাব আদেশ পত্রস্বরূপ তোমার নিকট পাঠাইয়াছি যেন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা পাঠ কর এবং তদনুযায়ী কাজ কর। কিন্তু তোমরা ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেছ এবং তদনুযায়ী কাজ করিতেছ না। তোমাদের মধ্যে যাহারা ইহা পাঠ করিতেছে তাহারাও উহাতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতেছে না।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন—"পূর্বকালের লোকেরা কুরআন শরীফকে আল্লাহ্র নিকট হইতে আগত একখানি নির্দেশনামা বলিয়া মনে করিতেন, রাত্রিকালে বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা বুঝিয়া লইতেন এবং দিবসে তদনুযায়ী কাজ করিতেন। তোমরা কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেছ এবং ইহার প্রতিটি হরফের যের ও যবর ঠিক করিতেছ; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করিতে শৈথিল্য করিতেছ।"

মোটকথা, কুরআন শরীফের আসল উদ্দেশ্য তদনুযায়ী কাজ করা, শুধু পাঠ করা নহে। অবশ্য স্মরণ রাখিবার জন্য পাঠের আবশ্যক এবং উহার নির্দেশানুসারে কাজ করিবার জন্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন, কোন দাসের নিকট তাহার প্রভুর নিকট হইতে একখানা নির্দেশনামা আসিল। উহাতে দাসের প্রতি প্রভুর আদেশ-নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। দাস উহা পড়িতে বসিল এবং অতি মিষ্টি সুরে আবৃত্তি করিতে লাগিল ও উহার প্রতিটি অক্ষর খুব বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে লাগিল; কিন্তু উহাতে লিখিত আদেশ-নিষেধের কিছুই পালন করিল না। এমতাবস্থায় সেই দাস প্রভুর কঠিন আক্রোশে পতিত হইয়া ভীষণ শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের বাহ্য নিয়ম ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় ছয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; যথা—

(১) ভক্তি সহকারে কুরআন শরীফ পাঠ করিবে। প্রথমে ওযূ করত কিবলার দিকে মুখ করিয়া বসিবে এবং নামাযের ন্যায় খুব দীনতা ও মিনতির সহিত কুরআন শরীফ পড়িবে; হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন শরীফ পড়ে তাহার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে শত শত নেকী লিখিত হয় এবং যে ব্যক্তি বসিয়া নামায পড়ে তাহার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে পঞ্চাশ নেকী লিখিত হয়; যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত অন্য সময় ওযূর সহিত কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে পঁচিশ নেকী লিখিত হয়। আর বিনা ওযূতে (স্পর্শ না করিয়া) কুরআন শরীফ পাঠ করিলে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে দশ নেকীর অধিক লিখিত হয় না।" রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন শরীফ পাঠ অতি উত্তম। কারণ, তখন খুব একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়।

(২) ধীরে ধীরে পড়িবে এবং অর্থের দিকে মনোনিবেশ করিবে; তাড়াতাড়ি খতম করিবার চেষ্টায় থাকিবে না। কোন কোন লোকে প্রত্যহ এক খতম করিয়া থাকে; রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করে সে ইহাতে নিহিত ধর্ম-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াআল্লাহু আনহু বলেন ঃ যদি 'ইযাযুল যিলাতিল আরদু' ও 'আলকারিয়াতু' (ক্ষুদ্র সূরাদ্বয়) আস্তে আস্তে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর তবে ইহা (কুরআন শরীফের সর্ববৃহৎ দুই সূরা) 'বাকারাহ' ও 'আলে ইমরান' তাড়াতাড়ি পড়া অপেক্ষা আমার অধিক পছন্দনীয়।" হযরত আয়েশা (রা) এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কুরআন শরীফ পড়িতে শুনিয়া বলিলেন ঃ "এ ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছে না, চুপ করিয়া নাই।" অনারব কুরআন শরীফের অর্থ না বুঝিলেও ইহার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করা তাহার উচিত।

(৩) কুরআন শরীফ পাঠকালে রোদন কর। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং রোদন কর। রোদন না আসিলে চেষ্টা করিয়া রোদনের ভাব আনয়ন কর।" হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন ঃ 'সুবহানাল্লাযী' সূরা পাঠের সময় সিজদার আয়াত পাঠ করিলে ক্রন্দনের পূর্বে সিজদা করিবে না। চক্ষু ক্রন্দন না করিলেও অন্তরে ক্রন্দন করা উচিত। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "বিলাপ করিবার জন্য কুরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে। সুতরাং ইহা পাঠকালে নিজকে বিষণ্ন বানাও।" কুরআন শরীফে যে সকল শুভ সংবাদপূর্ণ ও ভীতি প্রদর্শক আয়াত রহিয়াছে উহাদের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে এবং নিজের অক্ষমতা ও দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করিলে পরকালের প্রতি একেবারে উদাসীন ব্যতীত সকলের হৃদয় আপনা আপনিই দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে।

(৪) প্রত্যেক আয়াতের প্রতি কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করিবে। কারণ রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আযাবের আয়াত পাঠকালে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন, রহমতের আয়াত পাঠকালে রহমতের প্রার্থনা করিতেন এবং আল্লাহ্র পবিত্রতাসূচক আয়াত পাঠ করিবার সময় তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত আরম্ভ করিবার সময় 'আউযু বিল্লাহ্' পড়িতেন এবং তিলাওয়াত শেষ করিয়া এই দু'আ পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ و عَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهُ

اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اَصْرَفَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ حُجَّةً لِّىْ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ কুরআন শরীফের উসিলায় তুমি আমার উপর অনুগ্রহ কর এবং উহাকে আমার জন্য পরিচালক, আলো, পথপ্রদর্শক এবং রহমতস্বরূপ কর। ইয়া আল্লাহ্! উহা হইতে আমি যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং উহার যাহা কিছু জানি না তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও। আর আমাকে দিবারাত্র উহা তিলাওয়াতের তওফীক দান কর এবং হে বিশ্বপালক, উহাকে আমার জন্য দলিলস্বরূপ করিয়া দাও।

সিজদার আয়াত পাঠ করিয়া প্রথমে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলিয়া পরে সিজদা করিবে। নামাযের জন্য পবিত্রতা অবলম্বন ও সতর ঢাকা ইত্যাদি শর্তপালন যেমন অপরিহার্য তদ্রূপ তিলাওয়াতের সিজদার জন্য এই শর্তগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তবে "আল্লাহু আকবর" বলিয়া সিজদা করিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বা সালাম ফিরাইতে হইবে না।

(৫) তিলাওয়াতের সময় লোক-দেখানো মনোভাব জন্মিবার আশঙ্কা হইলে কিংবা অন্যের নামাযে ক্ষতি হইলে চুপে চুপে তিলাওয়াত করিবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "গোপনে দান করা যেমন প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম তদ্রূপ চুপে চুপে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত প্রকাশ্য তিলাওয়াত অপেক্ষা উত্তম।" কিন্তু লোক-দেখানো ভাব জন্মিবার ও অপর লোকের নামাযের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা না থাকিলে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করাই উত্তম। তাহাতে অপর লোকে শুনিয়া খুব উপকৃত হয় ও তাহাদের প্রভূত জ্ঞান লাভ হয়। স্বয়ং পাঠকের সহযোগিতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং তন্দ্রা দূরীভূত হয় ও অপর নিদ্রিত ব্যক্তিরও ঘুম ভাঙ্গে। এই সকল নিয়তে উচ্চস্বরে

তিলাওয়াত করিলে প্রত্যেকটি নিয়তের জন্য পৃথক পৃথক সওয়াব পাওয়া যায়। মুখস্থ পড়া অপেক্ষা দেখিয়া পড়াই উত্তম; কারণ, ইহাতে চক্ষুকে সৎকাজে নিয়োজিত করা হইবে। কথিত আছে, দেখিয়া এক খতম করা মুখস্থ সাত খতমের সমান।

মিসর দেশীয় লোকজন ফিকাহশাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিম হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি সিজদায় পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে কুরআন শরীফ স্থাপিত রহিয়াছে। তৎপর হযরত ইমাম সাহেব (র) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ "ফিকাহশাস্ত্র তোমাদিগকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত হইতে বিরত রাখিয়াছে। আমি ইশার নামায সমাধা করত কুরআন শরীফ পড়িতে আরম্ভ করি এবং ভোর পর্যন্ত পড়িতে থাকি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আবূ বকর (র) গৃহে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, রাত্রিকালে তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া নীরবে কুরআন শরীফ পাঠ করিতেছেন। হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "নীরবে পড়িতেছ কেন?" হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলিলেন ঃ "কারণ, যাহার নিকট আমি নিবেদন করিতেছি, তিনি শুনেন।" অপর দিকে হযরত (সা) হযরত উমর (রা) উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি নিদ্রিত লোকদিগকে জাগ্রত করিতেছি এবং শয়তানকে বিতাড়িত করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন ঃ "তোমরা উভয়েই উত্তম কার্য করিতেছ। এইরূপ কার্যের ফল নিয়ত অনুযায়ী হইয়া থাকে।" তাঁহাদের উভয়ের নিয়তই উত্তম ছিল। এইজন্য উভয়েই সওয়াব পাইবেন।

(৬) সুমিষ্ট স্বরে কুরআন শরীফ পড়িবার চেষ্টা করিবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সুমিষ্ট স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া ইহার শোভা বৃদ্ধি কর।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ হুযাইফার প্রভুকে মধুর স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مِثْلَهُ ـ

অর্থাৎ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি এইরূপ ব্যক্তিকে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।" ইহার কারণ, এই আওয়াজ যত মধুর হইবে হৃদয়ের উপর কুরআন শরীফের প্রতিক্রিয়াও তত অধিক হইবে। মধুর স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু গায়কদের মত শব্দ ও অক্ষরগুলিকে গানের স্বরে পড়া মাকরূহ।

কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যন্তরীণ নিয়ম ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় ছয়টি অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা ঃ

(১) কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবে; ইহাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া জানিবে এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে, এই কালাম অনাদি ও আল্লাহ্‌র একটি

গুণবিশেষ। এই গুণ তাঁহার সত্তার সহিত বিরাজমান। আমরা রসনা দ্বারা যাহা উচ্চারণ করি তাহা অক্ষরমাত্র। 'অগ্নি' শব্দটি মুখে বলা অতি সহজ, সকলেই উহা উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু আসল অগ্নি কেহই মুখে লইতে পারে না। তদ্রূপ কুরআন শরীফের শব্দসমূহ সকলেই মুখে উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িলে সাত যমীন ও সাত আসমানও উহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "আমি যদি এই কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইতে যে, উহা আল্লাহ্‌র ভয়ে ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু কুরআনের গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য শব্দ ও অক্ষরের আবরণে ঢাকিয়া গোপন রাখা হইয়াছে যেন রসনা অন্তর উহা ধারণ করিতে পারে। শব্দের আবরণে আবৃত করা ব্যতীত কুরআনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার অন্য কোন উপায়ই ছিল না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, শুধু শব্দ ব্যতীতও কুরআনের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। মানুষের ব্যবহৃত বাক্য দ্বারা চতুষ্পদ জন্তুকে আহ্বান করা বা শিক্ষা দেওয়া অথবা কোন কার্যে নিয়োগ করা চলে না; কারণ পশুরা মানুষের বাক্য বুঝিতে অক্ষম। এইজন্য ইহাদিগকে চালাইবার উদ্দেশ্যে ইহাদের অব্যক্ত শব্দের সহিত মানুষের কতকগুলি শব্দ মিলাইয়া এক প্রকার ভাষা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাষা প্রয়োগে পশুকে সতর্ক করা হয় এবং ইহা শুনিয়াই ইহারা কাজে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই কার্যের রহস্য ও উদ্দেশ্য পশুরা কিছুই জানে না। বলদকে হালে জুড়িয়া তদ্রূপ শব্দে পরিচালিত করিলে ইহারা হাল কর্ষণ করিতে থাকে; ফলে জমির মাটি উলট-পালট ও আলগা হয়। কিন্তু হাল-চাষের রহস্য ও উপকারিতা বলদ মোটেই বুঝে না। চাষ করা মাটির মধ্যে পানি ও বায়ু প্রবেশ করত বীজ অঙ্কুরের উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়া তোলে। পশুদের ন্যায় কুরআন শরীফের শব্দ ও প্রকাশ্য অর্থ ছাড়া ইহার গূঢ় রহস্য বহু লোকে বুঝিতে পারে না। এমনকি কতক লোকে কুরআন শরীফকে কতকগুলি শব্দ ও অক্ষরের সমষ্টিমাত্রই বুঝিয়া লইয়াছে। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত দুর্বল ও মন পঙ্কিলতায় পূর্ণ। তাহারা এমন ব্যক্তিতুল্য, যে আগুনকে একমাত্র আগুন এই অক্ষরগুলির সমষ্টি বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে এবং উহা জানে না যে, আগুনে কাগজ নিক্ষেপ করিলে আগুন ইহাকে পোড়াইয়া ফেলে এবং কাগজ উহার তেজ সহ্য করিতে পারে না। অথচ কাগজের উপর 'আগুন' শব্দটি লিখিলে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে এবং কাগজকে দগ্ধ করে না।

দেহের প্রাণ থাকে এবং এই প্রাণের কারণেই দেহ টিকিয়া থাকে। কুরআন শরীফের শব্দগুলির মর্মার্থ উহার প্রাণস্বরূপ এবং শব্দগুলি উহার দেহ। আত্মার কারণেই দেহের মর্যাদা এবং অর্থের কারণেই শব্দের গৌরব হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার পূর্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে।

(২) কুরআন শরীফ মহান আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তিলাওয়াত আরম্ভের পূর্বেই হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া লইবে এবং কাহার কালাম পাঠে ও কত বড় কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহাও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে। এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন—

لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۔

অর্থাৎ "পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এরূপ লোক ব্যতীত অপর কেহই ইহা স্পর্শ করিবে না।" পাক লোক ব্যতীত অপরে যেমন কুরআন-গ্রন্থ স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ কুস্বভাবের অপবিত্রতা হইতে অন্তর পাক-সাফ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার আলোকে সুশোভিত না হইলে কুরআন শরীফের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্যই কুরআন শরীফ খুলিবার সময় হযরত আকরামা (র)-এর হৃদয় ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িত এবং তিনি বলিয়া উঠিতেন ঃ هذا كلام ربى। অর্থাৎ "ইহা আমার প্রভুর কালাম।" আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি না করা পর্যন্ত কেহই কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র গুণ ও কার্যাবলীর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্যকরূপে বুঝা যায় না। গভীরভাবে মনোনিবেশপূর্বক বুঝিয়া লইবে, আরশ, কুরসী, আসমান-যমীন এবং যাহা কিছু ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, যথা—ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, ধাতব পদার্থ, বৃক্ষ-তৃণলতাদি ও সমস্ত মখলুকাতই আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন; এই সমস্ত ধ্বংস করিয়া দিতে তাঁহার কোন বাধা নাই এবং ধ্বংস করিয়া দিলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্বের কোন প্রকার ত্রুটিও দেখা দিবে না; একমাত্র তিনিই এই সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও আহারদাতা। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের-যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে পারে।

(৩) মনোযোগের সহিত কুরআন শরীফ পাঠ করিবে; অন্যমনস্ক হইবে না এবং প্রবৃত্তি যেন মনকে এদিক-ওদিক লইয়া যাইতে না পারে। উদাসীনতার সহিত যাহা পাঠ করা হইয়াছে তাহা পাঠ করা হয় নাই মনে করিয়া পুনরায় পড়িয়া লইবে। উদাসীনতার সহিত কুরআন পাঠকারী এমন ব্যক্তি সদৃশ, যে মনোমুগ্ধকর বৃক্ষ-লতা ও পুষ্প-কলিকা সুশোভিত সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করিল; অথচ তথাকার মনোরম দৃশ্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া আসিল।

কারণ, কুরআন শরীফ মুসলমানের জন্য মনোরম বিষয়বস্তু, বিস্ময়কর ব্যাপার ও গূঢ় রহস্যাবলীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করিলে হৃদয় অন্য কোন দিকেই লিপ্ত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফের অর্থ বুঝিতে না পারিলে তাহার অদৃষ্ট বড় মন্দ। অর্থ না বুঝিলেও কুরআনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মনে পোষণ করত তিলাওয়াত করা আবশ্যক যেন মন এদিক-ওদিক ধাবিত না হয়।

(৪) কুরআন শরীফের প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। একবারে অর্থ না বুঝিলে পুনরায় পড়িবে। পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না, অথচ মন বেশ আনন্দ পাইল, তথাপি আবার পড়িবে। কারণ, অধিক পড়া অপেক্ষা অর্থ বুঝিয়া পড়াই উত্তম। হযরত আবূ যর (র) বলেন ঃ যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক দিন রাত্রিকালের নামাযে এই আয়াত বারবার পাঠ করিয়াছিলেন—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ -

অর্থাৎ "তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও (তাহা তুমি করিতে পার)। কারণ তাহারা তোমারই দাস। আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর (তাহাও করিতে পার)। কেননা তুমি শক্তিশালী ও হিকমতওয়ালা।" আর সেই সময় তিনি বিশবার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়িয়াছিলেন। হযরত সাআদ ইবনে যুবাইর (র) এক রাত্রি এই আয়াত পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন—

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ -

অর্থাৎ "হে গুনাহ্গারগণ, আজ পৃথক হইয়া যা।" এক আয়াত পড়িবার সময় অন্য আয়াতের অর্থের দিকে ধ্যান করিলে উক্ত পঠিত আয়াতের হক আদায় করা হয় না। হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ নামাযের মধ্যে তাঁহার মনে ওস্ওয়াসা আসে বলিয়া দুঃখ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মনে পার্থিব চিন্তা উদিত হয় কি?" তিনি বলিলেন ঃ "নামাযের মধ্যে পার্থিব চিন্তা উদিত হওয়া অপেক্ষা বরং আমার বক্ষে ছুরি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আমি সুখময় বলিয়া মনে করি। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র সম্মুখে কিরূপে দণ্ডায়মান হইব এবং কিরূপে তথা হইতে ফিরিব, এই সকল চিন্তাই অধিক উদিত হয়।" এইরূপ নির্দেশ আছে যে, নামাযে পঠিত আয়াতের মর্ম ব্যতীত নামাযের সময় অন্য কিছুর খেয়াল করা উচিত নহে। পঠিত আয়াতের মর্ম ব্যতীত ধর্মবিষয়ক অন্য চিন্তা নামাযের মধ্যে উদিত হইলেও ইহা ওস্ওয়াসার অন্তর্ভুক্ত। এই নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম নামাযের মধ্যে উক্তরূপ চিন্তাকেও অস্অসা বলিয়া মনে করিতেন। ফলকথা, কুরআনের যে আয়াত পাঠ করিবে সেই আয়াতের অর্থ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা করা উচিত নহে। আল্লাহ্র গুণ প্রকাশক

আয়াত পাঠকালে তাঁহার গুণের গূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে; যেমন, قدوس (পবিত্র) عزيز (শক্তিশালী), جبار (অসীম পরাক্রমশালী), حكيم (কৌশলময়) প্রভৃতি গুণ-প্রকাশক শব্দগুলির অর্থের দিকে মনোনিবেশ করিবে। তাঁহার কার্যাবলীয় প্রকাশক আয়াত যেমন خلق السموت والارض (তিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন) এই শ্রেণীর আয়াতসমূহ পাঠকালে বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দিকে মনোনিবেশপূর্বক সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিবে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ও অবাধ ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হইবে যেন যাহা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার এবং তিনি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই ও তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সত্য তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ (নিশ্চয়ই মানুষকে আমি শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।) আয়াত পাঠকালে শুক্রের বিস্ময়কর গুণের বিষয় চিন্তা করিবে। এক বিন্দু নাপাক পানি হইতে কিরূপে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ যেমন গোশ্‌ত, চর্ম, অস্থি, শিরা ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন মস্তক, হস্ত-পদ, চক্ষু রসনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার বিভিন্ন প্রকারের আশ্চর্য শক্তি যেমন শ্রবণ, দর্শন, প্রাণ ইত্যাদি কেমন করিয়া আসে। কুরআন শরীফের সকল অর্থ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে কুরআনের আয়াত অবলম্বনে চিন্তা ও অনুধাবনের জন্য সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যেই উপরে যৎকিঞ্চিত বর্ণিত হইল।

তিন প্রকার লোক কুরআনের গূঢ় অর্থ বুঝিতে অক্ষম ঃ (ক) যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না ও তফসীর পাঠ করে নাই। (খ) যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে অথবা যাহার হৃদয়ে কোন বিদআতী আকীদা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং উহার ফলে গুনাহ বিদআতের কালিমায় হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। (গ) তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে, ইহার প্রকাশ্য অর্থ যাহার হৃদয়ে এমনভাবে বসিয়া গিয়াছে যে, উহার বিরোধী কোন সত্য উপস্থিত হইলে ইহাকে সে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে। এমন ব্যক্তির পক্ষে তাহার বদ্ধমূল বিশ্বাস হইতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবপর। সুতরাং সে কুরআনে গূঢ় মর্ম অনুধাবন করিতে পারে না।

(৫) পঠিত আয়াত যে প্রকৃতির তিলাওয়াতের সময় মনকেও সেই প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। যেমন, ভয়সূচক আয়াত পাঠের সময় মনে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে; রহমতসূচক পাঠকালে মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিবে এবং আল্লাহ্ গুণাবলী প্রকাশক আয়াত পাঠকালে মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিবে এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক আয়াত পাঠকালে ভক্তি ও নম্রতায় অবনত হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্‌র প্রতি কাফিরদের আরোপিত মিথ্যা অপবাদ যেমন, তাঁহার শরীক আছে, তাঁহার পুত্র আছে, এই শ্রেণীর আয়াতসমূহ পাঠকালে কণ্ঠস্বর

মৃদু করিবে এবং লজ্জায় অবসন্ন হইয়া যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক আয়াত পাঠের সময় ইহার মর্ম অনুযায়ী মনোভাব পরিবর্তন করিয়া লইবে। তাহা হইলে আয়াতের প্রতি পাঠকের কর্তব্য পালন হইবে।

(৬) কুরআন শরীফ পড়িবার সময় মনে করিবে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কুরআন শুনিতেছ। এক বুযর্গ বলেন ঃ "আমি কুরআন তিলাওয়াতে আনন্দ পাইতাম না। তৎপর মনে করিয়া নিলাম যে, আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যবান মুবারক হইতে কুরআন পাঠ শুনিতেছি। ইহাতে আমি আনন্দ পাইলাম। ইহার পর মনে করিলাম যে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামের নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছি। ইহাতে আমার আরও আনন্দ বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে আমার কল্পনাকে আরও ঊর্ধ্বে উন্নীত বড় মরতবা লাভ করিলাম। এখন এমনভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করি যেন কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছি। ইহাতে এমন আনন্দ পাইতেছি যে, ইতঃপূর্বে এরূপ আনন্দ কখনও পাই নাই।

নবম অধ্যায়

আল্লাহ্‌র যিকির

আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের প্রাণ ঃ আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের সারাংশ ও প্রাণ। এইজন্যই নামায ইসলামের স্তম্ভরূপে পরিগণিত। কারণ আল্লাহ্‌র যিকিরই নামাযের উদ্দেশ্য; যেমন আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই নামায ফাহেশা ও অশোভন কার্য হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্‌র যিকির অতি মহান।" কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এইজন্য সর্বোত্তম ইবাদত যে, ইহা পরম পরাক্রান্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বাণী; উহা পাঠে আল্লাহ্‌র স্মরণ মনে উদিত হয় এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় আল্লাহ্‌র স্মরণকে সজীব করিয়া তোলে ও উহা আল্লাহ্‌র যিকিরের অন্যতম উপায়। কামনা ও লোভ খর্ব করা রোযার উদ্দেশ্য। কারণ, অতিরিক্ত কামভাব হইতে হৃদয় মুক্ত হইয়া পরিষ্কার ও প্রশান্ত হইয়া উঠিলে তথায় আল্লাহ্‌র যিকির বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। অপর দিকে কামনা ও লোভপূর্ণ অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকির স্থান পাওয়া সম্ভব নহে এবং এরূপ অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকির ফলপ্রসূও হয় না। আল্লাহ্‌র গৃহ কা'বা শরীফ যিয়ারতকে হজ্জ বলে। কিন্তু কা'বা গৃহের অধিপতি আল্লাহ্‌র স্মরণ ও দর্শনাভিলাষকে হৃদয়ে দৃঢ়মূল করাই হজ্জের উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র যিকির হইল সকল ইবাদতের প্রাণ ও সারবস্তু। এমনকি, ইসলামের মূল শিকড় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা ও আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং অন্য সকল ইবাদত এই যিকিরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং ইহাকে মজবুত করিয়াও তোলে।

যিকিরের ফযীলত ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিলে তিনি তোমাকে স্মরণ করেন। ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রতিদান ও সফলতা আর কি হইতে পারে? আল্লাহ্ বলেন ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ "অনন্তর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" কারণ মানবের সৌভাগ্য ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ "লাভের আশা করিলে জানিয়া রাখ, অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিকির ইহার একমাত্র কুঞ্জী।" সুতরাং অধিক মাত্রায় যিকির কর, অল্প করিও না। অবিরতভাবে তাঁহার যিকির কর, মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়া নহে। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ "যাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করে (তাহারা বুদ্ধিমান)।" যাহারা সর্বাবস্থায় যিকির করেন আল্লাহ্ এস্থলে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ -

অর্থাৎ "আর তোমার প্রভুর যিকির কর ক্রন্দনের সহিত, ভীত বিহ্বল চিত্তে, অনুচ্চ বাক্যে ভোরে ও সন্ধ্যায় এবং কখনও গাফিল থাকিও না।"

কতিপয় লোক রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা উত্তম?" তিনি বলিলেন ঃ "মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র যিকিরে রসনা সিক্ত করা।" তিনি আরও বলেন ঃ "যে কার্য আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয়, যে কার্যে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা নিহিত রহিয়াছে, যাহা স্বর্ণ রৌপ্য দান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং যাহা আল্লাহ্‌র শত্রুদের সহিত এমন জিহাদ অপেক্ষা উত্তম যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে বধ করিতে থাক এবং তাহারা তোমাদিগকে শহীদ করিতে থাকে, আমি কি তোমাদিগকে এমন কার্যের সন্ধান দিব না? সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন—"ইহা কোন্ কার্য আমাদিগকে বলুন।" তিনি বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র যিকির।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন, যিকির যাহাকে আমার নিকট প্রার্থনা হইতে বিরত রাখে আমি তাহাকে প্রার্থনাকারীদের অপেক্ষা অধিক দান ও পুরস্কৃত করিয়া থাকি। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ "মৃত লোকের মধ্যে জীবিত লোক যেরূপ, শুষ্ক তৃণের মধ্যে সবুজ বৃক্ষ যেরূপ এবং জিহাদ হইতে পলাতক সৈন্যের তুলনায় বিজেতা বীরপুরুষ যেরূপ, আল্লাহ্‌র যিকিরে বিরত লোকের মধ্যে তাঁহার যিকিরকারীও তদ্রূপ। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (র) বলেন ঃ "বেহেশতবাসিগণের কোন বিষয়ে অনুতাপ থাকিবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তাঁহাদের যে মুহূর্তটি আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হইয়াছে তজ্জন্য অনুতাপ হইবে।"

যিকিরের হাকীকত ঃ যিকিরকে চারিভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা—(১) যে যিকির শুধু মুখে করা হয়, অন্তর তাহা হইতে অন্যমনস্ক ও উদাসীন থাকে। এরূপ যিকিরের প্রভাব খুব কম; কিন্তু একেবারে প্রভাবশূন্য নহে। কারণ, আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রসনা বেহুদা বাক্যালাপে লিপ্ত বা নিষ্কর্মা রসনা হইতে উৎকৃষ্ট। (২) এই শ্রেণীর যিকির মনের মধ্যে হয়; কিন্তু হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল নহে। চেষ্টা ও যত্নের সাহায্যে হৃদয়কে যিকিরে লিপ্ত রাখিতে হয়। চেষ্টা ও যত্ন না করিলে হৃদয় উদাসীনতায় বা রিপুর বশীভূত হইয়া ইহার প্রকৃতিগত স্বভাবে পুনরায় ফিরিয়া যায়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর যিকির হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া ইহার উপর নিজের প্রবল প্রভাব বিস্তারপূর্বক মনকে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রাখে এবং অনায়াসে মনকে অন্য কাজে লিপ্ত করা চলে না। ইহা মনের উৎকৃষ্ট অবস্থা। (৪) চতুর্থ প্রকার এই যে, যিকিরের বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বিরাজমান থাকেন এবং হৃদয় হইতে তখন কোন যিকির-ধ্বনি নির্গত হয় না। কারণ, যে হৃদয় স্মরণীয় বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্‌কে ভালবাসে এবং যে হৃদয় আল্লাহ্‌র যিকির ভালবাসে ইহাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে। বরং যিকির ও যিকিরের খেয়াল সম্পূর্ণরূপে অন্তর হইতে বিদূরীত হইয়া কেবল যিকিরের বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ সমগ্র অন্তর জুড়িয়া বিরাজমান থাকিলে উহাকেই যিকিরের সর্বোচ্চ সোপান বলে। যিকির আরবীতেই হউক, কি ফার্সীতেই হউক, ইহার বাগিন্দ্রিয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না; বরং ইহাকে বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত একমাত্র শব্দোচ্চারণ বলা চলে। আরবী, ফার্সী ইত্যাদি যাবতীয় ভাষায় শব্দ উচ্চারণে যিকির হইতে হৃদয় যখন একেবারে বিমুক্ত হইয়া পড়ে এবং অন্তর রাজ্যে একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ্‌ই বিরাজমান থাকেন ও তথায় অন্য কোন বস্তুর প্রবেশের স্থান না থাকে তখনই মানব যিকিরের সর্বোচ্চ মরতবায় উপনীত হয়। মহব্বতের প্রাবল্যের ফলেই এই মরতবায় উপনীত হওয়া যায়। এই অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে আশিক একমাত্র মাশূকের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। এমনও হয় যে, মাশূকের ধ্যানে আশিক মাশূকের নাম পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। মানুষ যখন এরূপ প্রিয়জনের ধ্যানে মগ্ন হইয়া নিজেকে একেবারে ভুলিয়া যায় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বিস্মৃত হয় তখন তাসাওওফের প্রথম ধাপে আরোহণ করে। সূফিগণ এই অবস্থাকে ফানা (বিলুপ্ত) ও নীস্ত (অনস্তিত্ব) বলিয়া থাকেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রভাবে ইহজগতের যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। এমনকি অবশেষে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত সে ভুলিয়া যায়। আল্লাহ্‌র এরূপ বহু জগত আছে যে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; আমাদের নিকট এইগুলি নাই বলিয়াই বিবেচিত হয়। আর যে সমস্ত জগত সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি এইগুলি আমাদের নিকট আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জড়জগত সকলের সম্মুখেই বিদ্যমান

রহিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্য ধ্যানে এই জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে তাহার নিকট ইহা নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইরূপ যদি কেহ নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায় তবে সে নিজেও নিজের নিকট অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। তদ্রূপ যে অবস্থায় কাহারও নিকট একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু নাই বলিয়া বিবেচিত হয় সে অবস্থায় তাহার নিকট কেবল আল্লাহ্ বিরাজমান থাকেন।

এই দৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন পৃথিবী ও এই উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে কেবল তাহাই দেখিতে পাও এবং এতদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে না পাও তখন তুমি মনে করিবে এই সকল ব্যতীত আর কিছুই নাই; যাহা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহাই সমগ্র বিশ্ব। এইরূপ সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণপূর্বক যিকিরকারী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া বলিয়া উঠেন 'হামাউস্ত' অর্থাৎ সমস্তই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই সোপানে উপনীত হইলে যিকিরকারী ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন প্রকার দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে না বরং আল্লাহ্র সহিত তাহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লাভ হয়। ইহা তাওহীদ ও ওহ্দানিয়াতের প্রথম ধাপ অর্থাৎ ইহাতে পার্থক্য দূরীভূত হয়। পার্থক্য ও দ্বিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাহার থাকে না। কারণ, পার্থক্য ও দ্বিত্ব এমন ব্যক্তিই দেখিতে পায় যে-ব্যক্তি পৃথক পৃথক দুইটি বস্তু উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজের ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর যিকিরকারী নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন বস্তুই তাহার জ্ঞানে নাই। এমতাবস্থায় সে কিরূপে পার্থক্য ও দ্বিত্ব উপলব্ধি করিবে? মানব এই স্তরে উপনীত হইলে ফেরেশতাগণের আকৃতি দেখিতে পায়। ফেরেশতা ও নবীগণের আত্মাসমূহ সুন্দর সুন্দর আকৃতিতে তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। যে সকল বস্তু একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট উহাও তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে; এমন মহান মহান অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে যাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থা হইতে নিজত্বে ফিরিয়া আসিয়া সে পার্থিব বস্তুসমূহ দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে পারিলেও পূর্ব অবস্থার প্রভাব তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়। সেই অবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। পৃথিবী, পার্থিব বস্তুসমূহ এবং মানুষের যাবতীয় পার্থিব কার্য তাহার নিকট বিস্বাদ ও অপছন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি সশরীরে মানব সমাজে বাস করে বটে; কিন্তু তাহার আত্মা মানব সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। পার্থিব কার্যে লিপ্ত বলিয়া দুনিয়াদারদের প্রতি এই শ্রেণীর লোক বিস্ময়ের চোখে দেখিয়া থাকেন। সাধারণ দুনিয়ার মোহ দেখিয়া এ সমস্ত বুযর্গের দয়ার্দ্র হওয়া ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অবলোকন করার কারণ এই যে, তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন, পার্থিব কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ইহারা কত বড় মহান সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অথচ দুনিয়াসক্ত লোকেরাই এই সমস্ত বুযর্গকে সংসার বিরাগী দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে এবং মনে করে, তাঁহারা পাগল হইয়া গিয়াছেন।

'ফানা' ও 'নীস্তি'র উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত না হইলে এবং 'কাশ্‌ফ্‌' হাসিল না হইলেও আল্লাহ্‌র যিকির যদি হৃদয়ে প্রবল থাকে তবে ইহাকেও সৌভাগ্যের পরশমণি বলা চলে। কারণ, হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকির প্রবল থাকিলে আপনা-আপনিই তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি, অবশেষে পৃথিবী ও পার্থিব যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তোলে। ইহাই সৌভাগ্যের মূল। কেননা মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র দীদারের আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহ্‌-প্রেমিকগণ তাঁহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার তারতম্যানুসারে মৃত্যুতে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সংসারাসক্ত ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি তাহার ভালবাসার তারতম্যানুসারেই মৃত্যুকালে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। এই বিষয় দর্শন খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

যথেষ্ট পরিমাণে যিকির করিয়াও যে ব্যক্তি সুফিগণের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই তাহার নিরাশ হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঐ অবস্থা প্রাপ্তির উপর সৌভাগ্য নির্ভর করে না; যিকিরের আলোকে হৃদয় আলাকিত হইলেই ইহা সৌভাগ্য লাভের উপযোগী হইয়া থাকে। পূর্ব-বর্ণিত আলৌকিক অবস্থার যাহা তাহার নিকট ইহজগতে প্রকাশ পায় নাই মৃত্যুর পর উহা তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে। অতএব, আল্লাহ্‌র ধ্যান ও যিকির সর্বদা নিমগ্ন থাকাই মানুষের কর্তব্য; যেন সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র সহিত মনের সংযোগ লাগিয়া থাকে এবং মন কখনও তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকে। কারণ, অবিরাম যিকির তাঁহার সান্নিধ্য লাভের এবং তাহার সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও অপার মহিমার পরিচয়ের কুঞ্জী। এই অর্থেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বেহেশতের উদ্যানে বিচরণ করিবার বাসনা রাখে আল্লাহ্‌র যিকির খুব অধিক করা তাহার কর্তব্য।"

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, যিকির সকল ইবাদতের সারাংশ। আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কার্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করত তাঁহার আদেশ পালন করিলে এবং নিষিদ্ধ পাপকার্য হইতে বিরত থাকিলেই বুঝা যায় যিকির যথার্থ হইয়াছে। যিকির যদি মানুষকে এই অবস্থায় উন্নীত করিতে না পারে তবে অবশ্যই বুঝিবে যে, ঐ যিকির মৌখিক শব্দোচ্চারণ ছিল মাত্র; খাঁটি যিকির ছিল না।

তস্‌বীহ্‌, তাহ্‌লীল, তামহীদ, দরূদ শরীফ ও ইস্তিগফারের ফযীলত ঃ (তাহলীল অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা) রাসূলে মাকবূল সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "বান্দা যে নেক কাজ করে কিয়ামত দিবসে তাহা মাপদণ্ডে ওজন করা হইবে। কিন্তু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' কলেমা এক পাল্লায় রাখিয়া সাত আসমান ও সাত যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপর পাল্লায় রাখিলে উক্ত কলেমার পাল্লাই ভারী হইবে।" তিনি আরও বলেন ঃ "খাঁটি অন্তকরণে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'

পাঠকারীর যমীনের বালুরাশির সমপরিমাণ অসংখ্য পাপ থাকিলেও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।" তিনি অন্যত্রও বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সে বেহেশতে যাইবে।" তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি–

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر -

প্রত্যহ একশতবার পাঠ করে সে দশটি ক্রীতদাসকে মুক্তিদানের সওয়াব পাইবে এবং তার আমলনামায় একশত সওয়াব লিখিত হইবে ও একশতটি গুনাহ্ মুছিয়া ফেলা হইবে এবং রাত্রি পর্যন্ত এই কলেমা তাহার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় হইবে।" সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যে, ব্যক্তি এই কলেমা পাঠ করিবে সে যেন হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামের বংশের চারিজন ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান করিল।

তস্‌বীহ্ ও তামহীদ ঃ (তাস্‌বীহ অর্থ 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং তামহীদ অর্থ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা)। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি রোজ سُبْحَانَ اللّٰه وَبِحَمْدِه একশত বার পড়িবে তাহার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের ন্যায় অসী হইলেও সমস্তই মাফ করিয়া দেওয়া হইবে" তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহু', তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ্' এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়িয়া পরিশেষে–

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر -

এই কলেমা পড়িয়া একশত পূর্ণ করে তাহার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনারাশির ন্যায় অসংখ্য হইলেও সমস্তই ক্ষমা করিয়া দেওয়াই হইবে।" এক ব্যক্তি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দুনিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি রিক্ত হস্ত, অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোন উপায় আছে কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ

"তুমি কোথায় আছ? যে তসবীহ্‌র বরকতে ফেরেশতা ও মানুষ জীবিকা পাইয়া থাকে তাহা কি তুমি জান না? সে ব্যক্তি নিবেদন করিল–"ইহা কি?" হযরত (সা) বলিলেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

প্রত্যহ ফজরের নামাযের পূর্বে একশতবার পড়িবে, দুনিয়া আপনা আপনিই তোমার দিকে ফিরিবে এবং আল্লাহ্ ইহার এক একটি শব্দ হইতে এক একজন ফেরেশতা পয়দা করত কিয়ামত পর্যন্ত তসবীহ্ পাঠে নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং উহার সওয়াব তুমি পাইবে" তিনি আরও বলেন ঃ "এই কলেমাগুলি চিরস্থায়ী সওয়াব লাভের উপায়।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرْ -

তিনি ইহাও বলেন ঃ আমি এই কলেমাগুলি পড়িয়া থাকি এবং ইহাদিগকে সূর্যের নিম্নস্থ যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক ভালবাসি।" তিনি আর বলেন ঃ "এই চারি কলেমাই আল্লাহ্‌র সমস্ত কলেমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" তিনি বলেন ঃ "দুইটি কলেমা উচ্চারণ খুব সহজ; কিন্তু মাপদন্ডে অতি ভারী এবং আল্লাহ্‌র নিকট খুব প্রিয়" (তাহা এই)

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ -

গরীবেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, ধনী লোকেরা সব সওয়াব লইয়া গেল। কারণ, আমরা যে ইবাদত করি তাহারাও উহা করিয়া থাকেন এতদ্ব্যতীত তাহারা দান করিয়া থাকে এবং (গরীব বলিয়া) আমরা দান করিতে পারি না।" তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ দরিদ্রতার কারণে তোমাদের প্রত্যেকটি তস্‌বীহ্, তাহলীল ও তাক্‌বীর এক একটি দানস্বরূপ। তদ্রূপ তোমাদের প্রতিটি সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে প্রতিরোধও এক একটি দানতুল্য। আর তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের মুখে যে গ্রাস তুলিয়া দাও তাহাও দান বলিয়া গণ্য।"

দরিদ্রের তস্‌বীহে ফযীলতের কারণ ঃ দরিদ্রের তস্‌বীহ্-তাহলীলে অধিক ফযীলতের কারণ এই যে, তাহাদের অন্তর সংসারের আবিলতা হইতে নির্মল থাকে। তাহাদের এক তস্‌বীহ্ আগাছামুক্ত উর্বর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় যাহা অতি শীঘ্র অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া যথেষ্ট পরিমাণে পূণ্যরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অপরপক্ষে ধনীদের হৃদয় দুনিয়ার লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ। তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকিররূপ বীজ ক্ষার ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় অতি অল্প ফল প্রদান করিয়া থাকে।

দরূদ শরীফের ফযীলত ঃ একদা রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম অতি প্রসন্ন চিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন ঃ "হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আসিয়াছিলেন। তিনি শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন যে,

আল্লাহ্ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে, আমি তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করিব। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করিব। ইহাতে কি আপনি সন্তুষ্ট নহেন।" তিনি বলেন, ঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর অল্পই হউক, আর বেশিই হউদ দরূদ শরীফ পাঠ করে, ফেরেশ্তাগণ তাহার জন্য মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে, সে আমার নিকট অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তাহার জন্য দশটি সওয়াব লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।" তিনি আরও বলেন, ঃ যে ব্যক্তি কিছু লিখিবার সময় আমার প্রতি দরূদ লিখে, যতদিন সেই লিখনে আমার নাম বিদ্যমান থাকে ততদিন ফেরেশ্তাগণ তাহার পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে।

ইস্তিগফার ঃ (ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা) হযরত ইব্নে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন ঃ "কুরআন শরীফে দুইখানা আয়াত আছে, গুনাহ্গার লোক এই দুই আয়াত পাঠ করতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার গুনাহ্ মাফ করা হয়। দুইখানা আয়াত এই–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ "আর যাহারা কোন মন্দ কাজ করে অথবা তাহাদের আত্মার উপর অত্যাচার করে, তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করিল। তৎপর নিজেকে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিল।"

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে অথবা নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করে, তৎপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী ও দয়াশীল পাইবে।" অন্যত্র আল্লাহ্ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ -

অর্থাৎ "অনন্তর আপনার প্রভুর প্রশংসা বর্ণনার সহিত তাঁহার তস্‌বীহ্ পাঠ করুন এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় বলিতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ “হে আল্লাহ্, তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর; অবশ্যই তুমি তওবা কবূলকারী করুণাময়।” রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “ যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে সে যে কোন কষ্টেই হউক না কেন, আনন্দ লাভ করিবে এবং এমন স্থান হইতে জীবিকা পাইবে যাহার কল্পনাও সে করে নাই।” তিনি বলেন ঃ “ আমি সমস্ত দিনে সত্তরবার তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি।” রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন এরূপ তওবা ইস্তিগফার করিতেন তখন অপর লোকেরা তো কোন সময়েই তওবা ইস্তিগফার হইতে বিরত থাকা উচিত নহে। তিনি আরও বলেন ঃ“ যে ব্যক্তি শয়নের সময়–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ -

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী।’ তিনবার পড়ে তাহার গুনাহ্ সমুদ্রের কোন ফেনাপুঞ্জ, মরুভূমির বালুকারাশি, বৃক্ষের পত্ররাজি এবং পৃথিবীর দিনসমূহের ন্যায় অসংখ্য হইলেও ক্ষমা করা হইবে।” তিনি আরও বলেন ঃ “পাপ করামাত্র যথারীতি পাক পবিত্র হইয়া দুই রাকআত নামায পড়িলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সে পাপ ক্ষমা করা হয়।’

দু‘আর আদব ঃ বিনয় ও বিলাপের সহিত দু‘আ করিলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “দু‘আ ইবাদতসমূহের মজ্জা ও সারাংশ।” কারণ, দাসত্বই ইবাদতের উদ্দেশ্য এবং বান্দা নিজের দীনতা ও অক্ষমতা উপলদ্ধি করা এবং আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যেই দাসত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। দু‘আর মধ্যে উভয় বিষয়ই নিহিত আছে। দু‘আর মধ্যে বিনয় ও বিলাপ যত অধিক হয় ততই ভাল। দু‘আ করিবার সময় আটটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। তাহা এই ঃ

প্রথম ঃ ফযীলতের সময় দু‘আ করিবার চেষ্টা করা। আরাফার দিন, রমযান শরীফের মাস, জুম‘আর দিন ,প্রাতঃকাল, রাত্রির। মধ্যভাগ ফযীলতের সময়। **দ্বিতীয়ঃ** ফযীলতের অবস্থার সময় দু‘আ করা; যেমন ধর্মযোদ্ধাগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইলে এবং ফরয নামাযের সময়। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এই সব সময়ে আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আযান ও

ইকামতের মধ্যবর্তীকালে , রোযা রাখা অবস্থায় এবং মন যখন খুব নরম থাকে, কেননা মন নরম হওয়া রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার লক্ষণ। তৃতীয় ঃ দুই হস্ত উঠাইয়া দু'আ করা এবং দু'আ শেষে উভয় হস্ত স্বীয় মুখের উপর স্থাপন করা। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,যে হস্ত আল্লাহ্‌র দরবারে তোলা হয় তাহা তিনি শুন্য অবস্থায় ফিরাইয়া দেন না। রাসূলে মাকবূল সাল্লল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি দু'আর জন্য হাত উঠায় সে তিনটি বিষয়ের কোন একটি হইতে বঞ্চিত হয় না-(ক) তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, (খ) সে সত্ত্বর কোন কিছু পাইবে অথবা (গ) তাহা ভবিষ্যতে পাইবে।" চতুর্থ ঃ দু'আ করিবার সময় ইহা কবুল হইবে কিনা, এরূপ সন্দেহ মনে না আনা। বরং একাগ্র মনে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, দু'আ অবশ্যই কবুল হইবে। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اُدْعُوْا اللّٰهَ وَ اَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالاِجَابَةِ -

অর্থাৎ "দু'আ কবুল হইবে, এই ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে দু'আ কর।" পঞ্চম ঃ বিনয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দু'আ করা এবং দু'আর বাক্যগুলি বারবার বলা। কারণ, হাদীসে আছে যে, অন্যমনস্ক হৃদয়ের দু'আ কবূল হয় না। ষষ্ঠঃ বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সহিত বারবার প্রার্থনা করিতে থাকা, ইহাতেই লাগিয়া থাকা এবং বিরত না হওয়া। বহুবার দু'আ করিলাম তথাপি কবুল হইল না। এরূপ বলা উচিত নহে। কারণ, দু'আ কবুল হওয়ার কোন্‌টি উত্তম সময় এবং কবুলের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। দু'আ কবুল হইলে ইহা বলা সুন্নত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَةِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

অর্থা "সেই আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা যাঁহার নিয়ামতের সহিত সববিধ মঙ্গল পূর্ণ হয়।" দু'আ কবুলে দেরী হইলে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

অর্থাৎ "সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা।" সপ্তম ঃ দু'আ করিবার পূর্বে তসবীহ ও দরূদ পাঠ করা। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আর পূর্বে বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِيِّ الْاَعْلٰى الْوَهَّابِ -

অর্থাৎ " আমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, উচ্চপদে উচ্চ এবং অত্যন্ত দাতা।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ " যে ব্যক্তি

দু'আর পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ে তাহার দু'আ কবুল হয়। আল্লাহ্‌ অত্যন্ত দয়ালু। দু'আর কিয়দংশ কবুল করিবেন এবং অংশ অগ্রাহ্য কিরবেন, এরূপ হয় না।" অর্থাৎ দরূদ সর্বদা কবুল হইয়া থাকে; সুতরাং দুরূদের সহিত অন্য দু'আরও অগ্রাহ্য হয় না। অষ্টম ঃ দু'আ করিবার পূর্বে তওবা করত পাপমুক্ত হওয়া এবং পাপ পথ পরিত্যাগ পূর্বক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়া। কারণ, অন্যমনস্কতা ও পাপ-কালিমার দরুনই অধিকাংশ দু'আ কবুল হয় না।

হযরত কাবুল আহবার (রা) বলেন ঃ বনি ইসরাঈলের যমানায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হযরত মূসা আলায়হিস সালাম তাহার সমস্ত উম্মত লইয়া তিনবার বৃষ্টির জন্য দু'আ করিলেন। কিন্তু দু'আ কবুল হইল না। অবশেষে ওহী অসিল ঃ হে মূসা, তোমার দলের মধ্যে একজন চোগলখোর আছে। সে তোমার দলের থাকাকালীন দু'আ কবুল হইবে না। হযরত মূসা আলায়হিসসালাম নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহ কোন্‌ ব্যক্তি বলুন, বাহির করিয়া দিব।" ওহী আসিল ঃ "আমি চোগলখোরী করিতে নিষেধ করি। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে চোগলখোরী করিব? হযরত মূসা আলায়হিস সালাম সকলকেই চোগলখোরী হইতে তওবা করিতে বলিলেন ঃ সকলেই তওাবা করিল, তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইল।" হযরত মালিক ইবনে দীনার (রা) বলেন ঃ "একবার বনি ইসরাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বৃষ্টিবর্ষণের দু'আর জন্য মানুষ কয়েকবার মাঠে একত্রিত হইল। কিন্তু তাহাদের দু'আ কবুল হইল না। তাহাদের নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ হইল ঃ "তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা অপবিত্র দেহে, হারাম খাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া এবং অত্যাচারের রক্তে রঞ্জিত হস্তে দু'আ করিতে আসিয়াছে। এই অবস্থায় (দু'আর জন্য) বহির্গত হওয়াতে তাহাদের উপর আমার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা আমার সম্মুখ হইতে দূর হউক।"

বিভিন্ন প্রকার দু'আ ঃ হাদীসে উক্ত যে সকল দু'আ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন এবং যাহা সকাল ও সন্ধ্যায় এবং বিভিন্ন নামাযের পর বিভিন্ন সময় পড়া সুন্নত এরূপ দু'আ বহু আছে। এই সকলের অধিকাংশগুলিই 'ইয়াহুইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট দু'আ 'বিদায়াতুল হিদায়াহ্‌' কিতাবে সংগৃহীত হইয়াছে। আগ্রহশীল ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে শিখিয়া লইতে পারে। তৎসমুদয় এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলে কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। আবার তন্মধ্যে অনেক দু'আ মাশহুর এবং সকলেরই জানা আছে। কতিপয় দু'আ এমন আছে যাহা বিপদাপদে ও বিভিন্ন ব্যাপারে পাঠ করা সুন্নত অথচ অল্পলোকেই উহা অবগত আছে। এরূপ দু'আগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। অর্থসহ শিখিয়া যথাসময়ে সূরাগুলি পড়া উচিত। কারণ, কোন সময়ই আল্লাহ্‌র যিকির হতে উদাসীন থাকা উচিত নহে এবং অন্তরকে দীনতা ও দু'আ শূন্য রাখা সঙ্গত নহে।

গৃহ হইতে বাহির সময় পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নামে ঘর হইতে বাহির হইতেছি। হে প্রভু, তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যেন আমি কাহাকেও পথভ্রষ্ট না করি, আমি যেন কাহারও উপর অত্যাচার না করি বা আমি যেন কাহারও কর্তৃক অত্যাচারিত না হই। আমি যেন কাহাকেও কষ্ট না দেই অথবা কাহারও দ্বারা কষ্টপ্রাপ্ত না হই। দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ ব্যতীত আমার মনোবল বা দৈহিক শক্তি কিছুই নাই। আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করিতেছি।"

মসজিদে প্রবেশের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে আল্লাহ্, আমার গুনাহ্ মাফ কর এবং তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য উন্মুক্ত কর।" মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা অগ্রে রাখিবে।

মন্দ বাক্যালাপ হয় এমন মজলিসে বসিলে ইহার কাফ্‌ফারা -স্বরূপ পড়িবে।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءً وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

অর্থাৎ " হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নাই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তওবা করিতেছি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতেছি। আমি মন্দ কাজ করিয়াছি এবং আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অপর কেহই পাপ ক্ষমা করিতে পারে না।

বাজারে যাওয়ার সময় পড়িবে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক , তাঁহার কোন শরীক নাই। বিশ্বজগতের প্রভুত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন ও প্রাণ সংহার করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মারিবেন না। মঙ্গল তাঁহারই হস্তে এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।"

নুতন পোশাক পরিধানকালে পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَسَوْتَنِىْ هٰذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ ـ

অর্থাঃ "হে আল্লাহ্‌, তুমি আমাকে এই পোষাক পরিধান করাইয়াছ। অতএব তোমারই সকল প্রশংসা। এই পোশাকের মঙ্গল ও যত মঙ্গল ইহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং সৃষ্ট অমঙ্গল ও যত অমঙ্গল ইহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয় হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।"

নূতন চাঁদ দেখিবার সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْاِيْمَانِ وَ السَّلاَمَةِ وَالاِسْلاَمِ رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌ ইহার উদয় আমাদের উপর এমন করুন যেন আমরা নিরাপদে ঈমান লইয়া শান্তির সহিত ইসলাম ধর্মে জীবন-যাপন করিতে পারি। (হে চন্দ্র) আল্লাহ্‌ আমার ও তোমার প্রভু।"

ঝড়-তুফানের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الرِّيْحِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَشَرِّ مَافِيهَا وَشَرِّمَا اَرْسَلْتَ بِهٖ ـ

অর্থাৎ " হে আল্লাহ, এই ঝড়ের মঙ্গল, যে মঙ্গল ইহার মধ্যে নিহিত আছে এবং যে মঙ্গল তুমি ইহার সঙ্গে করিয়াছ সে সমস্ত আমি তোমার নিকট চাহিতেছি। আর এই ঝড়ের অমঙ্গল ইহার মধ্যে আছে এবং যতক অমঙ্গল তুমি ইহার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছ, সে সমস্ত হইতে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

কাহার ও মৃত্যু সংবাদ শুনিলে পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ

অর্থাৎ " সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি; যিনি কখনও মরিবেন না। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্ আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব।"

দান করিবার সময় বলিবে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ "হে প্রভু, আমাদের নিকট হইতে কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।"

কোন ক্ষতি হইলে পড়িবে ঃ

عَسٰى رَبَّنَا اَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "অচিরেই আমাদের প্রভু এই ক্ষতির পরিবর্তে আমাদিগকে কোন মঙ্গল দান করিবেন। অবশ্যই আমাদের প্রভুর প্রতি আমরা অনুরাগী।"

নূতন কাজ আরম্ভ করিবার সময় বলিবে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ

অর্থাৎ ঃ "হে প্রভু, আমাদিগকে তোমার খাস রহমত দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজের সঠিক আয়োজন করিয়া দাও।"

আস্‌মানের দিকে দৃষ্টি পড়িলে বলিবে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تَبَارَكَ الَّذِىْ
جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থাৎ "হে প্রভু, ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। অনন্তর আমাদিগকে দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই আল্লাহ্ মুবারক হউক যিনি আস্‌মানের কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে অতি উজ্জ্বল সূর্য ও প্রদীপ্ত চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

বজ্র-ধ্বনি শুনিলে বলিবে ঃ

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ ـ

অর্থাৎ " সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যাঁহার প্রশংসার সহিত রা'দ (নামক ফেরেশতা বা বজ্র-ধ্বনি) তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে এবং ফেরেশতাগণ যাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত রহিয়াছে।"

বিদ্যুত চমকাইলে বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ و عَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌, তোমার ক্রোধ দ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিও না এবং তোমার আযাব দ্বারা আমাদিগকে ধ্বংস করিও না। আর উহার পূর্বে আমাদিগকে নিরাপদে রাখ।"

বৃষ্টি বর্ষণের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلَهُ سُقِيَا هَنِيًا وَّصَبًّا نَافِعًا وَاجْعَلْهُ رَحْمَتِكً وَّلاَ تَجْعَلْهُ سَبَبَ عَذَابِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ , এই বৃষ্টিকে তৃপ্তিদায়ক পানীয় ও হিতকর বষর্ণ রূপে পরিণত কর এবং ইহাকে তোমার উপকরণ বানাও ইহাকে তোমার আযাবের কারণস্বরূপ করিও না।"

ক্রোধের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَ اذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَ اَجِرْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমার গুনাহ্ মাফ কর ও আমার অন্তরের ক্রোধ দূর কর এবং বিতাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা কর।"

কাহারও দ্বারা ক্ষতির আশংকা থাকিলে বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَ نَدْرَءُ بِكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তাহাদের অনিষ্ট হইতে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার সাহায্যে আমরা তাহাদের অনিষ্ট নিবারণ করিতেছি।"

শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে ঃ

বেদনা-স্থলে হাত রাখিয়া তিনবার বলিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

এবং সাতবার বলিবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ -

অর্থাৎ "আমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছি এবং আমি যাহা ভয় করিতেছি উহার অনিষ্ট হইতে আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার অসীম ক্ষমতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

দুঃখ-কষ্টে পতিত হইলে বলিবে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

অর্থাৎ "উচ্চাদপি উচ্চ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, আকাশসমূহের অধিপতি ও গৌরবান্বিত আরশের অধিপতি ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই।

কোন কাজ সমাধা করিতে অক্ষম হইলে পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىْ حُكْمُكَ نَافِذٌ فِىْ قَضَائِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ وَاَعْطَيْنَا اَحَدًا مَنْ خَلْقِكَ اَوِسْتَاثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ يَّجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَ جِلاَءَ غَمِّىْ وَذَهَابَ حُزْنِىْ وَ هَمِّىْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর সন্তান। আমার ললাট তোমার হাতে। তোমার নির্দেশ আমার উপর চালু তোমার বিধান আমার উপর প্রচলিত। আমি তোমার প্রতিটি নামের উসিলায়, যে নামে তুমি তোমার নামকরণ করিয়াছ ও যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করিয়াছ এবং যে নাম তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছ

অথবা তোমার নিকটে তোমার গায়েবী ইলমের মধ্যে যে নামকে তুমি প্রাধান্য দান করিয়াছ, প্রার্থনা করিতেছি যে, কুরআনকে আমার হৃদয়ের আনন্দ, আমার বক্ষের নূর, আমার চিন্তা মোচনকারী এবং আমার দুঃখ-কষ্ট বিদূরণকারী বানাও।"

আয়নাতে মুখ দেখিবার সময় বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقْتَنِىْ فَاَحْسَنَ خَلَقْنِىْ وَ صَوَّرَنِىْ فَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ -

অর্থাৎ "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন ও আমার গঠন সুন্দর করিয়াছেন এবং আমাকে আকৃতিমান করিয়াছেন ও আমার আকৃতি সুশ্রী করিয়াছেন।"

গোলাম খরিদের সময় তাহার মাথার চুল ধরিয়া বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَ خَيْرَ مَا حُبِلَ عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّمَا حُبِلَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, এই দাসের মঙ্গল ও ইহার প্রাপ্ত স্বভাবের মঙ্গল আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং এই দাসের অনিষ্ট হইতে এবং ইহার প্রাপ্ত স্বভাবের অনিষ্ট হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শয়নের সময় বলিবে ঃ

رَبِّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَ بِاسْمِكَ اَرْفَعُهٗ هٰذِهٖ نَفْسِىْ اَنْتَ تَتَوَفَّهَالَكَ مَحْيَاهَا وَمَمَتَهَا اَنْ اَمْسَكْتَهَا فَاغْفِرْلَهَا وَ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌, তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ শয্যায় স্থাপন করিলাম এবং তোমার নামেই ইহা উঠাইবে। এই আমার জীবন, তুমিই ইহা সংহার করিবে। তোমারই জন্য জীবন ও মৃত্যু। তুমি যদি ইহাকে আবদ্ধ কর (অর্থাৎ প্রাণ সংহার কর) তবে ইহার সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ কর। আর যদি ইহাকে ফিরাইয়া দাও (অর্থাৎ নিদ্রা হইতে সজাগ কর) তবে তুমি যেরূপভাবে তোমার পুণ্যবান বান্দাগণের হিফাজত করিয়াছ তদ্রূপ ইহারও হিফাজত কর।"

জাগ্রত হইয়া বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالسُّلْطَانُ وَالْعَظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلّٰهِ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الاِخْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি মৃত্যুর পরে আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাঁহারই সমীপে সমবেত হইব।আমরা ও সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্র জন্যই প্রভাতে উপনীত হইল। এক আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রভুত্ব ও মহত্ত্ব ও সমস্ত মর্যাদা ও ক্ষমতা শুধু আল্লাহ্রই। আমরা প্রভাতে উপনীত হইলাম ইসলামী প্রকৃতি ও অকপট বাণীর উপর এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ধর্মের উপর ও হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ধর্মের উপর যিনি সকল ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি অংশীবাদী ছিলেন না।"

দশম অধ্যায়

ওযীফার তরতীব

জীবন বাণিজ্যের মূলধন পরমায়ু ঃ দর্শন-খণ্ডে বর্ণিত বিষয় হইতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে বাণিজ্য উপলক্ষে জলস্থলময় জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্ম-উচ্চ জগতের পদার্থ–উচ্চ জগত হইতেই ইহা আসিয়াছে এবং তথায়ই ফিরিয়া যাইবে। এই বাণিজ্যের মূলধন একমাত্র তাহার পরমায়ু এবং মূলধন সর্বদা হ্রাস পাইতেছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে লাভ করিতে না পারিলে মূলধন বৃথা অপচয় হইয়া যাইবে। এইজন্য আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الاية -

অর্থাৎ " আসরের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল লোক ক্ষতির মধ্যে নহে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও পরস্পরে সবরের পরামর্শ দান করিয়াছে।" মানবের পরমায়ুকে এমন ব্যক্তির অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাহার মূলধন বরফ যাহা সে গ্রীষ্মের সময় বিক্রয় করে।সে লোকদিগকে ডাকিয়া বলে, "মুসলমান ভাইগণ, তোমরা এমন ব্যক্তির দয়া কর যাহার মূলধন গলনশীল, পলে পলে গলিয়া যাইতেছে।" মানুষের পরমায়ুরূপে মুলধন ও তদ্রুপ সর্বদা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। পরমায়ু নিদিষ্ট কতকগুলি শ্বাস–প্রশ্বাসমাত্র।

ইহার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই অবগত আছেন।

পরমায়ুর সদ্ব্যহার ঃ অনাগত ভীতি ও পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি শ্বাস -প্রশ্বাসকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে এবং প্রতিটি মুহূর্তকে অনন্তকাল স্থায়ী সৌভাগ্য লাভের উপযোগী অমূল্য রত্ন বলিয়া মনে কের। বরং এরূপ ব্যক্তি স্বর্ণাদি মুলধন অপেক্ষা প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের অধিক যত্ন ও মমতা করিয়া থাকে। এই মমতার কারণে সেদিবারাত্রের সময়টুকু বিভিন্ন প্রকারের সৎকার্যের জন্য বিভক্ত করত প্রত্যেক কার্যের নিমিত্ত পৃথক পৃথক সময় নিদিষ্ট করিয়া লয় এবং যথারীতি নিধারিত

অযীফাসমূহ আদায় করিতে থাকে যেন তাহার এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না হয়। কারণ সে জানে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ লইয়া ইহজগত পরিত্যাগ করিবে কেবল সে-ই পরকালের সৌভাগ্যের বীজ এবং যিকির ও ধ্যান-ধারণার জন্য অবসর লাভের উদ্দেশ্যই সংসার বর্জন, ইন্দ্রিয় দমন ও পাপ পরিহার করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অবিরত যিকিরের পন্থা ঃ ইহার দুইটি পন্থা আছে।

প্রথম ঃ সর্বদা অন্তরে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলিতে থাকা, রসনা দ্বারা নহে। এমনকি অন্তর দ্বারাও বলিবে না। কারণ, অন্তর দ্বারা বলিলেও ইহা ইন্দ্রিয়ের কার্য বলিয়াই পরিগণিত। বরং এক মুহূর্তও অন্যমনস্ক না হইয়া অভ্যন্তরীণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে থাকা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া বড় দুষ্কর এবং মনকে সর্বদা এক অবস্থায় নিবদ্ধ রাখিতে গিয়া অনেকেই হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দ হারাইয়া ফেলে ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। এই জন্যই বিভিন্ন প্রকারের ওযীফা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

কতক কাজ সমস্ত শরীর দ্বারা করিতে হয়, যেমন সালাত। কতক কাজ কেবল রসনা দ্বারা সম্পন্ন হয়,যেমন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও তসবীহ্ তাহলীল পাঠ। আবার কতগুলি কাজ শুধু হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে, যেমন ধ্যান-ধারণা ও সৎ চিন্তা। এইরূপে বিভিন্ন ইবাদত করিলে মনে আনন্দ বিনষ্ট হয় না। কারণ, সময় বিভাগের শৃঙ্খলা অনুযায়ী নূতন কাজে লিপ্ত হইলে মন এক অবস্থা হইত অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করে। অপর দিকে দুনিয়ার জরুরী কার্যে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয় তাহাতেও পার্থক্য দেখা যায়।

দ্বিতীয় ঃ ফলকথা, সম্পূর্ণ সময় পরকালের কার্যে ব্যয় করিতে না পারিলে অধিকাংশ সময় কার্যে ব্যয় আবশ্যক যেন পরকালে নেকের পাল্লা ভারী হয়। অর্ধেক সময় দুনিয়ার কাজ ও অর্ধেক সময় পরকালের কাজে ব্যয় করিলে পাপের পাল্লা ভারী হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা। কারণ, প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজেই মন অধিক আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে ধর্ম-কার্যে মনসংযোগ করা প্রকৃতি বিরোধী এবং অকপটভাবে ধর্ম কর্ম করা বড় দুষ্কর। যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয় না তাহা নিস্ফল। সুতরাং ইবাদত অধিক পরিমাণে করা উচিত। তাহা হইলে কোন একটি ইখলাসের সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ সময় ধর্ম-কার্যে লিপ্ত থাকা আবশ্যক এবং দুনিয়ার কাজ কর্ম ধর্ম কর্মের অধীনে রাখা উচিত। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন—

وَمِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى -

অর্থাৎ "আর রাত্রির কিছু অংশে তসবীহ্ পাঠ করুন এবং দিবসের বিভিন্ন অংশেরও যেন আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন।" আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন–

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْلَهٗ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً -

অর্থাৎ "আর আপনার প্রভুর নাম সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন এবং রাত্রে তাঁহার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন ও দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া তাঁহার তসবীহ্ পাঠ করুন।" তিনি আরও বলেন–

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ -

অর্থাৎ "তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই শয়ন করে।" এই সকল আয়াত হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র যিকিরে অতিবাহিত করা উচিত। সময়-বিভাগপূর্বক নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত যিকির না করিলে অধিকাংশ সময় যিকির অতিবাহিত করা যায় না। এজন্যই সময়-বিভাগের বর্ণনা জরুরী।

দিবাভাগের অযীফা ঃ দিবাভাগের অযীফা পাঁচটি। প্রথমটির সময় সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এই সময়ের বরকত ও শ্রেষ্ঠত্ব এত অধিক যে, আল্লাহ্ শপথের সহিত ইহার স্মরণ করত বলেন–

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ -

অর্থাৎ " প্রাতঃকালের শপথ যখন সে নিঃশ্বাস ফেলে।"

আবার বলেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -

অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَالِقُ الاِصْبَاحِ -

অর্থাৎ "উষা বিদীর্ণকারী।" এই সকল আয়াতে সুবহে সাদিক হইত সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এ সময়টুকু প্রতি মুহূর্ত অতি যত্নের সহিত আল্লাহ্র যিকিরে অতিবাহিত করা উচিত।

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

এই দু'আ শেষ পর্যন্ত পড়িবে। (পূর্ণ দু'আ অর্থসহ নবম অধ্যায়ের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। তৎপর কাপড় পরিধানপূর্বক আলোচিত যিকির ও দু'আ পাঠে প্রবৃত্ত হইবে। বস্ত্র পরিধানকালে লজ্জাস্থান আবৃত ও আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের নিয়ত করিবে। মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে ও অপরের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বস্ত্র পরিধান করিবে না। এইরূপ ইচ্ছাকে সভয়ে পরিত্যাগ করিবে। তৎপর পায়খানায় যাইবে। পায়খানায় যাইবার সময় প্রথমে বাম পা ভিতরে প্রবেশ করাইবে। পায়খানা হইতে বাহির হইয়া পূর্বে লিখিত দু'আ পাঠ ও যিকির করিতে মিসওয়াক ও ওযূ করিবে। তৎপর ফজরের সুন্নত নামায গৃহে পড়িয়া মসজিদে যাইবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরূপই করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দু'আ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সুন্নতের পরেই পড়িবে। 'বিদায়াতুল হিদায়া' কিতাবে এই দু'আ লিখিত আছে; মুখস্থ করিয়া লইবে। গৃহ হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে মসজিদে যাইবে এবং ডান পা মসজিদে স্থাপন করিতে করিতে মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়িবে। জামাআতে প্রথম সারিতে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। সুন্নত নামায গৃহে পড়িয়া না থাকিলে এই সময় পড়িয়া লইবে। গৃহে সুন্নত নামায পড়িয়া থাকিলে দুই রাকআত 'তাহিয়াতুল মসজিদ' নামায পড়িবে এবং জামাআতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে। এই সময় তস্‌বীহ ও ইস্তেগফার পাঠে লিপ্ত থাকিবে। জামা'আতে ফরয পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসিয়া যিকিরে মগ্ন থাকিবে। কারণ, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসিয়া থাকাকে আমি চারিটি গোলাম আযাদ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি।

ফজরের পর সুর্যোদয় পর্যন্ত কার্য ঃ এই সময়ে চারিটি কার্য, যথা ঃ (১) দু'আ (২) তসবীহ, (৩) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, (৪) আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকা।

ফজরের নামাযের সালাম ফিরাইয়া এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ

مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ

السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎঃ "হে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ্, তুমিই শান্তি, তোমা হইতেই শান্তি এবং শান্তি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিবে। প্রভু, শান্তির সহিত আমাদিগকে জীবিত রাখ এবং আমাদিগকে শান্তির আলোতে বেহেশ্তে প্রবেশ করাও। হে প্রবল প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি, তুমি অতীব মঙ্গলময়।' তৎপর এই সময়ে পড়িবার জন্য হাদীসে যে সকল দু'আ আছে উহা পড়িতে থাকিবে। দু'আসমূহ কিতাব দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইবে।

দু'আ পড়িয়া তসবীহ-তাহলীল পড়িতে থাকিবে। প্রত্যেকটি একশত বার, সত্তর বার কিংবা অন্ততপক্ষে দশবার পড়িবে। দশটি যিকির দশবার করিয়া পড়িলে মোট একশত বার হয়। ইহার কম করা উচিত নহে। নিম্নলিখিত দশটি যিকিরের ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস আছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেগুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

প্রথম যিকির ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر -

(নবম অধ্যায়ে শেষাংশে দ্রষ্টব্য।)

দ্বিতীয় যিকির ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنَ -

অর্থাৎ " আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনার উপযোগী অপর কেহই নাই। তিনি সত্য ও সুস্পষ্ট প্রভু।"

তৃতীয় যিকির

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ " আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মানবিক শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতা নাই।"

চতুর্থ যিকির ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ـ

পঞ্চম যিকির ঃ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

অর্থাৎ "তিনি পবিত্র বিশুদ্ধ। তিনি আমাদের প্রভু এবং সকর ফেরেশতা ও জিবরাঈল (আ)-এর প্রভু।

ষষ্ঠ যিকির ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ ـ

অর্থাৎ "সেই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তারই নিকট তওবার তওফীক প্রার্থনা করিতেছি।"

সপ্তম যিকির ঃ

يَا حَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طُرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ ـ

অর্থাৎ "হে চিরস্থায়ী,তোমার রহমত দ্বারা সাহায্য ফরিয়াদ করিতেছি, এক পলকের জন্যও আমাকে প্রবৃত্তির নিকট ছাড়িয়া দিও না এবং আমার যাবতীয় কর্ম সংশোধন করিয়া দাও।"

অষ্টম যিকির ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىْ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ তুমি যাহা দান কর,তাহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই, আর যাহা তুমি বারণ কর তাহা প্রদানকারী কেহই নাই। তোমা ব্যতীত কেহই সম্পদশালীর উপকার করিতে পারে না। তোমা হইতে সম্পদ আগমন করে।"

নবম যিকির ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

অর্থাৎ " হে আল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ, সন্তানসন্ততির উপর রহমত বর্ষণ কর।"

দশম যিকির ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অর্থাৎ " আমি সেই আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি যাহার নামের সহিত কোন পদার্থই কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না ভূতলেও না এবং আসমানেও না এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।"

উল্লিখিত দশ যিকিরের প্রত্যেকটি দশবার করিয়া পড়িবে কিংবা যতবার করিয়া পার পড়িবে। প্রত্যেকটির ফযীলত পৃথক পৃথক এবং মাধুর্যও ভিন্ন ভিন্ন।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ঃ ইহার পর কুরআন শরীফ পাঠে লিপ্ত হইবে। কুরআন শরীফ পাঠে অক্ষম হইলে এই নির্বাচিত অংশগুলি মুখস্থ করিয়া লইবে এবং রীতিমত পাঠ করিবে-'আয়তুল কুরসী', 'আমানার রাসূল' হইতে আরম্ভ করিয়া সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত, সূরা আলে-ইমরানের 'শাহিদাল্লাহু' হইতে আরম্ভ করত 'ওয়াল্লাহ বাসীরুম বিল্ ইবাদ' পর্যন্ত আলে-ইমরানের 'কুলিল্লাহুমা মালিকাল মুলকি' হইতে আরম্ভ করত 'ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পর্যন্ত হাদীসের প্রথম অংশ এবং সূরা হাশরের শেষ অংশ। যিকির, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত দু'আ এই তিন বস্তুর সমাবেশ একত্রে পাইতে ইচ্ছা করিলে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহীম তাইমী (র)-কে যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিবে। উহার ফযীলত অপরিসীম; ইহাকে মুসাব্বাআ'তে আশারা বলে। উহাতে দশটি বস্তু আছে, প্রত্যেকটি সাতবার করিয়া পড়িতে হয়। উহা এই-(১) সূরা ফাতিহা, (২) সূরা ফালাক,(৩) সূরা নাস, (৪) সূরা ইখলাস, (৫) সূরা কাফিরুন, (৬) আয়াতুল কুরসী। কুরআন শরীফের এই ছয় বস্তু। অবশিষ্ট চারিটি যিকির জাতীয় যথা ঃ

(৭) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(৮) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ

(৯) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ সমস্ত মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা কর।"

(১০)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَافْعَلْ لِىْ وَ بِهِمْ عَاجِلاً وَّاٰجِلاً فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلَ وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلاَنَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٍ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা কর এবং তুমি শীঘ্র ও বিলম্বে, দুনিয়াতে ও আখিরাতে আমার ও তাহাদের প্রতি এমন ব্যবহার কর যাহার তুমি উপযুক্ত। আমরা যাহার উপযুক্ত এমন আচরণ আমাদের প্রতি করিও না। অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু।" এই মুসাব্বাআতে আশারার ফযীলত সম্বন্ধে 'ইয়াহইয়াউল উলূম" গ্রন্থে একটি বড় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ঃ

আল্লাহ্র ধ্যান ও সৎচিন্তা ঃ উল্লিখিত যিকির ও দু'আ সমাধা করত আল্লাহ্র ধ্যান ও সৎচিন্তায় (তাফাক্কুরে) লিপ্ত হও। ইহা বিভিন্ন প্রণালীতে করা চলে। এই গ্রন্থের শেষ ভাগে পরিত্রাণ খণ্ডে উহার আলোচনা হইবে। কিন্তু প্রত্যহ যেরূপ ধ্যান করা আবশ্যক তাহা এই—চিন্তা করিবে যে, আমরা মৃত্যু ও পরকালের দিকে অগ্রসর হইতেছি এবং মনে মনে বলিবে যে, হয়ত মৃত্যু ঘটিতে একদিনের অধিক বিলম্ব নাই। এরূপ চিন্তার উপকারিতা অত্যধিক। কারণ, দীর্ঘ জীবনের আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় বলিয়াই মানুষ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, এক মাস বা এক বৎসরের মধ্যে অবশ্যই মরিতে হইবে সে নিশ্চয়ই পার্থিব সমস্ত কাজকর্ম বর্জন করিবে। অথচ একদিনের মধ্যে মরিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তথাপি মানুষ এমন এমন কাজে হাত দেয় যাহা দশ বৎসরে সামাধা হয় না। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ وَاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ -

অর্থাৎ "তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না এবং সে সকল বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন? আর (এ বিষয়ের প্রতি) লক্ষ্য

করিতেছে না যে, সম্ভবত তাহাদের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে?" অন্তর নির্মল করত এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে পরলোকের সম্বল সংগ্রহের স্পৃহা অবশ্যই মনে প্রবল হইয়া উঠে।

অধিকন্তু এইরূপ চিন্তা করা উচিত–অদ্যকার দিনে কি পরিমাণ সওয়াব লাভ করা যাইতে পারে? কোন্ কোন্ গুনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে? গত জীবনে কি কি গুনাহ্ সংঘটিত হইয়াছে যাহার ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক? এই সব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। তাঁহাদের অন্তরচক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছে তাঁহারা আসমান ও পৃথিবীর রাজ্যসমূহ এবং উহাদের বিস্ময়কর বিষয়গুলির প্রতি অনুধাবন করিবেন। এমনকি সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য দর্শন করিবেন। শেষোক্ত ধ্যান ও চিন্তা সর্ববিধ ইবাদত ও চিন্তা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ইহা হইতেই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে তৎপ্রতি মহব্বত প্রবল হইয়া উঠে না; আর চরম মহব্বতের বিনিময়ে পরম সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু সকলের অন্তরচক্ষু উন্মুক্ত হয় না। এমতাবস্থায় যে-সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ্ আমাদিগকে দান করিয়াছেন তৎসমুদয় স্মরণ করিবে এবং মানুষ দুনিয়াতে যে সকল পীড়া, দারিদ্র ইত্যাদি নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত রহিয়াছে উহা হইতে আল্লাহ্ যে তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমার কর্তব্য। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া চলিলে এবং পাপ হইতে বিরত থাকিলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল।

মোটকথা, প্রাতঃকালে এইরূপ ধ্যান ও চিন্তায় কাটাইবে। কারণ, সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফজরের সুন্নত এবং ফরয ব্যতীত অন্য নামায জায়েয নহে। সুতরাং এই সময়ে নফল নামাযের পরিবর্তে যিকির ধ্যানে মগ্ন থাকিবে।

দিবসের দ্বিতীয় ভাগ ঃ সূর্যোদয় হইতে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত সময় এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভব হইলে সূর্য এক বল্লম ঊর্দ্ধে না উঠা পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করিবে এবং তসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকিবে। সূর্য এক বল্লম উপরে উঠিলে দুই রাকআত নফল নামায পড়িবে। তৎপর সূর্য আরও উপরে উঠিলে চাশতের নামায পড়া উত্তম। এই নামায চার, ছয় বা আট রাকআত পড়িবে। এই সবগুলিই কিতাবে বর্ণিত আছে। অথবা সূর্য এক বল্লম উপরে উঠিলে দুই রাকআত নামায পড়িয়া মানবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নেক কার্যসমূহে লিপ্ত হইবে; যেমন, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে কবরস্তানে গমন করা, মুসলমানদের উপকার করা, আলিমগণের দীনি মজলিসে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি।

দিবসের তৃতীয় ভাগ ঃ চাশতের সময় হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। লোকের অবস্থাভেদে এই সময়টুকু ব্যয়ের বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর বহির্ভূত কেহই হইতে পারে না।

প্রথম ঃ ইল্‌ম শিক্ষা করিতে যে ব্যক্তি সক্ষম তাহার জন্য এই সময়ে ইল্‌ম শিক্ষা করা অপেক্ষা অন্য কোন ইবাদতই উৎকৃষ্ট নহে। এমনকি বিদ্যা শিক্ষার্থীকে ফজরের নামায পড়িয়াই বিদ্যা শিক্ষায় লিপ্ত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, একমাত্র পরকালের পক্ষে মঙ্গলজনক বিদ্যাই উৎকৃষ্ট। যে বিদ্যা দুনিয়ার আসক্তি শিথিল করত পরকালের আসক্তি প্রবল করিয়া তোলে এবং ইবাদত-কার্যে যে সকল দোষত্রুটি সংঘটিত হয় তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়া আন্তরিকতার সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই পরকালের পক্ষে মঙ্গলজনক বিদ্যা। কিন্তু তর্কশাস্ত্র যাহা পরস্পর ঝগড়া-বিরোধ ও ক্রোধ শিক্ষা দেয় এবং ইতিবৃত্ত ও কিচ্ছা-কাহিনী যাহা রচনা চাতুর্য ও অলঙ্কারাদি ভাষায় পরিপূর্ণ, তৎসমুদয় দুনিয়ার লোভ অধিকতর বৃদ্ধি করে এবং গর্ব ও হিংসার বীজ অন্তরে বপন করে। হিতকর বিদ্যা 'ইয়াহইয়াউল উলুম', 'জাওয়াহেরুল কুরআন' এবং এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সকল বিদ্যার পূর্বে এই বিদ্যা অর্জন করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় ঃ যাঁহারা বিদ্যা অর্জনে অক্ষম, কিন্তু যিকির তাসবীহ্ ও ইবাদত কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন। এই প্রকার লোক আবেদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মর্যাদা অতি উচ্চ। বিশেষত তাঁহারা যদি এমন যিকিরে লিপ্ত থাকিতে পারেন যাহার প্রভাব অন্তরে প্রাধান্য লাভ করে এবং অন্তরে স্থান লাভপূর্বক স্থায়ী হইয়া পড়ে তবে তাঁহাদের মর্যাদা আরও উর্ধ্বে।

তৃতীয় ঃ যাহা অপর লোকের সুখবর্ধক ও আরামদায়ক কার্যে লিপ্ত। সূফী দরবেশ আলিম ও অভাবগ্রস্তদের সেবা করা এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা নফল নামায অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, ইহা স্বয়ং ইবাদত এবং ইহাতে মুসলমানদের সুখ লাভ করে ও ঐ সকল ব্যক্তির ইবাদতের কার্যে সহায়তা করা হয়। এই শ্রেণীর লোকের দু'আ অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে।

চতুর্থ ঃ যাহারা উপরোক্ত তিন প্রকার কার্যে অক্ষম এবং নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা অর্জনে লিপ্ত, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর লোক যদি আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তাহাদের হস্ত ও রসনা দ্বারা অপর লোকের কোন অনিষ্ট না করে, দুনিয়ার লোভ অতিরিক্ত উপার্জনে তাহাদিগকে লিপ্ত না করে এবং নিজেদের অভাব মোচন উপযোগী জীবিকায় হৃষ্টচিত্তে তৃপ্ত থাকিতে পারে, তবে

তাহারা পূর্ববর্তী আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের সমপর্যায়ভুক্ত না হইলেও সাধারণ শ্রেণীর আবেদগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কিয়ামত দিবস যাহাদের আমলনামা তাহাদের ডান হস্তে প্রদান করা হইবে তাহারা তাদের দলভুক্ত হইবে।

যাহারা ডান হস্তে আমলনামা পাইয়া মুক্তিলাভ করিবে অন্তত তাহাদের দলভুক্ত হওয়া আবশ্য কর্তব্য। ইহাই সর্বনিম্ন শ্রেণী। যে ব্যক্তি উল্লিখিত চারি প্রকারের কোন এক শ্রেণীর লোকের ন্যায় সময় ব্যয় না করিবে সে অবশ্যই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত ও শয়তানের অনুসরণকারী গোলাম বলিয়া গণ্য হইবে।

দিবসের চতুর্থ ভাগ ঃ দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পর হইতে আসরের পূর্ব পর্যন্ত। জোহরের সময় হওয়ার পূর্বে শয়ন করত সামান্য বিশ্রাম করিয়া লওয়া উচিত। কারণ রাত্রিকালে ইবাদতের জন্য ইহা রোযার জন্য সেহরীতুল্য। রাত্রে ইবাদত না করিলে দ্বিপ্রহরে নিদ্রা মাকরূহ। কেননা অতিরিক্ত নিদ্রা মাকরূহ। দ্বিপ্রহরের সামান্য নিদ্রার পর জোহরের সময়ের পূর্বে প্রয়োজনীয় ওযূ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবে এবং আযানের পূর্বে মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করিবে। মসজিদে পৌঁছিয়া 'দুখলুল মসজিদ' নামায পড়িবে। মুয়ায্যিন আযান আরম্ভ করিলে ইহার জওয়াব দিবে। ফরযের পূর্বে চারি রাকাআত নামায অধিক সময় লাগাইয়া পড়িবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই চারি রাকআত অধিক লম্বা করিয়া পড়িতেন এবং বলিতেন যে, এই সময় আসমানের দরজা উন্মুক্ত থাকে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই চারি রাকআত নামায পড়ে, সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার সহিত নামায পড়িতে থাকে এবং রাত্রি পর্যন্ত সেই নামাযীর মুক্তির জন্য দু'আ করিতে থাকে। তৎপর জামা'আতের সহিত ফরয নামায পড়িবে এবং ইহার পর দুই রাকআত সুন্নত পড়িবে। অতঃপর আসরের পূর্বে পর্যন্ত ইল্ম শিক্ষা দানে, মুসলমানদের সাহায্যের কার্যে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে অথবা জরুরী অভাব মোচনের জন্য হালাল জীবিকা অর্জনে মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইবে না।

দিবসের পঞ্চম ভাগ ঃ আসরের সময় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আসরের সময় হওয়া মাত্র মসজিদে যাইয়া চারি রাকআত সুন্নত নামায পড়িবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আসরের ফরযের পূর্বে যে ব্যক্তি চারি রাকআত নামায পড়ে তাহার উপর আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেন।' আসরের ফরয পড়ার পর পূর্ব বর্ণিত কাজগুলি ব্যতীত অন্য কোন সাংসারিক কাজে লিপ্ত হইবে না। তৎপর মাগরিবের নামাযের পূর্বে মসজিদে যাইবে এবং তসবীহ ও ইস্তেগফার পাঠে মগ্ন থাকিবে। কেননা, এই সময়ের ফযীলত সুবহে সাদিকের সময়ের ফযীলতের সমতুল্য। কারণ. আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا -

অর্থাৎ "সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসার সহিত তসবীহ্ পাঠ করো। এসময়ে সূরা ওয়াশ-শাম্‌স, সূরা ওয়াল-লাইল, সূরা ফালাক ও সূরা নাস' পাঠ করা উচিত। সূর্যাস্তের সময়ে ইস্তেগফার পাঠে রত থাকা আবশ্যক।

ফলকথা, যাহার জীবনে প্রত্যেকটি দিবস যথোপযুক্তরূপে বিভক্ত হইয়া প্রতিটি অংশ যথানিয়মে সময়োপযোগী নেক কার্যে ব্যয়িত হয় তাহার জীবনের সদ্ব্যবহার হয় এবং জীবন মঙ্গলময় হইয়া উঠে। অপরপক্ষে যাহার সময়-শৃঙ্খলা নাই এবং ঘটনাচক্রে যাহা হয় তাহাই করিতে থাকে, তাহার জীবনের বহু সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

রাত্রিকাল তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ ঃ মাগরিব হইতে ইশার নামায পর্যন্ত। এই সময় জাগ্রত থাকার ফযীলত অনেক। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, এই সময়ের ফযীলত সম্বন্ধেই আল্লাহ বলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

অর্থাৎ "তাহাদের পার্শ্বসমূহ বিছানা হইতে দূরে থাকে।" মাগরিব হইতে ইশার নামায পর্যন্ত নামাযেই লিপ্ত থাকা উচিত। বুযর্গগণ এই সময়টুকু ইবাদতে অতিবাহিত করাকে রোযা রাখা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা এই সময়ে পানাহার করেন না। বিতরের নামাযের পর বৃথা গল্পগুজব ও খেল-তামাশায় লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, দিবসের কাজ এখানেই সমাপ্ত হয় এবং উত্তম কার্যের সহিত ইহার পরিসমাপ্তি করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ইহা নিদ্রার সময়। সকলের নিদ্রা ইবাদতে গণ্য হয় না। যথানিয়মে সুন্নত অনুযায়ী শয়ন করিলে নিদ্রাও ইবাদতে পরিণত হয়।

সুন্নত অনুযায়ী শয়নের নিয়ম ঃ মৃত ব্যক্তিকে যেভাবে কবরে স্থাপন করা হয়, তদ্রূপ কিবলামুখী হইয়া প্রথমে ডান পার্শ্ব বিছানায় স্থাপন করিবে। নিদ্রাকে আবার ফিরিয়া নাও পাইতে পার। সুতরাং নিদ্রার পূর্বে পরকালের কার্যাবলী ঠিক করিয়াই শয্যা গ্রহণ করা উচিত। ওযূ প্রভৃতি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করত অতীত পাপের জন্য তওবা করিয়া শয়ন করিবে এবং দৃঢ় সংকল্প করিবে যে, জাগ্রত হইলে আর কখনও পাপ করিবে না। তোমার অন্তিম নির্দেশনামা বালিশের নিচে রাখিবে। আরামের

অভিপ্রায়ে বেহুদা নিদ্রাকে ডাকিয়া আনিবে না। কোমল শয্যায় শয়ন করিবে না। কারণ, কোমল শয্যায় দীর্ঘ নিদ্রা হইয়া থাকে এবং নিদ্রায় পরমায়ু বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। দিবারাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আট ঘন্টার অধিক নিদ্রায় কাটাইয়া দেওয়া উচিত নহে। আট ঘন্টা ঘুমাইলে জীবনের এক তৃতীয়াংশ নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। সুতরাং যাহার পরমায়ু ষাট বৎসর তাহার বিশ বৎসর নিদ্রায় অপচয় হয়। ইহার অধিক অপচয় করা উচিত নহে। পানি ও মিসওয়াক নিজ হস্তে রাখিয়া দিবে যেন শেষরাত্রে নামাযের জন্য উঠিয়া কোন অসুবিধা না হয়। নিদ্রা যাইবার সময় শেষরাত্রে অথবা অতি প্রত্যুষে নামাযের জন্য উঠিবার নিয়ম করিবে। এইরূপ নিয়ত করত শয়ন করিলে প্রগাঢ় নিদ্রার আবেগে দীর্ঘকাল ঘুমাইলেও নিয়তের কারণে কিছু সওয়াব মিলিবে। শয়নকালে বলিবে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَ بِاسْمِكَ اَرْفَعُهُ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ তোমার নামেই আমার পার্শ্ব শয্যায় স্থাপন করিলাম এবং তোমার নামেই ইহা শয্যা হইতে উঠাইব।" মোটকথা শয়নকালে এই দু'আ এবং পূর্ববর্ণিত দু'আসমূহ পড়িবে। ইহা ব্যতীত আয়াতুল কুরসী, আমানার–রাসূল, সূরা ফালাক , সূরা নাস ও সূরা মূল্‌ক পড়িবে। অভ্যাস এইরূপ করিয়া লইবে যেন ওযূর সহিত পড়িতে পড়িতে নিদ্রা আসিয়া পড়ে। এইরূপ শয়ন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মাকে আরশে লইয়া যাওয়া হয় এবং জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত নামাযের রত বলিয়া গণ্য করা হয়।

তৃতীয় ভাগ ঃ তাহাজ্জুদের সময়। তাহাজ্জুদ গভীর রাত্রের নামায অপেক্ষা ভাল। কারণ, তখন অন্তর নির্মল থাকে, দুনিয়ার কোন কর্মব্যস্ততা থাকে না এবং আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস আছে। 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে এই সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ফলকথা, দিবারাত্রির ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক কার্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া কর্তব্য এবং এক মুহূর্তও বেহুদা অপচয় করা উচিত নহে। দিবা-রাত্রির বিভিন্ন অংশ কোন একদিন উক্ত নিয়মে কাটাইয়া থাকিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি দিন আশা পোষণ করিবে না। মনে মনে বলিবে, আজ দিবাভাগের তো এইরূপ কাজ করিয়া লই হয়ত আজ রাত্রেই মরিয়া যাইব। আবার রজনী আগমনে বলিবে অদ্য রাত্রে উক্ত নিয়মে কাজ করিয়া তওবা করিয়া লই। সম্ভবত কালই আমার মৃত্যু ঘটিবে। প্রত্যহ নিজের মনকে এইরূপে প্রবোধ দিতে থাকিবে। সর্বদা এইরূপ করিতে

থাকিলে অবশেষে তুমি অবশ্যই উক্ত কাজে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে এবং অনায়াসে কার্য চলিতে আবাসভূমি বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লইবে। সফরে প্রবাসের কষ্ট থাকেই। কিন্তু প্রবাসভূমি শীঘ্র পরিত্যাগপূর্বক সুখের আলয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেই সকল কষ্টের অবসান ঘটে। পরকালের অনন্ত অসীম জীবনের তুলনায় ইহকালের সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী জীবন কিছুই নহে। দশ বৎসরের সুখ লাভের আশায় কেহ যদি এক বৎসরের কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া লয়, তবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? এমতাবস্থায় একশত বৎসরের ইহলৌকিক জীবনে একটু কষ্ট ভোগ করত পরলোকে লক্ষ লক্ষ বৎসরের নহে বরং অনন্তকালের জন্য অশেষ সুখের অধিকারী হওয়াতে বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে?

ইফাবা–২০০৩-২০০৪–প্র/৫৬৫১ (উ)–৭,২৫০